মাতৃভাষা ও সাহিত্য

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫/১বি, বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : ১৫ই আগস্ট ১৯৫৯

প্রকাশক :
পপুলার লাইব্রেরীর পক্ষে
স্নীলকুমার ঘোষ এম. এ.
১৯৫/১ বি, বিধান সরণি
কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রাকর :
সতীশচন্দ্র সিকদার
বন্দনা ইম্প্রেশন প্রাইভেট লিমিটেড
৯/১ মনোমোহন বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ শিল্পী
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাবিয়াকে

মুখবন্ধ

পুস্তকটি আমার বিভিন্ন সময়ে ও উপলক্ষ্যে রচিত কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। একটি প্রবন্ধ ('বীণাপাণির বীণার তার') ব্যতীত বাকী সব কয়টিই ১৯৫৭ সালের পূর্ব্বে রচিত। 'মাতৃভাষা' প্রবন্ধটি রচনার উপলক্ষ্য প্রবন্ধের সূচনাতেই বর্ণিত আছে। প্রবন্ধে উল্লিখিত ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম বাংলার পূর্বতন সরকারের (কংগ্রেস সরকারের) সময়। "মাইকেল, দীনবন্ধু ও গিরিশচন্দ্র" শিরোনামায় প্রবন্ধটি রচিত হয় সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে। "বাংলার গ্রাম, সমাজ, সংস্কার : শরৎচন্দ্র" লেখা হয় শরৎচন্দ্রের শতবার্ষিক জন্মোৎসবের সময়। বলা বাহুল্য প্রবন্ধটি শরৎসাহিত্যের কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে। সর্ব্বক্ষেত্রে প্রবন্ধের সূচনায় রচনার উপলক্ষ্যের পরিচয় নেই বলে এখানে উল্লেখ করে দিলাম।

যা বলা হলো তাতে সহজেই বোঝা যায় প্রবন্ধগুলি একটি নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী ধারাবাহিক ভাবে রচিত এমন নয়। ফলে কোথাও কোথাও পুনরুল্লেখ বা পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। আশা করি এ-ত্রুটি মার্জিত হবে।

লেখকের নিবেদন লেখায়, পাঠকের মূল্যায়ন পাঠে। সুতরাং গুণাগুণ সহৃদয় পাঠকের বিবেচ্য।

পুস্তক প্রকাশে বন্ধুবর শ্রীনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের উৎসাহ এবং সক্রিয় প্রত্যক্ষ সহযোগিতা লাভ করেছি। পাছে তিনি বিব্রত বোধ করেন এই কারণে এর বেশী কিছু লিখতে পারলাম না।

প্রীতিভাজন শ্রীসুধীর ঘোষ মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং উদ্যোগের ফলেই প্রকাশ সম্ভব হলো। ইতি

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্

সূচীপত্র

মাতৃভাষা

কিছুদিন আগে পশ্চিম বাংলায় শিক্ষা সংক্রান্ত একটি বিষয়ে আন্দোলন হয়েছিল। আন্দোলনের আশু লক্ষ্য পুরোপুরি না হলেও মোটামুটি সফল হয়েছিল। কিন্তু আন্দোলনের উপলক্ষ্যটা এমন যে যে-কোনও অন্য দেশের মানুষকে অবাক করবে। কর্তৃপক্ষের হুকুমে (তখন কর্তৃপক্ষ কংগ্রেসী সরকার) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পঠনীয় এবং পরীক্ষার বিষয়সূচীর নির্দেশে হঠাৎ দেখা গেল বাধ্যতামূলক বিষয়গুলির মধ্যে মাতৃভাষার স্থান নেই। যদিচ ইংরেজির স্থান আছে। যাদের মাতৃভাষায় পুস্তকাদি এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা যথেষ্ট সমৃদ্ধ এবং শুধু মাতৃভাষার মাধ্যমেই সর্বোচ্চ জ্ঞানার্জন সম্ভব (যেমন রুশ দেশে রুশ ভাষায়) সে-সব দেশেও অন্ততঃ একটা বিদেশী ভাষা যথা ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান ইত্যাদি শিখতে হয়। সেখানে অর্থাৎ রুশ দেশে এখন ইউরোপ ছাড়া অন্যান্য মহাদেশের ভাষাও (যেমন হিন্দী) স্কুলের পাঠ্য তালিকায় প্রবেশ করেছে। আবার যাঁদের মাতৃভাষা আধুনিক যুগের সমতালে এগিয়ে সেইরূপ সমৃদ্ধ স্তরে পৌছাতে বিলম্ব ঘটেছে এবং এখনও কিছুকাল প্রয়োজন হবে (যেমন ভিয়েতনামের ভাষা) তাঁরাও মাতৃভাষা ছাড়াও ইংরাজী, ফরাসী, রুশ বা চীনা ভাষা অর্থাৎ উন্নত বিদেশী ভাষা পাঠ্য তালিকার মধ্যে রেখেছেন। সুতরাং ইংরাজী ভাষা পাঠ্য-তালিকায় রাখার প্রয়োজন নেই, এমন কথা বলছি না। অন্ততঃ এই প্রবন্ধে ঐ সমস্যা বা বিতর্কে যাবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে 'ভাষা' বিভাগে মাতৃভাষাটাই বাদ পড়বে এমন কথা কেউ কল্পনা করে না। সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থায় মাধামিক স্তরেই বিজ্ঞানের উপর জোর দেওয়া হয় একথা সুপরিচিত। কিন্তু লক্ষ্যণীয় সেখানেও ভাষা শিক্ষার উপর, বিশেষ করে মাতৃভাষা শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থা পরিদর্শনে প্রেরিত ভারতীয় সরকারী প্রতিনিধিদল ঐ বিষয় লক্ষ্য করেন এবং তাঁদের রিপোর্টে বলেন, বিজ্ঞানের উপর জোর দেওয়া সত্বেও, কোনও একটি বিভাগে সর্বোচ্চ মনোযোগ নিয়োগ হিসেব করতে গেলে, দেখা যাবে সেরূপ মনোযোগ পায় সাধারণ ভাবে ভাষা-শিক্ষণ বিভাগ (অবশ্য মাতৃভাষা ছাড়াও অন্য-ভাষাও তার মধ্যে আছে)। সুতরাং 'ভাষা' বিভাগে মনোযোগ দিতে গেলে বিজ্ঞান বা অন্যান্য

বিষয়ে আবশ্যিক ভাবেই মনোযোগ শিথিল হবে এমন কোনও কারণ নেই। ভাষা-শিক্ষণ এবং অন্যান্য শিক্ষণ আবশ্যিক ভাবেই বিকল্প নয়। একটা ধরলে আর একটা ছাড়তে হবে এমন কথা নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে বিলেতে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য (অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরের শেষ পরীক্ষার জন্য) পাঠ্য ও পরীক্ষার বিষয়সূচী কারিকুলাম নির্ধারণের জন্য একটি সরকারী কমিটি নিয়োগ করা হয়। তাঁরা তাঁদের রিপোর্টে বলেন, যেহেতু যাঁরা বিজ্ঞান ও টেকনিকাল পড়াশুনা করবেন তাঁদের ভাষা ও সাহিত্য চর্চার তেমন কোনও প্রয়োজন নেই, মাধ্যমিক স্তরে বাধ্যতামূলক বিষয়গুলির তালিকা হতে বাদ দেওয়া যেতে পারে। (এটা পশ্চিম বাংলায় যা করার প্রস্তাব হচ্ছিল তার সমতুল নয়। কারণ, এখানে ভাষা শিক্ষা বাদ দেওয়া হচ্ছিল না। ইংরাজী তো থাকছিলই। উপরন্তু ঐচ্ছিক স্তরে একটা যে কোনও ভারতীয় ভাষা তথা বাঙ্গালীর ক্ষেত্রে মাতৃভাষা বাদ দিয়ে হিন্দী হতে পারতো। উক্ত প্রস্তাবে শুধু মাতৃভাষাই বাধ্যতামূলক ছিল না। বিলেতে উক্ত কমিটির প্রস্তাবে ভাষা পরীক্ষাই বাধ্যতামূলক তালিকা থেকে বাদ পড়ছিল।) লক্ষণীয়, এই প্রস্তাবের সব চেয়ে বেশী প্রতিরোধ আসে সেখানকার বিজ্ঞানীমহল থেকে। প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণ প্রতিবাদ করেন। তাঁরা বলেন, ভাষা শিক্ষা না হলে বিজ্ঞানের তত্ত্ব এবং তথ্য প্রকাশের ক্ষমতা থাকবেনা বা দুর্বল হবে। ভাষা-মাধ্যমে আদান প্রদান না হলে বিজ্ঞান চর্চাই ব্যাহত বা রুদ্ধ হবে। তাছাড়া ভাষার অভাবে চিন্তাশক্তিও দুর্বল হবে; চিন্তাকে সুসংবদ্ধ করা এবং সমৃদ্ধ করার অসুবিধা হবে। তাঁদের প্রতিবাদের ফলে, বিলেতের উল্লিখিত কমিটির ভাষা-বর্জনের প্রস্তাব বাতিল হয়। একটা স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং উদীয়মান উন্নত দেশ হিসেবে ভিয়েতনামের দৃষ্টান্ত যদি দেখি সেখানেও দেখবো ভাষার উপর বেশ জোর দেওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সর্বত্রই ভাষার উপর, বিশেষ করে মাতৃভাষার উপর, জোর দেওয়া হয়।

ব্যবস্থাটা এরকম কেন প্রস্তাবিত হলো, বাধ্যতামূলক বিষয়ের তালিকা থেকে মাতৃভাষা কেন বাদ পড়লো তার ব্যাখ্যায় ঘটলো যাকে ইংরেজিতে বলে দি ক্যাট ইজ আউট অব দি ব্যাগ, থলের ভিতর থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়লো। বলা হলো, অনেক ছাত্রই আছে যারা দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরাজী মাধ্যমে পড়ে। অর্থাৎ তারা যাতে মাতৃভাষার পরীক্ষা দেওয়ার বাধ্যতা থেকে রেহাই পায়, এই জন্যই এ-ছাড়।

নির্দেশের সারমর্ম দাঁড়ালো এই : এক জায়গায় গাঁট বেঁধে দিয়ে, একটি নির্দিষ্ট

বিন্দুতে পিন্ ডাউন করে, বাকী ব্যবস্থাটা তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে বা ফিট্ করতে হবে। মাধ্যমিক পরীক্ষার মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ইংরাজীর মাধ্যমে পড়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার অনুপাত কতো? শতকরা ২·৫ ভাগ হবে কিনা সন্দেহ। এই স্বল্প সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকদের দেশের ভাষার প্রতি উন্নাসিক অবজ্ঞার খাতির করতে উল্লিখিত ছাত্রছাত্রীদের জন্য দেশের সর্বসাধারণের যা প্রয়োজন তাকে সঙ্কোচ করে, দেশের মানুষের যে-ভাষা তার প্রয়োজনীয়তাকে খাটো করে, এবং তার মর্যাদাকে অবনমিত করে এই বিধি ব্যবস্থা রচিত হলো। পিন্ ডাউন করা নির্দিষ্ট বিন্দুটি এই। এরা তো উপর থাকের মুষ্টিমেয় শ্রেণীর। কিছুটা অবস্থার গতিকে এবং কিছুটা স্ট্যাটাস সিম্বলের আকর্ষণে বা উপর থাকের সঙ্কীর্ণ স্থানে স্থান-সংগ্রহের উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও কিছু মানুষ এদের দলে ভিড়ছেন বটে তবে, তাঁদের সম্পর্কে উল্লেখের এখানে প্রয়োজন নেই। মোটমাট উপর থাকের মুষ্টিমেয় শ্রেণীর ব্যাপারটাই আসল। দেখা যাবে তাঁদের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী এবং আচরণই হলো সরকারী নীতির নির্ধারক ও নিয়ামক। সরকারী কর্তৃপক্ষ মহল যাঁরা এই শিক্ষানীতি নির্ধারণ করছেন, তাঁদের অনেকে,—হয়তো সকলেই—এই শ্রেণীর অভিভাবক। তাঁদের ছেলেমেয়েরা যাতে মাতৃভাষা বাদ দিয়ে জীবনে এগিয়ে যেতে পারেন এটাই হলো লক্ষ্য। বর্তমানে সমাজ যেমন চলছে তেমনি চললে এরাই, অর্থাৎ সেই ছেলেমেয়েরাই, এরপর এখানকার কর্তৃপক্ষদের স্থান গ্রহণ করবে এবং সমাজব্যবস্থা তেমনই চলতে থাকবে যাতে উপরে আসন পেতে হলে মাতৃভাষায় জ্ঞান লেখাপড়ার মান অনুযায়ী না হলেও চলবে।

এরকম থাকলে মাতৃভাষার পুষ্টি ও সমৃদ্ধির গতি রুদ্ধ হবে বা মন্দীভূত হবে। বস্তুতঃ এখনই হচ্ছে তাই। সমাজতন্ত্রের দেশ তো দূরের কথা ধনতান্ত্রিক দেশেও পূর্বে এরূপ ছিল না। ইংলণ্ডে বুর্জোয়া ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লাটিনের স্থান গ্রহণ করেছে মাতৃভাষা। জার্মানী ফরাসী সব দেশেই তাই। বস্তুতঃ মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠার লড়াই ছিল সামন্ত আভিজাত্যের বিরুদ্ধে লড়াই-এর অন্যতম প্রধান অংশ। বাইবেল অনূদিত হলো এবং বাইবেল মাতৃভাষায় পড়া এবং গির্জার প্রার্থনায় ব্যবহৃত হওয়া এটাই একটা সংগ্রামের বিষয় হলো।

এশিয়ার ধনতান্ত্রিক অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য স্থান হচ্ছে জাপানের। জাপানের শাসকবৃন্দ গোড়া থেকেই মাতৃভাষাকেই প্রধান মর্যাদার স্থান দিয়ে এসেছে। শাসনব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থা সবই মাতৃভাষার মাধ্যমে। আধুনিক কালের উপযোগী ভাষার যে সমৃদ্ধি প্রয়োজন তাও তাঁরা পরিকল্পিত ভাবেই করে

এসেছেন। ইউরোপের জ্ঞানভাণ্ডার তাঁরা অনুবাদ মাধ্যমে দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। নিজেদের ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির জন্যই তাঁদের এসব করতে হয়েছে। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানে অনবহিত বা আধুনিক কলা-কৌশল জ্ঞান-বিজ্ঞানে পশ্চাৎপদ শ্রমিক কৃষক ও দেশবাসী নিয়ে উচ্চমানে আধুনিক শিল্প গড়ে তোলা যায় না তা এরা বুঝেছিলেন। অন্ততঃ ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু এইভাবে আয়ত্ত করতে তাঁরা সক্ষম হয়েছেন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উজবেক, কাজাক, আরমেনিয়া প্রভৃতি এশিয়ার দেশ-সমূহের অধিকাংশের নিজেদের ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ ও শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার অধিকার পেয়েছেন ও তাকে কাজে লাগিয়ে এক লাফ দিয়ে অভূতপূর্ব পশ্চাৎপদতা থেকে অভূতপূর্ব উন্নত অবস্থায় উপনীত হতে পেরেছেন। চীনের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। নিজদেশে তাঁদের ভাষার অমর্যাদা অবশ্য কোনও দিনই হয়নি। তবে শাসকশ্রেণী ম্যানডারিন আখ্যায় পরিচিত ভাষার এক বিশেষ ভঙ্গী ব্যবহার করতেন যা ছিল সাধারণের আয়ত্তের বাইরে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভাষা ও লিপির উপযোগী পরিবর্তন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তবু একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে চীনের অতীতের সমাজ ব্যবস্থাও আজকের ভারতের চেয়ে উন্নত ছিল। ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানে মাও-সেতুং প্রমুখের পাণ্ডিত্য কম নয়। অথচ এসব মাতৃভাষার মাধ্যমেই আহরিত হয়েছে। ভারতের দুর্ভাগ্য আজ স্বাধীনতার প্রায় ৩০ বৎসর অতীত হওয়ার পর এসব বিষয় আলোচনা করতে হচ্ছে এবং বিদেশী শাসক নয় দেশের কালা সাহেবরাই মাতৃভাষাকে সজোরে দাবিয়ে রাখছে। উদ্দেশ্য সরল। জ্ঞান বিজ্ঞান শাসন পরিচালনা আদি যা কিছু মুষ্টিমেয় উপর থাকের মানুষের হাতেই সীমিত থাকবে, সাধারণ মানুষ যেন তা নাগালের মধ্যে না পান।

মুখে যাই বলা হোক, কাজে সব কিছু এখনও ইংরাজীতে চলছে। শাসন ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বক্ষেত্রেই ইংরেজীর স্থান নির্দিষ্ট ও মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। মাতৃভাষা সীমিত ক্ষেত্রে, তাও অনির্দিষ্ট ঐচ্ছিক স্তরে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার কথা ঘোষিত হয়। দুই একটি পুস্তক সরকারী অনুদানে প্রকাশিত হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় মাতৃভাষায় খুব কম হয়েছে। নেপালী, উর্দু, ওড়িয়া প্রভৃতি সংখ্যালঘুদের ভাষার তো কথাই নেই। পশ্চিম বাংলার জনসংখ্যার অধিকাংশের যা মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলা, তাও অবহেলিত। ইউরোপের বিপুল জ্ঞানভাণ্ডারের এক কণাও সরকারী উদ্যোগে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হয়নি। (সরকারী অনুদানে সংস্কৃত থেকে মহাভারতের

ও কিছু ধর্মশাস্ত্রের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। অনুবাদ ভালই হচ্ছে মনে হয়। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় একাজে বিশ্ববিদ্যালয় বা সংস্কৃত কলেজকে ব্রতী না করে অনুদান দেওয়া হচ্ছে বিশেষ এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে।)

গত কয়েক শতাব্দী ধরে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান, রুশ ও ইউরোপের অন্যান্য ভাষায় রচিত পুস্তকাদি এবং বর্তমানের নাম করা পাঠ্যপুস্তকাদি মাতৃভাষায় অনুবাদের চেষ্টা শুরু করে দ্রুত এগিয়ে না নিয়ে গেলে জনসাধারণের জ্ঞানার্জন ও মাতৃভাষার সমৃদ্ধির প্রত্যাশিত লক্ষ্য পূরণ কি করে হবে? মাতৃভাষায় শিক্ষার মাধ্যমের জন্য তো বটেই সাধারণের মধ্যে জ্ঞান প্রসারের জন্যও প্রয়োজন। বার্ণার্ডশ, ম্যাক্সিম গোর্কি প্রমুখ কলেজে না গিয়েও স্বচেষ্টাতেই উচ্চমানের বিদ্যার্জনে সফল হয়েছিলেন। সমৃদ্ধ মাতৃভাষার ফলেই তা সম্ভব হয়েছিল। শুধু বাংলা জানেন এমন পাঠকের পক্ষে এই সম্ভাবনা এখনও দূরে রয়ে গেল কেন? ডারউইনের "ওরিজিন অব স্পীসিজ" বাংলায় পড়ার সুযোগ থাকবে না কেন?

এই প্রসঙ্গে একটা কথা এসে পড়ে। কপিরাইটের প্রশ্ন। ধনতান্ত্রিক জগতের অগ্রগতির সময় কপিরাইটের আন্তর্জাতিক বন্ধন মোটেই ছিল না। কেউ মেনে নেয়নি। গোটা উনবিংশ শতাব্দীতে এর অস্তিত্ব ছিল না। ১৮৯১ সালে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের একটা পারস্পরিক চুক্তি হয়। বিস্তৃত বিবরণের প্রয়োজন নেই। প্রায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত দেশের সীমানার বাইরে কপিরাইট ও পেটেন্টের বাঁধা বাঁধি স্বীকৃত হয়নি। পশ্চাৎপদ দেশসমূহ অগ্রগামী দেশের বিদ্যা অবাধভাবেই ব্যবহার করে গেছে। একটি দৃষ্টান্ততেই পরিষ্কার হবে। ইস্পাত উৎপাদনে বেসেমার পদ্ধতি এক বিরাট অগ্রগতি সূচিত করে। ১৮৫৬ সালে ইংলণ্ডে আবিষ্কৃত হয়। ১৮৬৮ সালে মার্কিন শিল্পপতি এনড্রু কার্নেগী ইংলণ্ডে এসে এ বিদ্যা ডিজাইন পুস্তিকাদি নিয়ে যান। তার ফলে তাঁর সৃষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠান দ্রুত গতিতে এগিয়ে ধনতান্ত্রিক জগতের বৃহত্তম শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই রূপে পেটেণ্ট পুস্তকে ইংলণ্ড ফ্রান্স ও জার্মানীর অগ্রগতির ফল আমেরিকায় প্রচারিত ও পুনর্মুদ্রিত হয়ে আমেরিকার শিল্পোন্নতির গতি ও প্রসারে সাহায্য করে। অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে জাপানের অগ্রগতিতে। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ কেউই কপিরাইটের আন্তর্জাতিক চুক্তির বন্ধন গ্রহণ করেনি। সোভিয়েত ইউনিয়ন মাত্র ১৯৭৪ সালে চুক্তিতে যোগ দিয়েছে। কিন্তু, লক্ষ্য করার বিষয়, স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরেই ভারত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি-গুলির প্রভাবে বৃটিশ আমলের মতো তাদের কপিরাইটের ফাঁস নতুন করে গলায়

পরে নিল। ফলে অবাধ অনুবাদ, যা ভারতের প্রতিটি ভাষার সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন, তাতে একটা বাধার সৃষ্টি হলো।

পশ্চিম বাংলার বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বুর্জোয়া পত্রপত্রিকাগুলির বাংলা ভাষা সম্বন্ধে জাতিদম্ভ ও জাতিবৈরিতা প্রচারের উন্মত্ত চিৎকারে কান পাতা যায় না। অথচ, লক্ষ্য করার বিষয়, গত ৩০ বৎসরের পরও বাংলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের পথ যে রুদ্ধ হয়ে থাকলো তার সম্বন্ধে এদের টুঁ শব্দটি করতে শোনা যায়নি। এরা আবার পূর্ব বাংলার মানুষের উপর বাংলা ভাষার প্রতি দরদে মুরুব্বিয়ানা দেখাতে যায়। অত্যাচার, নিপীড়ন, প্রতিরোধ করেও তারা যা করতে সফল হয়েছিল, আনুপাতিক বিচারে তার কতটুকু এখানে করা গেছে? জগতের চিরায়ত সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মহান সৃষ্টি কেমন করে মাতৃভাষার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া যায় ও বাংলার প্রতিভার বিকাশের অন্তরায় দূর করা যায় তার কোনও দাবিই এরা তোলে না। শুধু মওকা বুঝে ভাষা বিদ্বেষ তথা জাতি বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলে মেহনতী মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে শাসকশ্রেণীর সেবা করাই থাকে এদের উদ্দেশ্য।

ভাষা সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী আর জনগণের ঐ শত্রুদের দৃষ্টিভঙ্গীর তফাত বুঝতে অসুবিধা নেই। পার্থক্যটা জানা।

তবু একটু পরিষ্কার করাই যাক না কেন। একটা মনগড়া ফ্যাবরিকেটেড গল্পের সাহায্য নেব (এমন গল্প বাস্তবে যা সম্ভব নয়)। ধরুন রুষ্ট মালিক মজুরকে বলছে, ইউ আর ফাইন্‌ড্‌ রুপীজ টেন। মজুর ক্রোধে সাময়িক বাক্য-হীন। নতি প্রত্যাশায় বিফল হয়ে মালিক আরও রুষ্ট; জরিমানা বাড়িয়ে দিল, বললো, তুমারা পন্দরা রুপিয়া জরিমানা কর্‌ দিয়া। মজুরের ক্রোধ কিছুটা প্রশমিত হলো—যাই হোক দেশের ভাষা বলেছে। কিন্তু নীরবতায় মালিকের রোষ আরও বাড়লো, পরিষ্কার বাংলায় বললো, তোমার কুড়ি টাকা জরিমানা করলাম। মজুর খুব খুশী। জরিমানা বাড়লেও মাতৃভাষা বলেছে। মজুর বললো সামনের মাসে কেটে নেবেন। এমন সময় বাইরে সে শ্রমিক সমাবেশের আওয়াজ পেল—ইনকিলাব জিন্দাবাদ, মালিককা জুলুম নহীঁ চলে গা; জরিমানা নেঁহি চলেগা। উল্লিখিত মজুর তখন বেরিয়ে এসে জোর গলায় প্রতিবাদ করলো: "এসব চলবে না—ইনকিলাব শব্দটা আরবী—জিন্দাবাদটা ফারসী—পাঞ্জাবীরা এ সব চালিয়েছে—বাকীটা হিন্দুস্তানী। আমরা বাঙ্গালী এসব বলবো না।"

এই অবাস্তব কাহিনীতেই বোঝা গেল, ভাষা শ্রমিকের একক সম্পত্তি নয়, সমাজের সকলের। মালিকও তার শোষণের কথা ঐ ভাষাতেই প্রকাশ করে।

আবার ভারতের সকল রাজ্যের শ্রমিক তাঁদের অনেক জঙ্গী ভাষা পরস্পরের কাছ থেকে নিয়েছেন। ভাব চিন্তাধারা প্রভৃতিতে এখানকার শ্রমিকের সঙ্গে মেলে, যেমন অশোক সরকারের অনেক কথা মার্কিন, ইংরেজ মালিকের কথার সঙ্গে মেলে।

মালিকশ্রেণী বিশ্বব্যাপী নিজেদের আদান প্রদান বজায় রেখে জাতি দম্ভের মাধ্যমে দেশের জনগণকে "বর্বর আত্মকেন্দ্রিতায়" আড়ষ্ট রাখার অপচেষ্টা করতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্যও তাদের অপচেষ্টার প্রতিকূল। যবনদের প্রতি বিরূপ বঙ্কিমচন্দ্রও "যাবনি মিশাল" ভাষার সুখ্যাতি করেছেন এবং ফারসী আরবী শব্দ বাংলা ভাষার সমৃদ্ধিতে কিরূপ সাহায্য করেছে তার আলোচনা করেছেন। ("কবি কঙ্কণের চণ্ডীর বঙ্গভাষা", বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২২৭—'নন্দনের' নজরুল সংখ্যায় লেখকের প্রবন্ধে উদ্ধৃত)। দেশের ভাষার সম্পদের অপ্রতুলতা সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। ভাষার এই অমর স্রষ্টাকেও বাঙ্গালী হিন্দুর ছেলেকে তাব 'ধর্মতত্ত্ব' বোঝাতে গিয়ে লিখতে হয়েছিল, "লেখক প্রণীত কোন ইংরেজি প্রবন্ধ হইতে এইটুকু উদ্ধৃত হইল। ইহার মর্মার্থ বাংলায় সন্নিবেশিত করিলে করা যাইতে পারিত কিন্তু বাংলায় এ রকমের কথা আমার অনেক পাঠক বুঝিবেন না" (ধর্মতত্ত্ব, বঙ্কিমচন্দ্র)।* আমরাও তদনুরূপ সচেতন। সেইজন্যই পরিকল্পিতভাবে সমৃদ্ধির কথা বলি। কেবল শাসকশ্রেণীর প্রবক্তারাই অন্ধ জাতিদম্ভ মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করে অন্ধ রাখতে চায়।

আমরা বুঝি, আজ আমাদের মাতৃভাষার উপর অধিকার কতোটুকু। লেনিন দেখিয়েছিলেন, স্বভাবতই দেশের সংস্কৃতির উপর আধিপত্য থাকে শাসক-শ্রেণীর। আর তার প্রতিরোধে থাকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও মেহনতী মানুষের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক প্রচেষ্টা। ভাষার ক্ষেত্রেও তাই। একজন শ্রমিক দিনে কতোটুকু তাঁর নিজের কথা বলতে পান। শ্রম-শক্তির অংশ হিসেবে কথা বলা (বা লেখার) শক্তিও তাঁকে দিনের অধিক পরিমাণ অংশে মালিকের কাছে বিক্রয় করতে হয়। রেঞ্চটা এধারে দাও, হাতুড়িটা নাও, অমুক ফাইলটা কোথায়, অমুক ফাইলটা আমি ডীল করছি এই বলেই তো সারাদিন যায়। অবশ্য ইউনিয়নের কথা, আন্দোলনের কথা কিছু হয় বৈকি। ধনতন্ত্রে এই আদান প্রদানের সুযোগের

*যে-ইংরাজী বাক্য কয়টির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র একথা লিখেছিলেন, পাঠক দেখবেন, তা আজ বোধ্য ভাবেই বাংলায় অনুবাদ করা যায়। বাংলা লেখকদের কয়েক যুগের প্রয়াসে এ-উন্নতি সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে পরিকল্পিত প্রয়াসে ভাষার উন্নতি কতো সহজে করা যায় এই দৃষ্টান্ত থেকেই তা বোঝা যায়। —লেখক

কথাই তো মার্কস সবিস্তারে কমিউনিস্ট ইস্তাহারে বর্ণনা করেছেন। গুণে এর প্রতিটি শব্দ স্ফুলিঙ্গ—কিন্তু পরিমাণে কতো কম। বাইরে অবস্থাটা কি? মালিকদের কথা রেডিও সংবাদপত্র, সিনেমা সবে মিলে যে পরিমাণ স্থান জুড়ে দখল করে আছে, শ্রমিকের দখলে সেরূপ স্থান কতোটুকু? যে লক্ষ লক্ষ শব্দ মালিকদের অনুকূলে উল্লিখিত মাধ্যমে ব্যবহৃত হচ্ছে তার অনুপাতে মার্কস-বাদী কমিউনিস্ট পার্টি বা গণতান্ত্রিক সংস্থা সমূহের পত্র পত্রিকায় ব্যবহৃত শব্দ সংখ্যা কতোটুকু। গুণে তাদের জোর অনেক বেশী—কারণ তারা কোটি কোটি মানুষের কথা—কিন্তু পরিমাণের কথা শুধু হিসেব করছি। এটা তো সত্যি, পরিমাণের উপরই সেই কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌছনো নির্ভর করছে। সুতরাং আমরা বুঝি, মাতৃভাষার সমৃদ্ধি বলতেও আমাদের নিজে-দের ধারণা সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। আমাদের দায় বেড়েছে বৈ কমেনি। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও শিল্পসমৃদ্ধির স্বার্থেই মাতৃভাষার উন্নতিতে মালিকশ্রেণীর যা করা উচিত ছিল তারা তা করছে না। ধনতন্ত্রের এখন অবক্ষয়। অবক্ষয়ের সর্বগ্রাসী রূপই এরকম। সুতরাং গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে যে-অগ্রগতির প্রয়োজন তার সংগ্রামের দায়িত্বও আজ অর্পেছে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের উপর।

সত্ত যে আঘাত এসেছে তার প্রতিকারের দাবিকে জোর করে তুলতে হবে। মাতৃভাষা বাধ্যতামূলক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হোক সেই দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। (ইংরেজি যাদের মাতৃভাষা তাঁদের দাবিও এতে অপূরণ হচ্ছে না।) ভাষা সংক্রান্ত বিষয় যখন যা কিছু ঘটুক আশু দাবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে সেই সূত্রে আমাদের সমগ্র বক্তব্যকেই উপস্থিত করতে হবে এবং দেশের মানুষের অন্তরের কথাকে রূপ দিয়ে মাতৃভাষায় অনুশীলন সম্বন্ধে সমগ্র দাবিকে তুলে ধরতে হবে। শাসন ব্যবস্থায় অবিলম্বে মাতৃভাষার প্রধানত্ব প্রতিষ্ঠার আওয়াজ জোরদার করতে হবে। সমাজের সর্বক্ষেত্রের জন্য অনুরূপ দাবি করতে হবে।

শেষ করার আগে উপর থাকের উল্লিখিত শ্রেণীর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গটা স্মরণ না করে পারছি না। মায়ের ভাষা না হয় যাক; ভার্যার ভাষাও তো বটে। সুতরাং ভার্যার অনুরোধেও বাংলা বই পড়া হোক। উত্তর ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাতেই—ফর দাই সেক, মাই জুয়েল আই শ্যাল ডু ইট (বাংলা সাহিত্যের আদর, লোক রহস্য)। কিন্তু এখন তো সে ব্যঙ্গও করা যাবে না। উল্লিখিত শ্রেণীর ভার্যারাও অনেকে ইংরাজি বোঝেন ও বলেন, সন্তান সন্ততিরাও। কিন্তু একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারি শ্রমিকশ্রেণীও আজ ততো অনবহিত নয়। মাতৃভাষায় জ্ঞানার্জনের অধিকারের সংগ্রাম তাঁরা চালিয়ে যাবেন।

বিদ্যাসাগর স্মৃতি উপলক্ষে

আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেড়শতম জন্ম দিবস। এই প্রসঙ্গে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে "বিদ্যাসাগর স্মৃতি উপলক্ষে" এই শিরোনামায় লিখছি এই জন্যই যে এ শুধু আমাদের দেশের এক মহান ব্যক্তির স্মরণের কথা নয়—এ একটা যুগের স্মরণের কথা এবং সেই যুগের দ্বন্দ্বমান বিভিন্ন চিন্তাধারায় স্মরণের কথা। এর প্রয়োজন এখন আরও বেশী; কারণ, দেশের অতীতের খ্যাতনামা পুরুষদের স্মৃতি-দিবস ও স্মৃতিরক্ষার মধ্য দিয়ে আজ শুধু একই রকম দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হচ্ছে না এবং এ কথা সরলভাবেই স্বীকার করতে হবে এমন সব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে স্মরণ করা হচ্ছে এবং এমনরূপে তাঁদের ব্যক্তিত্বকে প্রতিফলিত করা হচ্ছে, যার হয়তো সেই স্মরণীয় পুরুষের নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গতি নেই কিংবা যা হয়তো বাস্তব বিচারে টেকসই নয়। তাছাড়া তুলনার জন্য সমসাময়িক অন্যান্য কিছু আন্দোলন এবং শতাব্দীর শেষার্দ্ধের রিভাইভ্যালিজ্‌ম্ প্রভৃতির কিছুটা আলোচনা হওয়া উচিত। এই একটি প্রবন্ধে সমগ্র বিষয় সম্যকভাবে উপস্থাপিত হওয়া কঠিন। সেরূপ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার উদ্দেশ্যও নেই। রেখাসঙ্কেত হিসাবে আংশিক কিছু আলোচনাই উদ্দেশ্য—যা' সহজে এবং স্বতই এইরূপ স্মরণকালে মনে এসে পড়ে।

বিদ্যাসাগর বলেছিলেন: "আমি অবতার হ'তে চাই না।"[১] অথচ সমসাময়িকদের কাছে নিরীশ্বরবাদী বা সংশয়বাদী পরিচিত থাকা সত্ত্বেও, তাঁকে তাঁর নিজস্ব আসল মাটির পৃথিবী থেকে তুলে প্রায় অবতারত্বে পোঁছে দেওয়ারও চেষ্টা হয়েছে। রামমোহন নাকি বলে' গিয়েছিলেন[২] "আমার মৃত্যু হইলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আমাকে তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু আমি কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহি।" অথচ দেশের আর এক মহান ব্যক্তি একদিন তাঁকে স্মরণ করে বলেছিলেন:[৩] "রামমোহন রায় আমাদিগকে আমাদেরই ব্রাহ্মধর্ম দিয়া গিয়াছেন।" দুই-এর মধ্যে হয় তো গরমিল নেই। কিন্তু তবু মনে হয় নিজের সম্বন্ধে রামমোহনের প্রথমোক্ত উক্তি অনুযায়ী যে চরিত্রায়ণ রামমোহনের অভিপ্রেত ছিল, শেষোক্ত উক্তির সঙ্গে তা যেন খাপ খাচ্ছে না। তবু যাঁর যাই ধারণা হোক না কেন, এমন

কি রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের নিজের ধারণা নির্বিশেষেও, বাস্তব ইতিহাসের বিচারেই বর্তমান বাংলা, বর্তমান ভারতের গঠনে উভয়ের বিরাট অবদান স্বীকৃত।

বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করতে গেলেই রামমোহন থেকে শুরু করতে হয় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা এসে পড়ে আর তার সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের কথা বেশী করে আসে। বস্তুতঃ এ বৎসর (১৫ই জুলাই ১৯৫০) শেষোক্তেরও দেড়শত বৎসরের জন্মবার্ষিকী। এবং সত্য কথা বলতে গেলে বস্তুবাদী চিন্তাধারার দৃষ্টিভঙ্গীর যাঁরা ভক্ত তাঁদের পক্ষে পুরাতন কালের ভাষায় 'দত্তজকেই' আজ বিশেষ করে স্মরণ করার কথা।

মার্ক্সের ১৮৫৩ সালের জুলাই মাসে লেখা প্রবন্ধে দেখা যায় ইংরাজ কর্তৃক ভারতের পুরাতন ব্যবস্থা ধ্বংসকরণের বর্ণনা দেওয়ার পর তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে ইংরাজের ইচ্ছা অনিচ্ছা নির্বিশেষে কতকগুলি জিনিসের উদ্ভব হবে যা নতুন ভারতের সোপান হবে। এর মধ্যে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার সংস্পর্শে এক নতুন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে এটা তিনি লক্ষ্য করেছেন। একেও তিনি ঐরূপ সোপানের মধ্যে ধরেছেন। তিনি বলছেন: ইংরাজদের তত্ত্বাবধানে তাদের অনিচ্ছা এবং কার্পণ্য সত্ত্বেও ভারতবাসীদের মধ্য থেকে এক শ্রেণী গড়ে উঠছে—যারা শাসনব্যবস্থা পরিচালনার গুণাবলী প্রাপ্ত হচ্ছে এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানের আলোকে প্রভাবিত হচ্ছে। একদিকে ইউরোপের সঙ্গে বাষ্পপোত মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুততর হওয়ায় এবং রেল মাধ্যমে দেশের ভিতর যোগাযোগের উন্নতির ফলে এর কতকগুলি সুফলের আশা আছে, তিনি তা বর্ণনা করছেন। শেষে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন: রেল ব্যবস্থার ফলে গড়ে' উঠবে আধুনিক শিল্প। এবং সেই শিল্প বংশানুক্রমিক শ্রম বিভাগ যার উপর বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠিত তা ভেঙ্গে দেবে। ঐ বর্ণাশ্রমই হচ্ছে ভারতের প্রগতি ও শক্তির বাধা।

ভারতের অচল অনড় যে-গ্রামসমাজ তা ভেঙ্গে যাওয়ার দরকার ছিল। ইংরাজ তার উপলক্ষ হয়েছিল। ইউরোপে যেমন নানান কারণে অভ্যন্তরীণ বিপ্লবের মাধ্যমে পুরাতন সামন্ত সমাজের স্থলে বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব হয়েছিল, ভারতে তেমন হল না। অচল অনড় ভারতীয় সমাজের ভাঙ্গনের উপলক্ষ হল ইংরাজ আর তার সর্বগ্রাসী লুণ্ঠন ও শোষণ। এইভাবে সর্বস্ব হারানো নিপীড়িত ভারতবাসীর ব্যথায় বেদনায় মার্ক্স বেদনাহত। এই ঘটনার বিবরণ শুনলে মনের অবস্থা যা দাঁড়ায় মার্ক্স তাকে বলেছেন "sickening"। অর্থাৎ

মানসপটে এই বীভৎসতার স্বরূপ জেগে উঠলে সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়। মার্কস এই দুঃখের কথা বলতে গিয়ে লিখছেন: "এই লক্ষ লক্ষ শ্রমপরায়ণ, নির্দোষ পিতৃ আধিপত্যাধীন সমাজগুলি বিশৃঙ্খলায় চূর্ণ এবং বিধ্বস্ত হয়ে গেল, দুঃখের সমুদ্রে পতিত হল এবং সে-সমাজের ব্যক্তিবিশেষ মানুষগুলি তাদের পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জীবিকার উপায়গুলি হারালো। সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রাচীন সভ্যতার আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলিও হারালো। এসব দেখলে মনের অবস্থা হয় সিকনিং। এসব সত্য হলেও আমরা কখনও ভুলতে পারি না এই সব কাব্যকল্প ছবির মত গ্রামসমাজগুলি প্রাচ্য স্বৈরাচারের দৃঢ় ভিত্তি ছিল। এরা মানুষের মনকে সঙ্কীর্ণতম সম্ভব পরিধির মধ্যে শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছিল। ফলে তা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধকারী যন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। উক্ত গ্রামসমাজ সে-মনকে বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত আচারের দাসে পরিণত করেছিল এবং তার বিশাল ঐশ্বর্য এবং শক্তি থেকে বঞ্চিত করেছিল।"

"নিজেদের নগণ্য-পরিমাণ জমিটুকুর উপর সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়ে আত্মকেন্দ্রিকতা, আত্মম্ভরিতা ও কূপমণ্ডূকতার এমন পশ্চাৎপদ পর্যায়ে গ্রাম-গুলি পৌঁছেছিল যে বড় বড় সাম্রাজ্যের পতন, বড় বড় শহরের পর শহরে ব্যাপক গণহত্যা ও ধ্বংসসাধন এরা অবিচলিতচিত্তে দেখে যেতো। প্রাকৃতিক ঘটনায় মানুষ যেটুকু মনোযোগ দেয় তার বেশী মনোযোগ এই সব ঘটনা তাদের কাছে পায়নি। আর কোনও আক্রমণকারী যদি কৃপা করে এদের দিকে নজর ফেরাতো এরা নিজেরাই তার অত্যাচার ও লুণ্ঠনের অসহায় শিকার হতো।" একজন আধুনিক লেখক বলছেন: "আমি পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ জানি না যেখানে খাঁটি ধর্মীয় আবেগ এবং (একই সঙ্গে) মানুষের উপর ভীষণতম বীভৎস নিষ্ঠুরতা এই দুই-এর এত বড় ফাঁক থাকতে দেখা যায়—যেমন ভারতে দেখা যায়" (এইচ-ভি আয়েঙ্গার, অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৯শে জুন, ১৯৫৯)। মার্কসও সে-সময় সেই বেদনা অনুভব করেছিলেন। তাই বলেছিলেন: "ভুলতে পারছি না যে এই গতিহীন গাছ-গাছড়ার মতো জীবন একই সময় এক বিপরীত চরিত্রের নিদর্শন উপস্থিত করে, অনিয়ন্ত্রিত বন্য লক্ষ্যহীন ধ্বংসের লীলা আবাহন করে নিয়ে আসে এবং নরহত্যাকে ধর্মের অনুষ্ঠান ও আচারে পরিণত করে। এই ছোট ছোট সমাজগুলি বর্ণাশ্রমের বিভেদ ও দাসত্বের কালিমায় লাঞ্ছিত এবং মানুষকে তার বাইরের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঊর্ধ্বে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার পরিবর্তে তাকে সেই অবস্থার দাসে পরিণত করে।"

এই গ্রামগুলি বিধ্বস্ত হতে থাকলো। দুঃস্থ গ্রামবাসীরা, যাদের গ্রামে

আর জীবিকার উপায় থাকলো না তারা চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হল। অনেকে প্রাণ হারালো। বেশ কিছু গ্রামবাসী শহর-বন্দরে এসে সমবেত হতে লাগলেন। পুরাতন জীবিকার উপায় তো গেছে। এখন নতুন জীবিকার উপায়ের সন্ধান। গ্রাম থেকে কিছু কিছু সৌভাগ্যবানেরাও শহরে এসে সৌভাগ্য আরও ফিরিয়ে নিলেন। আর কেউ কেউ নিঃস্ব হয়ে এসেও ব্যবসা বাণিজ্যের কল্যাণে সম্পদশালী হতে পারলেন। এসব বিষয় সুবিদিত—বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়োজন নেই।

পশ্চিমবাংলার এইরকমই এক বিধ্বস্ত গ্রামাঞ্চল থেকে জীবিকার সন্ধানে বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা এসেছিলেন। তাঁর মা বিদ্যাসাগরের ঠাকুরমা অতি কষ্টে চরখা কেটে সুতা বিক্রি করে ছেলেমেয়েদের পালন করছিলেন। তখনও ১৮১৩ সালের আইনের বলে বৃটেন হতে অবাধ বস্ত্রের আমদানী শুরু হয়নি। চরখার সুতার সে-অবলম্বন প্রথমেই খুব নির্ভর-যোগ্য অবলম্বন ছিল না। পরে আরও থাকল না। বিদ্যা-ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে ঠাকুরদাস চতুষ্পাঠী স্থাপনের যোগ্যতা অর্জন ও স্থাপনের আশা ত্যাগ করে শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়ীর কর্মচারীর কাজ পেয়ে যে-সামান্য রোজগার করতে সমর্থ হলেন তাতেই অতি কষ্টে পরিবার প্রতিপালন করলেন। গুণী পুত্রের প্রথমে ছাত্রবৃত্তি ও পরে রোজগার কষ্টের লাঘব করল এবং শেষ পর্যন্ত সে-রোজগারে সব কষ্টের রেহাই হলো।

অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনকাহিনীও শৈশবে ও কৈশোরে দুঃখ কষ্টের কাহিনী। কলকাতা এসে অনেক কষ্টে পড়াশুনা করেছিলেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুতে বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ পর্যন্ত চালাতে পারেন নি। রোজগারের উপায়ে ঘুরে ফিরে শেষ পর্যন্ত কবি ঈশ্বর গুপ্তের মাধ্যমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক হয়ে জীবিকার একটা অবলম্বন পেলেন। স্থায়ীভাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনার কাজেও লিপ্ত হলেন।

বিদ্যাসাগর বা অক্ষয় দত্তের জন্মের ছয় বৎসর পূর্বে রামমোহন কলকাতা এসেছিলেন। তাঁর অবস্থা অন্যরূপ। তিনি ছিলেন অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলে। সে পরিবার আরবী ফারসী পড়া নবাবী আমলের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত কর্মচারী পরিবার। রামমোহন জীবনে ভালভাবেই শিক্ষার সুযোগকে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। ফারসী, আরবী, সংস্কৃত ভাল ভাবেই শেখেন এবং পরে ইংরাজের অধীনে চাকরী করাকালে ইংরাজীও আয়ত্ত করেন। চাকুরী ইত্যাদি অন্তে তিনি ১৮১৪ সালে কলকাতা আসেন এবং কিছু সম্পদ

নিয়েই আসতে সমর্থ হন। পরে ব্যবসা আদিতে সে-সম্পদ বৃদ্ধি করতে সমর্থ হন।

ঠাকুর পরিবারের কলকাতার সঙ্গে সম্পর্কের প্রারম্ভ প্রায় ইংরাজের কলকাতা আগমনের সমসাময়িক কাল অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। প্রথম হতেই তাঁদের ব্যবসায়ের সঙ্গে সম্পর্ক। বৃটিশ শাসনকালে বড় রকমের জমিদারীও অর্জিত হয়। সুতরাং ঠাকুর পরিবার বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার আগে থেকেই কলকাতার প্রতিষ্ঠিত নাগরিক। নীলমণি ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর এঁরা সরকারী চাকরীও করেছিলেন।

মার্কস যখন লিখেছিলেন, "এক শ্রেণী গড়ে উঠেছে যারা শাসনব্যবস্থার গুণাবলী প্রাপ্ত হচ্ছে এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানের আলোকে প্রভাবিত হচ্ছে" তখন এই ধরনের ভারতীয়দের কথাই উল্লেখ করছিলেন—একথা সহজেই বোধ্য।

সামান্য প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে এই সঙ্গে উল্লেখ করে যাই মৌলানা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী যিনি প্রথমে রণজিত সিংহের বিরুদ্ধে এবং পরে ইংরাজের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করেন—তিনি তাঁর ধর্মমত সারা উত্তর ভারতে প্রচার করতে করতে কলকাতা পৌঁছান ১৮২০ সালে। অর্থাৎ রামমোহন কলকাতায় যখন সমাজ সংস্কার আন্দোলনে রত সেই সময়। হান্টার তাঁর "ভারতীয় মুসলমান" পুস্তকে এবং মৌলানা সৈয়দ হোসেন আহমদ মাদানী তাঁর (উর্দুতে লেখা) আত্মজীবনী "নকশে হায়াত" পুস্তকে কলকাতার মুসলমানদের দ্বারা তাঁর বিরাট সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর কাছে মুরীদ হবার জন্য এত লোক জমায়েত হল যে সেই উদ্দেশ্যে মৌলানার পক্ষে তাঁর হাত প্রসারিত করা সম্ভব হল না। পাগড়ী খুলে লম্বা করে তার স্পর্শের সুযোগ দিয়ে এক এক দফায় এক এক দলকে মুরীদ করা চলতে লাগল। এই ভাবে হাজার হাজার লোক তাঁর মুরীদ হল।

শাস্ত্র-বিচার

বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে যে পদ্ধতি নিয়েছিলেন রামমোহন তার প্রায় চার দশক কাল পূর্বে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার আন্দোলনের ক্ষেত্রে সেই পদ্ধতিই নিয়েছিলেন। "রামমোহন কলিকাতায় আসিয়া সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় কথোপকথনছলে গ্রন্থ রচনা করিলেন এবং তাহা নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া দেশের সর্বত্র বিনা মূল্যে বিতরণ করিলেন। রামমোহন সহমরণ বিষয়ে ক্রমে ক্রমে তিনখানি পুস্তক রচনা করেন।"[৪] পুস্তক তিনটি যথাক্রমে ১৮১৮, ১৮১৯

এবং সর্বশেষে ১৮৩০ সালে প্রকাশিত হয় এবং পর পর অনূদিত ইংরাজী সংস্করণও প্রকাশ করা হয়। এ পুস্তক কয়টিতে সাধারণ আবেদনার্থ বক্তব্য নিবেদন ছাড়া ছিল শাস্ত্রীয় প্রমাণ। "তিনি বহুল শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, সহমরণ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য শ্রেষ্ঠ।"

রামমোহনের ঐ সব পুস্তকসমূহ হ'তে যে-সব উদ্ধৃতি প্রচারিত হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি আমি উদ্ধৃত করছি: "অন্য অন্য বিষয়ে তো তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে, এ যথার্থ বটে; কিন্তু বাল্যকাল অবধি আপন প্রাচীন লোকের এবং প্রতিবাসীর ও অন্য অন্য গ্রামস্থ লোকের দ্বারা জ্ঞান পূর্বক স্ত্রীদাহ পুনঃ পুনঃ দেখিতে এবং দাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে তোমাদের বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মে; এই নিমিত্ত, কি স্ত্রী, কি পুরুষের মরণকালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মে না। যেমন শাক্তদের বাল্যাবধি ছাগ মহিষাদি হনন পুনঃ পুনঃ দেখিবার দ্বারা ছাগ মহিষাদির কাতরতায় দয়া জন্মে না কিন্তু বৈষ্ণবদের অত্যন্ত দয়া হয়।"[৫] প্রসঙ্গতঃ ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮২৯ বেণ্টিংক কর্তৃক সতীদাহ প্রথা বেআইনী বলে ঘোষিত হয়।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ঐ বৈষ্ণবদের ছাগ মহিষাদির জন্য দয়া হয় কিন্তু প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে মানুষকে নিক্ষেপ করলে তাঁদের দয়া হয়, একথা রামমোহন বলতে পারছেন না। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা স্মরণ হয়। তুর্কী মুসলমান শাসকরা এদেশে পাঁচশত বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। হঠাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজ আমলে যাঁরা ইসলামের গোঁড়া ভক্ত হয়ে গেলেন তাঁদের কাছে এ কৈফিয়ত পাওয়া গেল না যে ঐ মুসলমান শাসকদের আমলে কেন এই নৃশংস প্রথা বন্ধ করা হল না? মার্ক্সের নিম্নোদ্ধৃত কথাকেই মেনে নিতে হয়। "আরব, তুর্কী, তাতার, মোগল যারা পর পর ভারতবর্ষ দখল করেছে শীঘ্রই হিন্দুয়ীত (হিন্দুআইজ্‌ড্‌) হয়ে গিয়েছিল। ইতিহাসের চিরন্তন নিয়ম অনুযায়ী পশ্চাৎপদ জাতির বিজেতারা বিজিতের উন্নততর সভ্যতার দ্বারা বিজিত হয়েছিল। বৃটিশরাই প্রথম বিজেতা যারা ভারতের থেকে উন্নততর সভ্যতা নিয়ে এসেছিল এবং সেইজন্যই ভারতের সভ্যতার আওতার অধীনে পড়েনি।"

অবশ্য অন্য উপায়ে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা হয়নি এটা ঠিক নয়। ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ার যিনি আওরঙ্গজেবের চিকিৎসক হিসাবে এদেশে ছিলেন তিনি ঐ সময়কার সতীদাহ সম্বন্ধে লিখেছেন। সতীদাহ সম্বন্ধে তিনি বলছেন, "মুসলমান রাজত্বকালে মুসলমান বাদশাহরা নানাভাবে হিন্দুদের সহমরণ প্রথা নিবারণ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কখন কোনও

দিন তাঁরা হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করেন নি। নানারকম কৌশলে তাঁরা এই অমানুষিক দাহ বন্ধ করার চেষ্টা করেছেন। প্রাদেশিক গবর্নর বা সুবাদারের অনুমতি ছাড়া কেউ সহমরণ করতে পারবেন না বলে তাঁরা এক আদেশ জারী করে দিয়েছিলেন।…আবেদন করলে সুবাদার সহজে অনুমতি দিতেন না। নিজে যখন বুঝাতে ব্যর্থ হতেন, তখন তিনি সহমরণ প্রার্থিনীকে অন্দরমহলের মহিলাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন।…মহিলারা নানাভাবে বুঝাবার চেষ্টা করতেন। সমস্ত ব্যর্থ হলে এবং বাইরে থেকে কোনও প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে না বলে সুবাদারের বিশ্বাস হলে তবে তিনি অনুমতি দিতেন। এত চেষ্টা সত্ত্বেও সহমৃত্যুর সংখ্যা হিন্দুস্থানে খুব বেশী বলা চলে। বিশেষতঃ প্রায়-স্বাধীন হিন্দু দেশীয় রাজ্যের মধ্যে সতীদাহের সংখ্যা বেশী দেখা যায়।” বার্নিয়ার তাঁর পৃষ্ঠপোষক দানেশমন্দ খাঁর অনুরোধে কেমন করে হস্তক্ষেপ করে সন্তানসন্ততির মা এক মহিলাকে সহমরণ থেকে বিরত করতে পেরেছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলছেন ঃ—“আমার মনে হয়েছে যে **সতীদাহ থেকে আত্মরক্ষা করার যদি কোনও শাস্ত্রীয় বিধান থাকত তা হলে এই হতভাগ্য মহিলাদের মধ্যে অনেকে হয়ত সহমরণ না করে বেঁচে থাকতেন।**” (বাদশাহী আমল, বিনয় ঘোষ) বার্নিয়ারের শেষোক্ত মন্তব্যটুকুর জন্যই আমি এখানে বার্নিয়ারের কাহিনী উদ্ধৃত করলাম।

যদিচ একথা সত্য যে ইংরাজের আবির্ভাবের পূর্বে এবং রামমোহন যে-শ্রেণীর প্রতিনিধি তার উদ্ভব না ঘটলে এরকম দেশাচার বিরোধী শাস্ত্র-ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব ছিল না এবং সেইজন্য সম্ভবও হয় নি, তা হ'লেও এরকম শাস্ত্র ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল, এ উক্তি মনোযোগ আকর্ষণ করে।

এই শাস্ত্র ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা ঈশ্বরচন্দ্রও বোধ করেন—প্রতি ক্ষেত্রে যখনই তিনি কোনও সমাজ সংস্কারের কাজ হাতে নেন। ১৮৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত তাঁর “বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা” এই পুস্তিকায় তিনি লেখেন, “কিন্তু যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া ইহাকে কর্তব্য বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকেরা ইহাকে কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে তবেই এতদ্দেশীয় লোকেরা কর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন।” শাস্ত্রে প্রতিপন্ন করলেই তদনুসারে চলতে পারেন একথা যে ঠিক নয় তা শেষ জীবনে বিদ্যাসাগরকে শোচনীয়ভাবে বুঝতে হয়েছিল। একথা পরে আলোচ্য।

এ প্রশ্ন অনেক সময় যুক্তিবাদীদের কাছে আসে যুক্তিযুক্ততার বিবেচনা স্বতন্ত্র

ভাবেই হতে পারে, শাস্ত্রোল্লেখের প্রয়োজন কেন? রামমোহনের মত মানুষ যিনি প্রথম জীবনেই মোতাজেলা দর্শনে প্রভাবান্বিত ছিলেন এবং তদনুযায়ী সমস্ত ধর্মশাস্ত্রকেই অনিত্য ভাবতেন এবং বেদকেও অনিত্য ভাবতেন বা বিদ্যাসাগরের মত মানুষ যিনি কোনও ধর্মমতেই বিশ্বাস করতেন না—এঁদের শাস্ত্রের আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন হল কেন?

এঙ্গেলসের একটি উক্তি এই উপলক্ষে স্মরণ করা যেতে পারে: "মধ্যযুগ একেবারে কাঁচা থেকে বিকাশ লাভ করেছিল। তারা প্রাচীন সভ্যতা, প্রাচীন দর্শন, রাজনীতি, ব্যবহার শাস্ত্র সব কিছু শ্লেট থেকে মুছে দিয়েছিল। প্রত্যেকটি নতুন করে আরম্ভ করেছিল। খৃষ্টান ধর্মই একমাত্র জিনিস যা এই সমাজ পূর্বের বিধ্বস্ত জগতের থেকে রেখে দিয়েছিল। ফলে, যেমন প্রত্যেক আদিম স্তরের বিকাশের মধ্যে দেখা যায় যাজকরা বিদ্যার্জনের একচেটিয়া অধিকার অর্জন করেছিল। শিক্ষা জিনিসটাই ধর্মশাস্ত্রীয় শিক্ষায় দাঁড়িয়ে গেল। যাজকদের কাছে রাজনীতি ব্যবহারশাস্ত্র অন্যান্য বিজ্ঞানের মত ধর্মশাস্ত্রীয় বিদ্যার শাখা হিসাবে রয়ে গেল। এবং ধর্মশাস্ত্রের নীতি অনুযায়ী এসবকেও ব্যবহার করা হত। গির্জার নীতি (ডগমা) হতো রাজনৈতিক স্বতঃসিদ্ধান্ত। বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি আদালতের বিচারে আইনের মর্যাদা পেত। ব্যবহার শাস্ত্রবিদ হিসাবে একটা থাকও গড়ে উঠেছিল কিন্তু ব্যবহার শাস্ত্রের ঐ থাক ছিল ধর্মশাস্ত্রের অধীন।

···এ পরিষ্কার যে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার আক্রমণ এবং সমস্ত বিপ্লবী সামাজিক এবং রাজনৈতিক মতবাদ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এবং যুগপৎ ছিল প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদ (হেরেসি)। বর্তমানের যে সমাজ ব্যবস্থা তাকে আক্রমণ করার পূর্বে তার পুণ্য ও পবিত্র চেহারার জলুসকে শেষ করে দিয়ে তার নগ্ন চরিত্রকে লোক সম্মুখে উপস্থিত করার প্রয়োজন ছিল।" ঐ এক লেখাতেই আরও কিছু পরে এঙ্গেলস্ লিখেছেন:—"প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদ (হেরেসি) গির্জা এবং তার ডগমার আরও বেশী বিকাশকে অধঃপাত হিসাবে দেখে। এরকম বিরুদ্ধবাদ আনুষ্ঠানিক চেহারায় (ইন ফরম্) প্রতিক্রিয়াশীল। যে কোনও এই ধরনের বিরুদ্ধবাদের মতো সহুরে সম্পত্তিশালীদের দাবী ছিল প্রাচীন গির্জার সরল গঠনতন্ত্রে ফিরে যেতে হবে এবং পৌরহিত্যের একচেটিয়া অধিকারের উচ্ছেদ করতে হবে।" বলা বাহুল্য এঙ্গেলসের "জার্মানীতে কৃষক যুদ্ধ" থেকে উদ্ধৃত এই অংশ আমাদের আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে হুবহু খাপ খেতে পারে না; কিন্তু আমরা যুক্তিবাদীদের যে-প্রশ্নের উল্লেখ করেছি তার উত্তর পেতে সাহায্য করে। স্মরণ রাখতে হবে যে তখনও ইংরাজ আদালতে হিন্দু আইন এবং

মুসলমান আইনের বিষয়ে সাহায্য দেবার জন্য জজ পণ্ডিত এবং মৌলবী আদালতের বিশেষ অঙ্গ হিসেবে উপস্থিত থাকতেন। রামমোহনের সমাজ সংস্কার থেকে বিদ্যাসাগরের আমলে সংস্কৃত কলেজের দ্বার সর্ববর্ণের হিন্দুদের জন্য উন্মোচন পর্যন্ত সবেরই মধ্যে স্থান, কাল, পাত্রের উপযোগী এঙ্গেল্‌স্ বর্ণিত 'হেরেসির' প্রতিকৃতি দেখা যায়। প্রথম যখন সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজ পাশাপাশি দুই বিল্ডিংএ অবস্থিত হয় তখনকার অবস্থা বর্ণনায় জে, কের লিখছেন: "এই প্রাথমিক দুই শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে যোগাযোগ যাতে না হয় তার জন্য যে সতর্কতা গৃহীত হয়েছিল তা অদ্ভুত লাগে। প্রাচীরের উপর লোহার রেলিং দিয়ে দুটো বাড়ীকে আলাদা আলাদা করে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা হল। যারা দ্বিজ এবং যাদের জন্মমাত্র একবার তারা এক বাতাসে নিঃশ্বাস গ্রহণ করবেন বা এক আকাশের নীচে চলবেন, এটা বন্ধ করা যায় না। সেইজন্য একটা প্রবেশ পথে আপত্তি হবে না বলে ধরা হল। সুতরাং পরস্পরের স্পর্শ না করে এক গেট দিয়ে ঢুকতে পারে এমন চওড়া গেট করে দিয়ে তার মধ্য দিয়ে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হল। কিন্তু আর কোনও ছাড় (কনসেশান) দেওয়া হল না। কেন্দ্রীয় বিল্‌ডিং (যাতে ছিল সংস্কৃত কলেজ) তা একেবারে বেড়া দিয়ে আলাদা করতে হল…।" ধনতন্ত্রের উন্মেষে নতুন উদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রয়োজন ছিল এই বেড়া ভাঙ্গার যাতে বর্ণাশ্রম নির্দেশিত পেশা (যার এমনিই অস্তিত্ব থাকছিল না) তা ছেড়ে যে-যেমন ইচ্ছা পেশা গ্রহণ করতে পারে। দ্বিজ অদ্বিজ সকলেরই এর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এঙ্গেল্‌সের কথা, শাস্ত্রযুদ্ধ "রিঅ্যাকশানারী ইন ফরম্" এও স্মরণ রাখতে হয় যখন মনে পড়ে এই ফর্মের প্রতিক্রিয়াশীলতার দরুন বঙ্কিম প্রমুখ অনেক এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক রিভাইভেলিস্টরাও চাকা ঘুরিয়ে দেওয়ার কাজে এই ফর্মকেই কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। এখনও তা চলছে। আজকের ক্ষেত্রে সংস্কার বা বিপ্লবের জন্য ঐরূপ প্রতিক্রিয়াশীল ফর্মের আশ্রয় নিতে হয় না, নেওয়া অনুচিত। শুধু অনুচিত কেন গর্হিত। কিন্তু রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সময় শাস্ত্রীয় বিচারের দ্বারা সংস্কারের চেষ্টার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তা যুগানুযায়ী স্বাভাবিকতা অস্বীকার করা যায় না।

লোকাচার

জীবনীকার লিখছেন: [৮] "উত্তরকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় গভীর দুঃখের সহিত বলিতেন:—আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি; আমার বিশ্বাস ছিল যে

এদেশের লোক শাস্ত্রানুগত, কিন্তু শেষে দেখিলাম, এদেশের লোক শাস্ত্র মানিয়া চলে না, লোকাচার ইহাদের ধর্ম।” বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ অভিজ্ঞতালাভ পূর্বেই হতে পারত—তিনি যদি পাশাপাশি মুসলমান সমাজে লোকাচারের প্রভাবটা দেখতেন। বিধবা বিবাহ বহুদিন পূর্বেই মুসলমান সমাজে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—অন্ততঃ পক্ষে সম্ভ্রান্ত সমাজ বলে যাঁদের পরিচয় ছিল তাঁদের মধ্যে। যদিও ইসলামে বিধবা বিবাহ শুধু বিধিসম্মত নয়, অনুমোদিত, এমন কি বিপন্ন বিধবাদের ক্ষেত্রে তাঁদের দায়িত্ব গ্রহণ হিসাবে প্রশংসিত—তবু ভারতে লোকাচার বলে হিন্দু থেকে ধর্মান্তর মারফত যাঁরা মুসলমান হয়েছেন তাঁরাই হন বা বাইরে থেকে আসা মুসলমানই হন তাঁদেব মধ্যে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে আচার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে আকবরকেও বিধবা বিবাহের পক্ষে ফরমান জারি করতে হয়েছিল। শুধু বিধবা বিবাহ নয় আধুনিক কালে সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে যে চারটি বিষয়ে আন্দোলন হয়েছে সব কয়টিই ঐ ফরমানে উল্লেখিত। “…আকবর ১৪ বৎসর বয়সের নীচে কোনও বালকের বিবাহ, ‘কাজিন’দের ও নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করেন, কেবল সন্তান না হওয়ার কারণ ব্যতিরেকে একজনের বেশী স্ত্রী কেউ বিবাহ করতে পারবে না। বিধবারা যদি বিবাহ করতে চায় তাদের বাধা দেওয়া চলবে না।”[৯] বোঝা যায় বিধবারা বিবাহ করতে চাইলে বাধা দেওয়া হোতো।

আকবরের সময় এই অবস্থা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই কুসংস্কার আরও পাকাপোক্ত হবে তাতে আর সন্দেহ কি? মৌলানা সৈয়দ আহমদ শহীদ সহ অন্য সব স্বনামখ্যাত মৌলানা যাঁরা একদিকে ইংরাজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন অন্যদিকে ইসলামী শরীয়তের রিভাইভ্যালিজমের প্রচার করেছিলেন তাঁদেরও এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার করতে হয়েছিল। মৌলানা সৈয়দ আহমদের কথা তাঁর ক’লকাতা আগমন উপলক্ষে পূর্বেও উল্লেখ করেছি।[১০]

সমাজ সংস্কারে যে লোকাচারের সম্মুখীন বিদ্যাসাগর হয়েছিলেন সে লোকাচার তো বহুদিনের প্রচলিত ও সামন্ত সমাজে লালিত ও পুষ্ট লোকাচার। ইংরাজ আমলে যে-বুর্জোয়া সমাজ দেখা দিচ্ছিল তা খুবই দুর্বল আর প্রারম্ভের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থার ফলে সামন্ত সমাজের সঙ্গে তার নাড়ির বিচ্ছেদ হয়নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে নতুন করে সৃষ্ট হয়েছিল। মেয়েদের অধিকারের ব্যাপারে ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে যে আন্দোলন হয়েছিল তার পিছনে সমর্থন দেখলেই সেটা আরও পরিষ্কার বোঝা যায়। মেয়েদের সামান্য কিছু প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে যতদূর সমর্থন ছিল, বিধবা বিবাহের পক্ষে ততদূর ছিল না।

আবার শেষোক্তের পক্ষেও যতটা ছিল উচ্চশিক্ষার পক্ষে ততটা ছিল না। এমন কি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও" লিখলেন : "...আমরা বঙ্গীয় স্ত্রীলোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী হওয়া বঙ্গদেশের বিশেষ মঙ্গলের ও উন্নতির চিহ্ন বিবেচনা করি না·· বঙ্গীয় স্ত্রীলোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে শিক্ষিতা হইলে বঙ্গীয় শিক্ষিত পুরুষদিগের ন্যায় তাঁহারা ধর্মে বিশ্বাসশূন্য ও সুনীতি বিচ্যুত হইবে।..." (চৈত্র, ১৮০২ শক)

বস্তুতঃ মেয়েদের অধিকার যেখানেই সীমিত সে বিধবাবিবাহের প্রশ্নেই হোক বা শিক্ষা, সম্পত্তির অধিকার যে কোনও প্রশ্নেই হোক তা' মূলতঃ সমাজের বিকাশ ও তার চরিত্রের সঙ্গে জড়িত। এর যে কোনটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় যদিচ বুর্জোয়া চিন্তানায়কেরা সেইভাবেই জিনিসটি উপস্থিত করতে অভ্যস্ত। উনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে নানারূপ বঞ্চনা সমস্ত শোষিত শ্রেণীর ভাগ্যেই ছিল। বলা বাহুল্য মেয়েদের উপর ছিল বেশী। কিন্তু ১৮৬৯ সালে মিলের 'সাবজেকশান অব উইমেন' যখন প্রকাশ হচ্ছে তার বহুপূর্বেই কলে-কারখানায় মেয়েদের মজুর খাটতে বাধ্য করেছে ইংলণ্ডের বুর্জোয়া সমাজ। মেয়েরা শোষণের পরিপূর্ণ রূপ নারী-শিশু-পুরুষ সকলের উপর নিষ্পেষণ দেখতে পেয়েছে এবং সংগ্রামের সাথী পুরুষ শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে অধিকারের জন্য লড়েছে। কমিউনিস্ট ইস্তাহার এর বহু আগে মেয়েদের অধিকার অর্জনের পথ দেখিয়ে দিয়েছে। তবু মিল্ বললেন, মেয়েরা যে ধরনের অসুবিধার থেকে ভুগছে তা হচ্ছে "**সলিটারী** একজাম্পল্ অব দি কাইণ্ড ইন মডার্ন লেজিসলেশান—আধুনিক আইন ব্যবস্থার ঐরূপ অসুবিধার **একমাত্র** নিদর্শন।" [১২] (বড় অক্ষর আমার)। প্রলেতারিয়েত তার অংশ হিসাবে তার বিশেষ দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বড় সহযোগী পাচ্ছিল এবং নিজ অধিকারের সংগ্রামে নতুন হাতিয়ার পাচ্ছিল, বুর্জোয়া লেখক মিল তাকে স্বীকৃতি দেন না যেমন উপনিবেশের অধিবাসী তথা ভারতবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রনের যোগ্যতা আছে কি না, নিগ্রোর রাজনৈতিক অধিকার তথা ভোটাধিকার প্রয়োগ করার যথার্থ যোগ্যতা আছে কিনা—এসব বিষয়ও যাদের কাছে তর্কের বিষয় হতো তাদের কাছে নারীর যোগ্যতার প্রশ্ন আসবে এতে আর আশ্চর্য কি? নারীর কতদুর যোগ্যতা এ প্রশ্ন উঠছিল। শুধু বিরোধীরা নয় সংস্কারপন্থীরাও তুলছিলেন। এর উত্তরে রামমোহন তাঁর সহমরণ সংক্রান্ত পুস্তকে এক চপেটাঘাত দিয়েছিলেন তা' স্মরণে রাখার মতো। রামমোহন বলেছিলেন : "যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্যদ্বারা স্বামীর উদ্দেশ্যে অগ্নিপ্রবেশ করিতে

উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, অথচ কহেন, যে তাহাদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য নাই।"

নারীজাতির অসুবিধা শোষণ ব্যবস্থারই অঙ্গ এবং শোষণ ব্যবস্থার পরিসমাপ্তিতেই এর সম্পূর্ণ পরিসমাপ্তি সম্ভব। এঙ্গেল্‌স্ বলেছিলেন "ইতিহাসে শ্রেণী বিরোধ প্রথম যা' দেখা দেয় সেটা মিলে যায় এক পতি-পত্নী বিবাহে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বিকাশের সঙ্গে এবং প্রথম শ্রেণীর পীড়ন মিলে যায় পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীজাতির পীড়নের সঙ্গে।" বিষয়টি সংক্ষেপে উপস্থিত করার জন্য হালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করছি। "নারী জাতির দাসত্বের মূল নিহিত রয়েছে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে। আদিম যৌথ সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণী বলে কিছুই ছিল না; তখন মানুষের দ্বারা মানুষ শোষিত হত না, তখন সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীরা অংশগ্রহণ করতো, প্রধান ভূমিকাও গ্রহণ করতো। কিন্তু আদিম যৌথ ব্যবস্থা ভেঙে যখন দাস সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হলো, দেখা দিল শ্রেণী আর শোষণ, তখনই দেখা দিল নারীর দাসত্ব, কেননা সেই সমাজব্যবস্থায় সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর আর কোনো আসন, কোনো ভূমিকাই থাকলো না এবং সেই ধারাটাই চলে এসেছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়। কিন্তু ধনতন্ত্র নিজের প্রসারের গতিবেগে কলে কারখানায় খনিতে পুরুষ শ্রমিকদের সঙ্গে সঙ্গে নারী শ্রমিকদের নিষ্ঠুর শোষণের ব্যবস্থাও চালু করেছে। এভাবে নিজেরই অলক্ষ্যে ধনতন্ত্র নারীদের সামাজিক উৎপাদনের প্রক্রিয়ার মধ্যে আবার টেনে এনেছে। সামাজিক উৎপাদনে নারীদের টেনে নিয়ে এসে ধনতন্ত্র নারীজাতির মুক্তির পথই প্রস্তুত করেছে।

এই ধারার বর্ণনা প্রসঙ্গে এঙ্গেলস লিখেছিলেন: "পুরনো সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালীতে যেখানে বহু দম্পতি ও তাদের ছেলেমেয়েরা থাকতো সেখানে গৃহস্থালীর ব্যবস্থা স্ত্রীলোকদের উপর ন্যস্ত ছিল—এই কাজটি পুরুষের খাদ্য আহরণের মতোই একটা সামাজিক প্রয়োজনীয় বৃত্তি বলে গণ্য হতো। পিতৃপ্রধান পরিবার আসার সঙ্গে অবস্থা বদলে গেল এবং আরও বেশী বদলালো এক পতি-পত্নী স্বতন্ত্র পরিবার আসার ফলে। গৃহস্থালীর কাজকর্মের সামাজিক বৈশিষ্ট্য চলে গেলো। এটি আর সমাজের দেখবার বিষয় রইলো না, এটি হয়ে দাঁড়ালো ব্যক্তিগত সেবা। সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে বহিষ্কৃত হয়ে স্ত্রী-ই হলো প্রথম ঘরোয়া ঝি। কেবলমাত্র আধুনিক বৃহৎ শিল্পই আবার তাদের সামনে সামাজিক উৎপাদনে প্রবেশের দরজা খুলে দিয়েছে, অবশ্য কেবলমাত্র প্রলেতারীয় স্ত্রীলোকদের জন্যই।"

মূল কথাটা হলো এই যে, উৎপাদনের উপায়ে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং পরস্পরবিরোধী শ্রেণীর উদ্ভবের ফলেই নারীজাতির দাসত্ব শুরু হলো। সেইজন্য সমাজব্যবস্থার ইতিহাসে যতদিন উৎপাদনের উপায়ে ব্যক্তিগত মালিকানা বিরাজ করতে থাকবে ততদিন মেয়েরা পদানত হয়েই থাকবে।

ধনতন্ত্রী সমাজে যাঁরা নিজেদের প্রগতিশীল বলে জাহির করেন তাঁরা পত্র-পত্রিকার মারফত এই কথাই প্রচার করেন যে, তাঁরা গণতন্ত্রের পূজারী এবং তাঁরা নারীকে গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছেন, দিয়েছেন সমানাধিকার। তাঁরা আরো প্রচার করেন যে, তাঁদের রাষ্ট্র হচ্ছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেখানে আইনের চোখে নারী ও পুরুষ সকলেই সমান।

এইসব প্রগতিশীলদের প্রচার যে কত অর্থহীন তা লেনিনই দেখিয়ে দিলেন। "বুর্জোয়া গণতন্ত্র মুখে সাম্য ও স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয়। কাজের বেলায় কোন বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র, এমনকি সবচেয়ে উন্নত প্রজাতন্ত্রেও মানবজাতির অর্ধেক যে নারী সমাজ, তাদের আইনতঃ পুরুষের সঙ্গে পূর্ণ সাম্য অথবা পুরুষের অভি-ভাবকত্ব ও পীড়ন থেকে মুক্তি দেয়নি।" (দেশহিতৈষী, ৫ই জুন, ১৯৫০ পৃষ্ঠা ৭)।

একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লব সাধিত হওয়ায় প্রলেটারি-য়েটের একনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার কার্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (বলা বাহুল্য বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ধারায় নারীর আইনগত সমানাধিকারের দাবীর আন্দোলনের মূল্য নেই এমন কথা বলা হচ্ছে না। যথেষ্ট মূল্য আছে। কারণ, এই সংগ্রাম বাস্তব সমানাধিকারের লক্ষ্যকে সামনে আনা আরও সহজ করে; তাছাড়া, সংগ্রামের উপযোগী ক্ষেত্রও তৈরী করতে সাহায্য করে।)

শ্রদ্ধেয় প্রভাত মুখোপাধ্যায় বঙ্কিম সম্বন্ধে বলেছেন "বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের তিনি ছিলেন পরম বিরোধী। স্বরচিত প্রবন্ধে ও উপন্যাসে তিনি বিদ্যাসাগরের প্রাগ্রসর মতের প্রতি কারণে অকারণে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন।"[১৩] বঙ্কিমের পক্ষে এ স্বাভাবিক। "স্ত্রীলোকের পতি দেবতা..." মহিলাকে দেখে উঠে দাঁড়ালে পুরুষকে শুনতে হয়, "স্ত্রীলোকের অত সম্মান করিতে নাই" (দেবী চৌধুরাণী)। বঙ্কিম লিখলেন, "যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রে বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকে, তবে সেই শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া কপটতা।" মেয়েদের অধিকার এবং স্ত্রী-পুরুষ পারস্পরিক সম্পর্কে মর্যাদার মনোভাব সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর ধারণা আমরা যখন জানি, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধে তাঁর এই ক্ষোভের প্রকৃত কারণ কি তাও আমরা বুঝি।

রবীন্দ্রনাথ এই বিষয় বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গীর নিম্নমর্মে সমালোচনা করেছেন। বঙ্কিম ইউরোপের বহুবিবাহ-বিরোধিতা সম্বন্ধে লিখছেন, "যদি য়ুরোপের এ কুশিক্ষা না হইত তাহা হইলে বোনাপার্টিকে জোসেফাইনের বর্জন রূপ অতি ঘোর নারকী পাতকে পতিত হইতে হইত না ; অষ্টম হেনরীকে কথায় কথায় পত্নীহত্যা করিতে হইত না। য়ুরোপে আজি কালি সভ্যতার উজ্জ্বলালোকে এই কারণে অনেক পত্নীহত্যা হইতেছে।" এর দ্বারা তর্কটার মীমাংসা কি হলো, এ প্রশ্ন তুলে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যদি তোমার স্ত্রী রুগ্ণ অক্ষম হয় তবে তুমি বিবাহ করিতে পার, অথবা যদি অন্য স্ত্রী বিবাহ করিতে তোমার ইচ্ছা বোধ হয় তাহা হইলেও তুমি বিবাহ করিতে পার, কারণ, সেইরূপ ইচ্ছার বাধা পাইয়া ইংলণ্ডের অষ্টম হেন্‌রী পত্নীহত্যা করিয়াছিলেন ; কিন্তু কোনো কারণ না থাকিলে বিবাহ করিও না। জিজ্ঞাস্য এই যে, স্বামীকে যে-যুক্তি অনুসারে যে সকল স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী করা হইল, ঠিক সেই যুক্তি অনুসারে অনুরূপ স্থলে স্ত্রীর প্রতি অনুরূপ ক্ষমতা অর্পণ করা যায় কিনা এবং আমাদের সমাজে স্ত্রীর সেইসকল স্বাধীন ক্ষমতা না থাকাতে অনেক স্ত্রী অতি ঘোর নারকীপাতকে পতিত হয় কি না।" [১৪]

মুসলমান সমাজের ক্ষেত্রেও যখন ঐরূপভাবে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তখন নারীর অধিকারের ক্ষুণ্ণতা ও স্ত্রী-পুরুষের অসাম্যটা রূঢ় ভাবেই নজরে আসে। ধর্মের ব্যবস্থায় স্ত্রীকে স্বামীর দণ্ডদানের অধিকার আছে। দণ্ডদানে এমনকি কামরায় বন্ধ করে রাখার বা দেহে আঘাত করার অধিকার আছে। দুকথা উচ্চারণ করে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা আছে। স্ত্রীর কিন্তু সে রকম কোনও অধিকারও নাই। বহুবিবাহ অবশ্য হিন্দু সমাজেও যেমন অচল হয়ে গিয়েছিল মুসলমান সমাজেও তাই। কিন্তু নরহত্যাকে অপরাধ ধরা হয় সদাসর্বদাই নর-হত্যা হয়ে চলেছে বলে তো নয়। সমাজে মানুষের জীবন সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গী থাকা দরকার তা বজায় রাখার জন্যও। অথচ ভারতের বাইরে অন্যান্য রাষ্ট্রে মুসলমান সমাজে যেমন বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হয়েছে ভারতেও তেমনই হোক এ-প্রশ্ন উঠালেই জবাবে বলা হয়—বহু-বিবাহ সংখ্যায় নগণ্য এবং সেইজন্য আইনের প্রয়োজন নাই। এ যুক্তি যে টেঁকসই নয় সহজেই বোধ্য। হিন্দু সমাজেও আইনের পূর্বে বহু-বিবাহ সচরাচর ঘটছিল এমন নয়।

তবে বুর্জোয়া সমাজে এসব সংস্কার বাস্তব ক্ষেত্রে ভূয়া প্রবঞ্চনায় দাঁড়িয়ে যায় তা' আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

শিক্ষা

রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখের শিক্ষা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীও আজকের এই স্মৃতি-দিবস পালন উপলক্ষে স্মরণ করা প্রয়োজন। দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গী পর পর উদ্ধৃত হ'তে দেখলে আপাতদৃষ্টিতে অর্থের দিক থেকে সমব্যাপী মনে নাও হতে পারে। কিন্তু মূলতঃ তার ওরিয়েণ্টেশান (দিকস্থিতি) একই একথা সহজেই বোঝা যায়।

পূর্বে দেশের শিক্ষা সংক্রান্ত এক প্রবন্ধে দেখিয়েছিলাম কেমন করে জমিদারী প্রথা প্রবর্তনের ফলে বাংলা দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। রায়তওয়ারী এলাকা মাদ্রাজ প্রভৃতিরও দুর্ভাগ্য এই প্রায় মহাশূন্যতার পর্যায়ে পড়েনি। সে-সব এখানে আর বিস্তৃত আলোচনা করতে চাচ্ছি না। যেমন চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতরা তেমনি গ্রামের মক্তব-পাঠশালার শিক্ষকরা জীবিকার উপায়ে হয় শহরে কিংবা অন্যত্র যেখানে রুজী জুটছিল সেখানে ছুটছিল। আমরা রাজনারায়ণ বসুর লেখায় জানি যে তিনি যে-শিক্ষকের কাছে বাংলা প্রাথমিক পাঠ পড়েছিলেন তিনি বর্ধমান জেলার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-স্মৃতিতে একজনের কথা উল্লেখ করেছেন। "যদিও ছোট ছেলেদের চাকর বলিয়া ভৃত্য-সমাজে পদ-মর্যাদায় সে অনেকের চেয়ে হীন ছিল, তবু কুরু সভায় ভীষ্ম পিতামহের মতো সে আপনার কনিষ্ঠদের চেয়ে নিম্ন আসনে বসিয়াও আপন গুরু গৌরব অবিচলিত রাখিয়াছিল।...তাহার নাম ঈশ্বর। সে পূর্বে গ্রামে গুরুমশাইগিরি করিত।" গ্রামের গুরু, কলকাতায় জমিদার-বাড়ির চাকর! অবস্থা এই পর্যায়ে পৌছেছিল। ইতিমধ্যে খৃষ্টান ভক্তদের মনে ভারতে শিক্ষার ব্যাপারে ইংলণ্ডে আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা হয়। কিন্তু রাজব্যবস্থায় তার সাড়া পাওয়া গেল তখনই যখন ইংরাজ বুঝলো তার নিজ দেশে প্রসারমান শিল্পব্যবসার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ভারতে শাসন ব্যবস্থার জন্য বিলাত থেকে লোক পাঠানোর চেয়ে ভারতে সস্তায় কর্মচারী তৈরী করা যায়। ১৮১৩ সালে শিক্ষা ব্যবস্থায় এক লক্ষ টাকা গ্র্যাণ্ট করা হয়। ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাসের কিছু পুরাতন শিক্ষাবিষয়ক পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্যত্র এই অর্থনৈতিক কথাটা উল্লেখ করা হয় না ইংরাজের সদাশয়তা প্রচারের জন্য। মেকলের একটি উক্তি অবশ্য উদ্ধৃত হয় যাতে তিনি বলেছিলেন, এই শিক্ষা মাধ্যমে একদল মানুষ তৈরী করা হবে যারা চেহারায় ভারতবাসী হলেও মনে প্রাণে হবে ইউরোপীয়। কিন্তু উপরোক্ত অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যটি অনুক্ত রেখে শুধু মেকলের উক্তি বলে সঙ্গে সঙ্গে আর একটা উদ্দেশ্যও অনেক সময় সাধিত হয়েছে। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-অক্ষয় দত্ত প্রমুখের শিক্ষা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীকে বিনিন্দিত করা এবং দেশীয় লোকসমাজে খাটো করা। এইভাবে মেকলের ঐ

উক্তিকে হিন্দু-মুসলমান রিভাইভেলিজম্ ও অন্ধ জাতিদম্ভের সেবায় লাগানো হয়েছে। জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীজীর নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন প্রভৃতির মাধ্যমে রাজনীতি যখন ধর্মান্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো তখনই অবশ্য এই জিনিসটি বেশী সুস্পষ্ট হয়েছে। আমি অবশ্য উপরে যা বলেছি ১৮১৩ থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সমগ্র কালটার বিষয় সংক্ষেপে বলেছি। ঘটনা-সমূহ অন্যত্র এবং আমার "শিক্ষা ও শ্রেণীসম্পর্ক" পুস্তকে উল্লিখিত হয়েছে বলে এখানে আর পুনর্বিবৃত করলাম না।

রামমোহনের জীবনীকার লিখেছেন: [১৫] "তাঁহার সময়ে রাজপুরুষদের মধ্যে একটা বিচার চলিতেছিল। একপক্ষের মত এই ছিল যে এতদ্দেশীয় লোককে ইংরাজী শিক্ষা না দিয়া সংস্কৃত ও পারসী শিক্ষাই দেওয়া বিধেয়, অপরপক্ষ ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন।...এই বিচারের সময় রামমোহন তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমে উক্ত বিষয়ে একটি পত্র লেখেন। সেই পত্রে তিনি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে কেবল সংস্কৃত ও পারসী শিক্ষায় এ দেশীয় লোকের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা নাই। ইংরাজী শিক্ষা ব্যতীত লোকের দৃঢ় নিবদ্ধ কুসংস্কার কখনই নির্মূল হইবে না...কুসংস্কার বিনাশ ও সামাজিক উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য জ্ঞান যার পর নাই আবশ্যক।" এই পত্রে তিনি বেকনের আবির্ভাবের পূর্বে ও বেকনের আবির্ভাবের পর পাশ্চাত্য শিক্ষার যে পার্থক্য হয় তাও পরিষ্কার করে স্মরণ করিয়ে দেন। দেশী কুসংস্কারের পরিবর্তে বিদেশী কুসংস্কারের আমদানী তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। পাশ্চাত্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের অবলম্বন করে সংখ্যা ১৩টিকে অশুভ মনে করেন এদেশের গোঁড়া রক্ষণশীল মানুষ অনেকে। ঠিক এইটি না হোক কমবেশী অনেক প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারা এমনকি কুসংস্কার পাশ্চাত্য থেকেও আমদানী করা হয়েছে। যাঁরা যুক্তিবাদী তাঁরা তা করেননি। তাঁরা তেমন নয়। বেকনের যারা অনুগামী তারাও নয়। বেকন সম্বন্ধে মার্কস-এঙ্গেল্‌স্ বলেছেন: "ইংরাজী বস্তুবাদের আসল প্রবর্তক হলেন বেকন। তাঁর কাছে প্রাকৃতিক দর্শনই হলো একমাত্র সত্য দর্শন এবং ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করা পদার্থবিদ্যা হল প্রাকৃতিক দর্শনের প্রধান ভাগ।" (কল্পস্বর্গ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র পুস্তকের ভূমিকায় এঙ্গেল্‌স্ কর্তৃক উদ্ধৃত) রামমোহনের উপরিউক্ত পত্রের সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।[১৬]

"When this seminary of learning was proposed, we understood that the Government in England had ordered a

considerable sum of money to be annually devoted to the instruction of its Indian subjects. We were filled with sanguine hopes that this sum would be laid out in employing European gentlemen of talent and education to instruct the natives of India in Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy and other useful sciences, which the natives of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above the inhabitants of other parts of the world,···We find that the Government are establishing a Sanskrit School under Hindoo Pundits to impart such knowledge as is already current in India."

এরপর রামমোহন সেকালের সংস্কৃত পণ্ডিতদের মাথামুণ্ডহীন তর্কাতর্কির কিছু দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে দেখান এরূপ বিদ্যার্জন নিতান্তই নিরর্থক হবে। বলা বাহুল্য আরবী ফারসী ধর্মসাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। ডক্টর খুদাবখ্স্ এঁদের বিষয় আলোচনা করে রক্ষণশীলদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। ফিরোজ তুগলকের সময় একজন সত্যই পণ্ডিত লোক শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদী (মৃত্যু ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দ) তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মৌলানা সেখ আবুল ফাতা জৌনপুরীর সঙ্গে তিক্ততার সঙ্গে 'এই তর্কবিচারে দীর্ঘদিন কাটিয়েছিলেন যে বিড়ালের মুখের লালা পাক কিংবা নাপাক। যাইহোক পণ্ডিতদের এইসব নিরর্থক তর্কালোচনা শিখিয়ে কিছু লাভ হবে না, এই সব বলে রামমোহন লিখছেন :—

"Neither can much improvement arise from such speculations as the following which are the themes suggested by the Vedanta :—in what manner is the soul absorbed in the deity? What relation does it bear to the Divine Essence? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother etc. have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better. Again, no

essential benefit can be derived by the student of the Mimansa from knowing what it is that makes the killer of a goat sinless by pronouncing certain passages of the Vedanta, and what is the real nature and operative influence of passages of the Vedas, etc.

The student of the Nyaya Shastra cannot be said to have improved his mind after he has learned from it into how many ideal classes the objects in the universe are divided and what speculative relation the soul bears to the body, the body to the soul, the eye to the ear, etc.

In order to enable Your Lordship to appreciate the utility of encouraging such imaginary learning as characterized, I beg Your Lordship will be pleased to compare the state of science and literature in Europe before the time of Lord Bacon with the progress of knowledge made since he wrote.

If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen, which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences, which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, instruments and other apparatus.

In representing this subject to Your Lordship, I conceive

myself discharging a solemn duty which I owe to my countrymen…"

এর অর্থ অবশ্যই এ হতে পারে না যে রামমোহন সংস্কৃত, আরবী, ফারসী ভাষাগুলি দেশের লোকের শেখার বিরুদ্ধে। তাঁর মূল বক্তব্য হচ্ছে সরকার যে-অর্থ মঞ্জুর করছেন তা "টু ইমপার্ট সাচ্ নলেজ অ্যাজ ইজ অলরেডি কারেন্ট ইন ইনডিয়া" (যা ভারতে এখন চালু আছে এমন জ্ঞানদানে) ব্যয়িত না হয়। বেকনের অনুসরণ করে পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের নানাবিধ শাখা শেখানোর ব্যবস্থা যেন তাতে হয়।

যাই হোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ১৮৫৩ সালে জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ঐমত ভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিমত রাখার এক সমস্যার সম্মুখীন হন। তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। ইতিপূর্বে ১৮৫২ সালে সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসূচী এবং পাঠব্যবস্থা সম্বন্ধে পরিকল্পনা দিয়ে একটি নোট তিনি কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য দেন। (এই নোট বর্তমান প্রবন্ধে পরে উল্লেখ করার প্রয়োজন হবে।) এই পরিকল্পনা বিবেচনার এক স্তরে বেনারস সংস্কৃত কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষ ব্যালানটাইনের উপর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পরিদর্শনের ভার দেওয়া হল। ব্যালানটাইন সংস্কৃত কলেজ ও তার অধ্যক্ষের পরিচালনা সম্বন্ধে প্রশংসা-সূচক মন্তব্য দিলেও, পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে এমন কতকগুলি জিনিস উপস্থিত করেন যার প্রতিবাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে করতে হয়। ভাববাদী দার্শনিক বার্কলের পুস্তক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যালানটাইন অনুমোদন করেন। লেনিন ভাববাদী দর্শনের নবতম অবদানগুলির সমালোচনা করার জন্য এবং তারা যে রূপগ্রহণ করেই দেখা দিক প্রকৃতপক্ষে তারা যে ভাববাদী এই সত্যটি বোঝাবার জন্য তাঁর "মেটিরিয়ালিজ্‌ম এণ্ড এমপিরিও ক্রিটিসিজ্‌ম" পুস্তকে প্রথমে 'পুরাতন ভাববাদী বার্কলের তত্ত্ব' ব্যাখ্যা করেন। বার্কলের সূত্র হচ্ছে "অনুভূত হওয়ার মধ্যেই বস্তুর অস্তিত্ব।" অনুভবকারীর মনের বাইরে তার কোনও অস্তিত্ব নাই। এই সূত্র ধরে বার্কলে এই সিদ্ধান্তে পৌছালেন যে বৈজ্ঞানিকের কাজ হচ্ছে "প্রকৃতির স্রষ্টার ভাষা বুঝার জন্য সাধনা করা এবং বাস্তব কারণের দ্বারা প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যা করার ভণিতা না করা।" এ হলো বেকনের প্রদর্শিত পথের বিপরীত। বেকনের মত হল মনে পূর্ব হতে যে সব ধারণা ও সংস্কার আছে (যা নানান উপায়ে মনে এসে থাকতে পারে) তাকে বাদ দিয়ে মনকে পরিষ্কার করে নিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতার যাচাইয়ে সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে। বিস্তৃত দার্শনিক আলোচনার প্রস্তাব এখানে

নেই। শুধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বক্তব্য বোঝার জন্য যেটুকু উল্লেখ করা দরকার তারই চেষ্টা করলাম। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি রামমোহন বেকনের দর্শনকেই অভিনন্দন দিয়েছেন! উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যাবে বিদ্যাসাগরও তখনকার কালের পাশ্চাত্য বস্তুবাদী দর্শনেরই সমর্থক। বিদ্যাসাগর ব্যালানটাইনের রিপোর্টের বিষয়ে তাঁর পত্রে অন্যান্য কথার মধ্যে বললেন[১৭]: "বিশপ বার্কলের 'ইনকোয়েরি' বই সম্বন্ধে আমার মত এই যে পাঠ্যপুস্তক রূপে এ বই পড়ালে সুফলের চেয়ে কুফলের সম্ভাবনা বেশী।

"কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য আমাদের পড়াতেই হয়। কি কারণে পড়াতে হয় তা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্তদর্শন (ফলস্ সিসটেম্‌স্ অফ ফিলজফি), সে সম্বন্ধে এখন আর বিশেষ মতভেদ নেই। তবে ভ্রান্ত হলেও এই দুই দর্শনের প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। সংস্কৃতে যখন এইগুলি পড়াতেই হবে তখন তার প্রতিষেধক হিসাবে ছাত্রদের ভাল ভাল ইংরাজী দর্শন শাস্ত্রের বই পড়ানোর দরকার। বার্কলের বই পড়ালে সে উদ্দেশ্য সাধিত হ'বে বলে মনে হয় না। কারণ সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের মত বার্কলে একই শ্রেণীর ভ্রান্তদর্শন রচনা করেছেন। ইউরোপেও এখন আর বার্কলের দর্শন খাঁটি দর্শন বলে বিবেচিত হয় না, কাজেই তা পড়িয়ে এখন লাভ হবে না। তা ছাড়া হিন্দু ছাত্ররা যখন দেখবে যে বেদান্ত ও সাংখ্যের মতামত একজন ইউরোপীয় দার্শনিকের অনুরূপ তখন এই দুই দর্শনের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আরও বাড়তে থাকবে। এই অবস্থায় বিশপ বার্কলের বই পাঠ্য হিসাবে প্রচলন করতে আমি ব্যালেনটাইনের সঙ্গে একমত নই।......ব্যালেনটাইন আরও বলেছেন,—এমনএক শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষ গড়ে তোলার দরকার, যাঁরা পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দুই দেশের শাস্ত্রেই পণ্ডিত হয়ে উঠবেন এবং কতকটা দ্বিভাষী টীকাকারের মত কাজ করে উভয়ের মধ্যে যেখানে বাহ্য অনৈক্য আছে সেখানে সত্যকার অন্তর্নিহিত মিল কোথায় তা দেখিয়ে দিয়ে অনাবশ্যক কুসংস্কার দূর করবেন। হিন্দুদের দার্শনিক আলোচনা যে সব মৌলিক সত্যে পৌছাবে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে তাদের পূর্ণতর বিকাশ দেখিয়ে উভয়ের সমন্বয়ের পথ খুলে দেবে।

"দুঃখের বিষয় আমি এ বিষয়ে ব্যালেনটাইনের সঙ্গে একমত নই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে সব জায়গায় মিল দেখানো সম্ভব নয়। সম্প্রতি আমাদের দেশে বিশেষ ক'রে কলকাতায় ও তার আশেপাশে পণ্ডিতদের মধ্যে একটা অদ্ভুত মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। শাস্ত্রে যার বীজ আছে এমন কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনলে, সেই সত্য সম্বন্ধে তাঁদের শ্রদ্ধা ও

অনুসন্ধিৎসা জাগা দূরে থাক, তার ফল হয় বিপরীত। অর্থাৎ সেই শাস্ত্রের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস আরও গভীর হয় এবং শাস্ত্রীয় কুসংস্কার আরও বাড়তে থাকে। তাঁরা মনে করেন যেন শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রেরই জয় হয়েছে, বিজ্ঞানের জয় হয় নি।…"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি আলোচনা করে শ্রীবিনয় ঘোষ বলেছেন :—"……একটি সুরই ধ্বনিত হয়েছে। সেই সুরটি হল পাশ্চাত্য বিদ্যার সঙ্গে ভারতবিদ্যার সমন্বয়।" উপরে যা' উদ্ধৃত করলাম তা হতে সহজে যে-সিদ্ধান্ত হয় সেটা হচ্ছে এর বিপরীত। (অবশ্য 'ভারতবিদ্যা' শব্দটিতে তিনি কি বলতে চান তার উপরও অর্থটা নির্ভরশীল।) উপরে বিদ্যাসাগরের বক্তব্যে ভারতের পুরাতন শাস্ত্রাদি পড়াবার সময় ইংরাজী দর্শন পড়ানো যেখানে অনুবাদকের ভাষায় "প্রতিষেধক" হিসাবে বলা হয়েছে সেখানে, বিদ্যাসাগরের মূল ইংরাজীতে এইরূপ আছে :—While teaching these in the Sanskrit course we should oppose them by sound philosophy in the English course to counteract their influence.—যাকে 'অপোজ' করতে হবে, যার বিরোধিতা করতে হবে, যার "ইনফ্লুয়েন্স"কে কাটাতে হবে, তার সঙ্গে সমন্বয়ের প্রশ্ন কি করে আসে? সমন্বয়ের কথা কনসিলিয়েশান এবং এগ্রিমেন্টের কথা তো ব্যালেনটাইনই তুলেছিলেন। বিদ্যাসাগরের মূল খসড়া প্রস্তাব ১৮৫২ সালের ৪ঠা এপ্রিল যা রচিত তার মধ্যেও বিদ্যাসাগরের দৃঢ় মত পরিষ্কার বেরিয়ে আসছে। তাতেও সমন্বয়ের কোনও চিহ্ন নাই। তাঁর প্রথম বক্তব্য হচ্ছে 'উন্নত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা।' দ্বিতীয় বক্তব্যে তিনি পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন যে 'ইউরোপীয় আকর থেকে যাঁরা জ্ঞান বিদ্যার উপকরণ আহরণ করতে সমর্থ নন…তাঁরা এই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না।' আর তাঁর কাছে ইউরোপীয় জ্ঞান বিদ্যা বলতে কি বুঝায় তা উপরেই পরিষ্কার করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে সেই বিদ্যা যার সঙ্গে ভাববাদ প্রভাবিত ধ্যান ধারণার কোনও সম্পর্ক নাই। সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য তৃতীয় পয়েন্ট—যদিচ তার গুরুত্ব কম নয়। এ বিষয়ে তিনি সমভাবেই পরিষ্কার। "যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী নন, তাঁরা সুসংবদ্ধ প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় রচনা সৃষ্টি করতে পারবেন না।" যেখানে তিনি বলছেন প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের হিন্দু দর্শন জানা উচিত সেখানেও তিনি উল্লেখ করতে ভুলছেন না যে তাদের "মতামত আধুনিক যুগের প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না।" তাঁর পূর্ণ বাক্যটি হচ্ছে এইরূপ :—"একথা ঠিক যে হিন্দুদর্শনের অনেক মতামত আধুনিক অনেক মতামতের সঙ্গে খাপ খায় না কিন্তু তা হ'লেও প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ

পণ্ডিতের এই দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত।" এ তো অত্যন্ত সঠিক কথা। শুধু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কেন, সকলেরই তো যতটা সম্ভব জানার চেষ্টা করা উচিত।

ব্যালেনটাইনের কামনা পূর্ণভাবে পূরণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ প্রমুখ। 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' পুস্তকের রচয়িতা আদি ব্রাহ্ম সমাজের রাজনারায়ণবাবুকে বাদ দেওয়া যায় কি করে? রিভাইভ্যালিজমের একজন নায়ক শশধর তর্কচূড়ামণি সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় প্রভাত মুখোপাধ্যায়ও লিখছেন: "ধর্ম তাঁহার মতে এক লৌকিক ব্যাপার—ইহার উপর হিন্দুদের আচার ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দান করিয়া সকলকে তিনি স্তম্ভিত করিয়া দিলেন; হাঁচি টিক টিকি শিখাধারণ, প্রভৃতি অসংখ্য লোকাচার বৈজ্ঞানিক সত্য।"[১৮] শ্রদ্ধেয়, মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন করছেন: "বাংলার তরুণদের উপর চূড়ামণির মত পণ্ডিতের প্রভাব কিরূপে সম্ভব হইল তাহা ভাববার বিষয়।" ইতিমধ্যে জমিদারী প্রথার প্রভাব অনেক বেড়েছিল, থাকে থাকে বড় থেকে ছোট জমির অনেক উপস্বত্বভোগী সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রামে শিক্ষিত পরিবারের মধ্যে কুশীদজীবীর কারবারও যথেষ্ট বেড়েছিল। স্যাডলার কমিশন সিদ্ধান্ত করেছেন ১৮৮২ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত পাটের দর উত্তরোত্তর বেড়েছিল। এর ফলে জমির উপস্বত্বভোগী ও কুসীদজীবীদের আয় বেড়েছিল এবং এরই একটি পরোক্ষ ফল হিসাবে বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বেড়েছিল। এসব তদন্ত ও আলোচনার বিষয় হতে পারে। কিন্তু সাকারবাদী নিরাকারবাদী সকল প্রকার বস্তুবাদ বিরোধী, এমনকি ঘোর প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শিক্ষিত সমাজের উপর বেশী করে বৃদ্ধি পেতে লাগল—এর অন্যতম প্রধান কারণ যে জমির উপস্বত্বভোগীদের প্রভাববৃদ্ধি এতে কোনও সন্দেহ নেই।

মুসলমানদের মধ্যে 'সমন্বয়ের চেষ্টা'র কথা ওঠে না। কারণ তাঁদের ধর্মীয় নেতারা গোড়া থেকেই ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে। তবু জাস্টিস্ আমির আলী, স্যার সৈয়দ আহমদ প্রমুখের লেখায় অনুরূপ প্রচেষ্টা দেখা যায়। হালে এক মুসলমান পত্রিকাতেও দেখলাম ধর্মের কাহিনীর সঙ্গে মহাকাশ ভ্রমণের চেষ্টাকে মিলিত করার চেষ্টা হয়েছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বিমুখতা এইটাই ছিল মুসলমানদের মধ্যে প্রধান কথা। মৌলনা সৈয়দ হোসেন আহমদ মাদানীর পরিবারের কাহিনী পড়লেই এর বেশ কিছুটা ছাপ পাওয়া যায়। (উর্দু আত্মজীবনী 'নকশে হায়াত')। ১৯২০-২১ সালে কংগ্রেস খিলাফত আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার পর থেকে জীবনের

শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনী মোটামুটি উত্তর ভারতে পরিচিত। তিনি এবং দেও-বন্দের মাদ্রাসায় তাঁর সহকর্মীরা বরাবর জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে ও ১৯২০-২১ সাল থেকে কংগ্রেসের মধ্যে ছিলেন এবং কারাবরণ ইত্যাদি অন্যেরাও যেমন করেছেন তিনি ও তাঁর সঙ্গীরাও তেমনই করেছেন। স্বাধীনতার পরও তিনি কংগ্রেসেই ছিলেন। এঁর বা এঁর পিতার শৈশব বেশ কষ্টে কেটেছিল।

এঁর পিতার জন্ম ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ৩।৪ বৎসর পূর্বে। এঁর ঠাকুরমা দাদীও চরকা কেটে অতি কষ্টে এঁর পিতাকে মানুষ করেছিলেন। এঁদের পূর্বে জমিদারী ইত্যাদি ছিল। কিন্তু ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর তাঁরা বঞ্চিত হন। পিতা অতি কষ্টে উর্দু, ফারসী, হিন্দী লেখাপড়া শিখে নর্মাল স্কুলে পাশ করে হেডমাস্টারের চাকরী করেছিলেন। ইংরেজী শিখে চাকরীবাকরীর উন্নতি করবেন এরকম ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু যখন পড়তে আরম্ভ করলেন তখনই এক দুঃস্বপ্ন দেখলেন। মৌলানা হোসেন আহম্মদ লিখছেন: "প্রথম রাত্রেই পিতা স্বপ্নে দেখলেন তাঁর দুই হাত বিষ্ঠায় অপবিত্র হয়ে গেছে। এর জন্য তাঁর ইংরাজীর উপর ঘৃণা হয়ে গেল।" মনোভাবের তীব্রতা কি রকম ছিল তা এতেই বুঝা যাবে। শেষপর্যন্ত তিনি ১৮৯৪ সাল এরকম সময় এখান থেকে হিজরাত করে সপরিবারে মদীনা পৌছালেন। খুবই দুঃখ কষ্টে তাঁর সেখানে কেটেছে কিন্তু তবু দেশে ফেরেননি। মৌলানা হোসেন আহমদ দেওবন্দে অনেকদূর পর্যন্ত পড়ে-ছিলেন। কিছুদিন হলেই শেষ হতো। তাও হলো না। এক শুভার্থী তাঁকে লখনৌ-এ রেখে হাকিমী শেখাতে চেয়েছিলেন। পিতা রাজী হলেন না। তিনি বললেন: "ওকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়েছি। এখন কি গাধায় চড়াব? ওকে ধর্মশিক্ষা দীনিয়াতের শিক্ষা দিয়েছি—এর চেয়ে আর কি বড় শিক্ষা হতে পারে?" এসব ইতিহাস বাঙালী পাঠকের অপরিচিত বলে কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু এখানে এর বেশী বিবরণ দেওয়ার স্থান নেই।

মৌলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি—যিনি আফগানিস্তানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকেই হিজরাত করে গিয়েছিলেন। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, মৌলানা সিন্ধী প্রমুখের বাইরে থেকে ভারতের স্বাধীনতার কামনায় নানারূপ চেষ্টার কথা অনেকে শুনেছেন। শ্রদ্ধেয় কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' পুস্তকেও তাঁর উল্লেখ আছে। তিনি ছিলেন হিন্দু বা শিখ সন্তান। কমবয়সে স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়েছিলেন এবং আরবী ফারসী ভাষা ও ইসলামের ধর্মবিদ্যা শিক্ষা করে মৌলানা হিসাবে খ্যাত হয়েছিলেন। তিনি শেখুল হিন্দ বলে খ্যাত মৌলানা মহমুদ হাসানের নেতৃত্বে জেহাদ প্রচেষ্টার আন্দোলনে

যোগদানের পূর্বে দিল্লীতে এক মাদ্রাসায় অধ্যাপনার কাজ করছিলেন। "সেই মাদ্রাসার উদ্দেশ্য ছিল এই যে ইংরাজী শিক্ষার ফলে যেসব তরুণ মুসলমানের উপর ধর্মীয় বিশ্বাসাদির উপর বিরোধী প্রভাব পড়ছিল নাস্তিকতার বিষ সংক্রমিত হচ্ছিল তাকে ধ্বংস করা এবং কোরানের শিক্ষা এমনভাবে দেওয়া যাতে ইসলাম ধর্মের সম্বন্ধে তাদের সন্দেহ সংশয় সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়। শেখুল হিন্দ্‌ এই সময় মৌলানা ওবায়দুল্লাহর সঙ্গে দেখা করলেন ও বললেন শাসন ক্ষমতা ও রাষ্ট্র ক্ষমতা এখন ইংরাজের। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এই মাদ্রাসায় শিক্ষাদানে নিযুক্ত থাকবে এবং দশবিশ জন সঠিক খেয়ালের মুসলমান তৈরী করবে ততক্ষণের মধ্যে ইংরাজ হাজার হাজার নাস্তিক তৈরী করবে।"[১৯]

মৌলানা সৈয়দ আহমদ শহীদ যিনি ১৮২০ সালে প্রথমে রনজিত সিং-এর বিরুদ্ধে এবং পরে ইংরাজের বিরুদ্ধে জেহাদের ডাক দিয়েছিলেন ও কলকাতা এসে মুরীদ করে গিয়েছিলেন তখন থেকে শুরু করে বরাবর যে-মৌলানারা ইংরাজের বিরুদ্ধে নিজেদের নিযুক্ত করেছিলেন এবং যাঁরা ইংরাজের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন উভয়েরই তত্ত্বগত জেহাদ ছিল প্রধানতঃ বস্তুবাদ এমন কি কোনও প্রকার উদার মতের বিরুদ্ধে।

বস্তুতঃ অন্যতম ধর্মমত হিসাবে ভারতে প্রথম ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবার পর যেমন স্বফীরা তাঁদের নানান রকমের উদার মতামত প্রচার করেছেন তেমনই মৌলানারা তাঁদের চরম রক্ষণশীল মতবাদ প্রচার করে গেছেন। দিল্লী সাল-তানাতের সময় থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতার সহায়ক হিসাবে এঁদের প্রতিষ্ঠা থেকেছে। (এ মুজীব লিখিত "ইনডিয়ান মুসলিম" দ্রষ্টব্য।) বুখারী ও মুসলিমের এই হাদীশ অবশ্যমান্য হিসাবে প্রচারিত ছিল যে মুসলমান রাষ্ট্র ক্ষমতাকে মান্য করতেই হবে আবার হিদায়ার এ নির্দেশও ছিল যে বিধর্মীর শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। (উপরোক্ত পুস্তকে উদ্ধৃত।) কাজেই সব সময়ই মুসলমানদের মধ্যে উপর তলার শ্রেণীর এক অংশ কিংবা অন্য অংশ এক সময় কিংবা অন্য সময় একটিকে বা অপরটিকে কাজে লাগিয়েছে।

মুসলমান সমাজে মৌলানাদের আধিপত্য উপরতলার (সুপারস্ট্রাকচারের) একটি বিশিষ্ট অংশ। মৌলানা হোসেন আহমদ লিখেছেন[২০] "আমরা পুরাতন খেয়ালের মুসলমানদের বিরোধিতার পোজিশানটা জানতাম। মৌলানারা ও আলেমরা চাইতেন না মুসলমান সমাজের উপর তাঁদের নেতৃত্বের মর্যাদার আসনটা হাতছাড়া হয়।" ব্যালেনটাইনকে লিখিত উপরে উল্লেখিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্রের একাংশে বিদ্যাসাগর মহাশয় খলিফা ওমরের নির্দেশে আলেক-

আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী ধ্বংস করার কথা বলেছেন। "যদি এসব বই-এ যা' আছে তা কোরানে থাকে এদের প্রয়োজন নাই। যদি কোরানে না থাকে তাহলে এদের ধ্বংস করতে হবে।" হিন্দু পণ্ডিতদের কুসংস্কার ঐ মতো—তিনি ঐ দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। (খলিফা ওমর সম্বন্ধে এই কাহিনী অবশ্য সঠিক নয়। বহু পরে উৎকট ধর্মকলহের মধ্যে এই নিন্দাবাদ খৃষ্টান মিশনারীগণ কর্তৃক তাঁর উপর আরোপিত হয়েছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী প্রথমে নষ্ট হয় সীজারের যুদ্ধকালে, খৃঃ পূঃ ৪৮-৪৭ এবং পরে ৩৮৯ খৃষ্টাব্দে থিওডিসিয়াসের নির্দেশে। ওমর খলিফা ছিলেন এ ঘটনার ২৫০ শত বৎসর পর—৬৩৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬৪৪ খৃষ্টাব্দ।) কিন্তু যে উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু পণ্ডিতদের সম্বন্ধে তখনকার খৃস্টানদের দ্বারা প্রচলিত ঐ কাহিনী বলেছিলেন তা মুসলমান মৌলানাদের সম্বন্ধে আরও বেশী প্রযোজ্য এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। ধর্মশাস্ত্রের বাইরে কোনও জ্ঞানের অস্তিত্বই তাঁরা স্বীকার করেন না এবং তাঁদের আধিপত্যের অস্ত্রই হচ্ছে ধর্ম। মৌলানা হোসেন আহমদ বলেছেন নবশিক্ষিতদের সঙ্গে এই মৌলনাদের যোগাযোগে নতুন শক্তি সৃষ্টির কথা তাঁরা ভাবলেন! এই ভাবেই তাঁর গুরু মৌলানা মাহমুদ হাসান নব্যশিক্ষিত মৌলানা মোহম্মদ আলী, ডাঃ আনসারী প্রমুখের সঙ্গে সংযোগ সাধন করলেন।[২০] মৌলানা মোহম্মদ আলী যখন বাল্যবিবাহ বিরোধী সর্দা আইনের বিরোধিতার আন্দোলন করছিলেন তখন কিভাবে এই পশ্চাৎপদতা সম্ভব হচ্ছিল সেটা উপরের ঘটনা থেকেই বোঝা যায়।

যে-সময় মৌলানা হোসেন আহমদের পিতা হিজরাত করে মদীনা যাচ্ছেন সেই সমসাময়িক কালে ১৮৯৫ সালে পুণায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। শ্রদ্ধেয় প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখছেন: "এবার পুণার মুসলমানরা কংগ্রেসে যোগদান করিলেন না; ১৮৯৩-এ গোরক্ষা সমিতি স্থাপিত হওয়ায় কংগ্রেসের হিন্দুদের প্রতি তাঁহাদের বিশ্বাস শিথিল হইয়া গিয়াছে।" দেশ ত্যাগ করে মদিনা যাওয়াও কি এই শিথিলতার কারণে? তিলক গো-রক্ষা সমিতি সংগঠনের উদ্যোক্তা (যদিও তিলক হিন্দু একতা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের বিরোধিতাও লক্ষ্য রেখেছিলেন।)

গান্ধীজী তো চিরকাল আধুনিক শিক্ষার বিরুদ্ধে এবং তাঁর নিজস্ব ধর্মীয় সংস্কারের ভিত্তিতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচেষ্টা করে গেছেন। পাশ্চাত্যের শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ রবীন্দ্রনাথকেও তাঁর বিরুদ্ধে কলম ধরতে বাধ্য করেছিল।

মৌলানা আজাদের ক্ষেত্রেও দেখি তাঁর শেষকালের লেখাতেও যুক্তি-ভিত্তিক জ্ঞানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাঁর ১৯৪২ সালে গ্রেপ্তারের পর বন্দী

অবস্থায় লেখা "গুবারেখাতের" নামের পুস্তকে যা প্রকাশিত হয়েছে তাতে একস্থানে তিনি লিখেছেন :

"দর্শন চর্চায় স্বভাবে একটা স্টোয়িক্যাল এবং বেপরোয়া ভাব জন্মে যায় ফলে জীবনের যত দুঃখ দুর্বিপাক একটু অনন্য দৃষ্টিতে অবলোকন করা যায়। কিন্তু তাতে তো চরিত্রের স্বাভাবিক দুর্বলতা ঢাকা পড়ে না।

"দর্শন অবশ্য আমাদের এক প্রকার সান্ত্বনা দেয় কিন্তু সে সান্ত্বনা আগাগোড়া নেতিমূলক। প্রকৃত শান্তির সন্ধান এতে পাওয়া যায় না।

"বস্তু জগতের প্রত্যক্ষ ও প্রমাণনির্ভর তথ্য নিয়ে বিজ্ঞানের কারবার। বিজ্ঞান বলে : জড় জগতের প্রতিটি বস্তু এক অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। (প্রামাণ্য বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ও অপরিবর্তনীয় নিয়মের রাজ্যেও আজ ফাটল ধরেছে। যে পরম তত্ত্বের সন্ধানে বৈজ্ঞানিকরা পথে বেরিয়েছিল সে-সম্পর্কেও দ্বিধা জন্মেছে তাঁদের মনে।) তাহলে দেখা যাচ্ছে 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু'—এ হেন কোন কিছুও বাজারে বিকোয় না। বিজ্ঞান বিশ্বাস ও আশার আলো গুলিয়েই দেয় কিন্তু নতুন কোন আশার আলো সে দেখতে পারে না। তাহলে দুঃখ দুর্দৈব ভরা জীবনে মানুষ সান্ত্বনা লাভের আশায় মুখ ফেরাবে কার পানে?...বাধ্য হয়ে ধর্মের পানেই দৃষ্টি ফেরাতে হয়।" ২১

ইংরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইংরাজকে আঘাত যেমনই দেওয়া হোক সংগ্রামের আহ্বানে ধর্মাচ্ছন্নতা সমস্ত শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষকে সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহায়কদের বিরুদ্ধে এক হতে বাধা দিয়েছে এবং দেশের জনসাধারণকে এই বাধার জন্য অনক মূল্য দিতে হয়েছে। এখনও তার ঐতিহ্য শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধিতায় নিযুক্ত হচ্ছে।

কাজেই আজকের অভিজ্ঞতার নিরিখেও দেশের জনসাধারণ রামমোহন বিদ্যাসাগরের ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে চর্চা করা বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রয়াসকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখবে।

ধর্মসম্পর্কীয় মনোভাব

এখানে আমরা কোনও বিশেষ ধর্মমত আলোচনা করছি না। কেবল সংশ্লিষ্ট কালে কিরূপ ধর্মমতের আবির্ভাব হচ্ছিল বা ঐ ভাব কি রূপ নিচ্ছিল সেইটে বোঝার চেষ্টা করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধর্মমত সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করছি।

এঙ্গেলসকে অবলম্বন করে আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি মধ্যযুগীয় সমাজে ধর্মের

রূপেই সবরূপ ব্যবস্থা প্রকাশ পায়। শিক্ষাব্যবস্থায় থাকে ধর্মের একচেটিয়া আধিপত্য। ফলে সামাজিক পরিবর্তনকেও প্রথম দিকে বিরুদ্ধ ধর্মমতের (হেরেসির) রূপে প্রতিফলিত হতে হয়। এইভাবেই রামমোহনের আবির্ভাব ও তাঁর একেশ্বরবাদের প্রচার। তাঁর প্রথম অমুদ্রিত পুস্তক মানজারুল আদায়েন এবং প্রথম মুদ্রিত পুস্তক ফারসী ভাষায় লিখিত তোহফাতুল মোয়াহেদীন সম্বন্ধে তাঁর জীবনীলেখক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলছেন : "ঐ পুস্তকে রাজা শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদ এবং একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছেন।" পরে আবার তিনি লিখছেন : 'শাস্ত্র জনশ্রুতি দেশাচার ও কুসংস্কারের নিগড় হইতে মানবের মুক্তি, ইহাই বর্তমান যুগের মূলতন্ত্র। মানুষ এখন সাবালক হইয়াছে এবং আত্মাবলম্বন করিতে শিখিয়াছে।...সপ্তদশ শতাব্দীতে বেকন, এবং উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে লক, মানবের বুদ্ধিকে অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া যান।...অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তি বেকন এবং লক প্রদর্শিত পথে যুক্তিবাদ ও স্বাধীন চিন্তা বিশেষভাবে ধর্মবিষয়েও নিয়োজিত করিলেন। এই সকল লোককে একেশ্বরবাদী (Deists) বলে।...(অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে) ফরাসী দেশে ইঁহাদের শিষ্যবর্গেরা প্রভূত শক্তি সহকারে খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।...ইঁহারা এনসাইক্লোপিডিয়া গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন।...ইঁহাদের মধ্যে কেহ বা নাস্তিক জড়বাদী, কেহ সংশয়বাদী, কেহ অদ্বৈতবাদী এবং কেহ বা একেশ্বরবাদী ছিলেন। ফরাসী দেশে এনসাইক্লোপিডিয়া লেখকদের সময়ে ইংলণ্ডে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হিউম সাহেব সন্দেহবাদ প্রচার করেন। যুক্তিবাদের মূল সূত্রে সঞ্চারক বেকন ও লকের গ্রন্থ ; এবং ইংলণ্ডীয় ডীইস্টগণের, ফরাসী দেশের থিও-ফিল্যানথ্রপিস্ট ও এনসাইক্লোপিডিস্টদের ও টমাস পেনের গ্রন্থ এবং সংশয়বাদী হিউমের গ্রন্থপাঠে রাজা রামমোহন রায়ের মনের ভাব ও বিশ্বাস, শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদ বিষয়ে বিকশিত ও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থ-দ্বারা তাঁহার উপরে অধুনাতম ইয়োরোপীয়ান স্বাধীন চিন্তার প্রভাব পতিত হয়। এই প্রকার মনের ভাব লইয়াই রাজা তোহফাতুল মোয়াহেদীন গ্রন্থ রচনা করেন। রাজা কোনও কোনও গ্রন্থে লক, বেকন, ও অন্যান্য স্বাধীন চিন্তাশীল পণ্ডিতগণের নাম ও তাঁহাদের বিষয়ে উল্লেখ করেন।"

এঙ্গেল্‌সের "কল্পস্বর্গ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের" ইংরাজী সংস্করণের বিশেষ ভূমিকায় মার্কস ও তাঁর দ্বারা লিখিত পূর্বের এক পুস্তকের কিছু অংশ উদ্ধৃত করে তিনি ইংলণ্ডে এবং পরে ফ্রান্সে বস্তুবাদের ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়েছেন। ১৮৮০ সালে প্রকাশিত নগেন্দ্রবাবুর পুস্তকে ধারাবাহিকভাবে বিবৃত এবং উপরে

উদ্ধৃত অংশ তার সঙ্গে বেশ মিল খায়। অবশ্য শেষোক্ততে কিছু বেশী নাম আছে। রামমোহনের মানস গঠনে যে সব পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের প্রভাব আছে নগেন্দ্রবাবু তারই উল্লেখে এই বর্ণনা দিয়েছেন। উপরের ঐ উদ্ধৃতিতে শেষের বাক্যটি লক্ষণীয়। বেকন আর লকের নাম আছে। মার্কস্ ও এঙ্গেল্সের উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে বেকন ও লক সম্বন্ধে তাঁরা বলছেন: "ইংরাজী বস্তুবাদের আসল প্রবর্তক হলেন বেকন। তাঁর কাছে প্রাকৃতিক দর্শনই হল একমাত্র সত্য, দর্শন এবং ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার ওপরে ভিত্তি করা পদার্থবিদ্যা হল প্রাকৃতিক দর্শনের প্রধান ভাগ।...তাঁর বক্তব্য, ইন্দ্রিয় অভ্রান্ত ও সর্বজ্ঞানের মূলাধার। সমস্ত বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা ইন্দ্রিয়দত্ত তথ্যকে যুক্তিসঙ্গত প্রণালীতে বিচার করাই হল বিজ্ঞানের কাজ। অনুমান, বিশ্লেষণ, তুলনা, পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা হল এই ধরণের যুক্তিসঙ্গত প্রণালীর প্রধান অঙ্গ। বস্তুর অন্তর্নিহিত গুণের মধ্যে প্রধান হল গতি......" এর পর মার্কস্ এঙ্গেল্স্ হব্‌সের উল্লেখ করেছেন, নগেনবাবু করেন নি। মার্কস্ এঙ্গেল্স্ বলেন: "পরবর্তী বিকাশে বস্তুবাদ হয়ে ওঠে একপেশে। বেকনীয় বস্তুবাদকে যিনি গুছিয়ে তোলেন তিনি হব্‌স্।......হব্‌স্ বেকনকে গুছিয়ে তুলেছেন, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের জগৎ থেকে সমস্ত মানবিক জ্ঞানের উদ্ভব, বেকনের এই মূল নীতির কোন প্রমাণ দাখিল করেন নি। সে প্রমাণ দেন লক, তাঁর 'মানবিক বোধ বিষয়ে নিবন্ধ'এ। বেকনীয় বস্তুবাদের আস্তিক্যবাদী কুসংস্কার ছিন্ন করেছিলেন হব্‌স্।" নগেনবাবুর তালিকায় হব্‌সের নামের অনুপস্থিতির কারণ হয়তো নিহিত থাকতে পারে মার্কস্ এঙ্গেল্স্ শেষ বাক্যটিতে যা বলেছেন সেই বিষয়ের মধ্যে অর্থাৎ হব্‌সের আস্তিক্যবাদ বিরোধিতা। তবু রামমোহনের চিন্তাধারার মধ্যে বেকন ও লক প্রদর্শিত বস্তুবাদের প্রভাব অনস্বীকার্য।

অক্ষয়কুমার দত্ত বলছেন: "যে পরমধর্মসমুদায় মানুষের মানসপটে ও সকল বাহ্য পদার্থের সর্বস্থানে লিখিত রহিয়াছে, এ বিশ্বরূপ অভ্রান্ত গ্রন্থই সে-ধর্মের সাক্ষী, সুতরাং তাহার বিষয়ে লেশমাত্রও সংশয় নাই, তাহাই প্রচার করণার্থে তিনি (রামমোহন রায়) প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়াছিলেন। তিনি কেবল এই পরিদৃশ্যমান নিখিলব্রহ্মস্বরূপ সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থমাত্রকে পরমেশ্বর প্রণীত শাস্ত্রস্বরূপ বিবেচনা করিতেন।..." (সাম্বাৎসরিক বক্তৃতা, ১৮৫০) অক্ষয়কুমার দত্ত কোনও বিচ্ছিন্ন ধারার প্রতিনিধি নয় বরং দেশের শিক্ষিতদের মধ্যে তখন বস্তুবাদের প্রভাব যে খুব বেশী নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে তা বোঝা যাবে: "ব্রাহ্মসমাজে বেদ শাস্ত্রকেই সাক্ষাৎ ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস ছিল এবং বৈদিক ধর্মকে ...ব্রাহ্মধর্ম বলিয়া স্বীকার করা হইত। খ্রীষ্টাব্দের ঊনবিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ এই

জ্ঞানোজ্জ্বলিত সময়ে তাহা ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করিলে ও তাহা ব্রাহ্ম সমাজের মত বলিয়া প্রচার হইলে সুশিক্ষিত লোকের নিকট লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় হইবে, তাহা হইলে তাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি দৃকপাতও করিবেন না, এইটি ভাবিয়া ইনি সর্বদাই ভগ্নচিত্ত হইতেন। ইনি তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া ইহার প্রতিবাদ করেন।…দেবেন্দ্রবাবু সুদৃঢ় সংস্কার বশতঃ বেদকে ছাড়িতে চাহিতেন না।" (অক্ষয় দত্তের জীবন বৃত্তান্ত, মহেন্দ্রনাথ রায়, পৃষ্ঠা ৮৩) "শেষে সত্যের জয় হল, ব্রাহ্ম সমাজ ঐ মত (বেদ 'রিভিল্ড্' অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ দ্বারা বিজ্ঞপিত) পরিত্যাগ করল।" (লিওনার্ড, ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৯০) ব্রাহ্ম সমাজের যাঁরা পরে ভক্তিবাদে বিশ্বাসী হন তাঁদের সমালোচনা থেকেও মনে হয়, গোড়ার দিকে বস্তুবাদের প্রভাব বেশ ছিল। প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার তাঁর 'ফেথ এণ্ড প্রোগ্রেস অব দি ব্রাহ্ম সমাজ' গ্রন্থে তত্ত্ববোধিনী সভাকে বলছেন : "দি ওল্ড অবনকশাস্ সোসাইটি কল্ড্ তত্ত্ববোধিনী সভা" (পৃষ্ঠা ১৯৩) অন্য এক স্থানে বলছেন :

"The Brahmo Somaj was noted for nothing so much as a cold colourless rationalism and antiidolatrous contemptuousness." (Page 224)

রাজা রামমোহন রায় আরবী ফারসীতেও পণ্ডিত ছিলেন। আজ যেমন গোঁড়ামী মুসলমান সমাজে লক্ষিত হয়, পাঠান-মোঘল রাজত্বকালে শুধু এরূপ এক ধারাই বজায় ছিল না। স্বভাবতই নওয়াব বাদশাহরা শোষণ করার জন্য গোঁড়ামীর সাহায্য নিত। মুসলমান বাদশাহকে অমান্য করা চলবে না—এই কথাটাই রাষ্ট্র ব্যবস্থার ব্যবহারিক জগতে প্রধান হয়ে ছিল। কিন্তু তারা নিজেরাও আচরণে ধর্মের নিয়মকানুন মানতে পারত না। ভারতে গোঁড়ামীর বিশেষ স্তম্ভ 'ফতওয়ায়ে আলমগীরি'র রচয়িতা সম্রাট আওরঙ্গজেব নিজের পারি-পার্শ্বিক থেকেই ধর্মপালন বিষয়ে শিথিলতা দূর করতে পারেন নি। মানুকির বর্ণনা যদি সঠিক বলে ধরে নেওয়া হয় তাতে দেখা যায় সম্রাটের অন্যতমা বিশেষ স্নেহ-ভাজন পত্নী এবং তাঁর মন্ত্রী জাফর খান সুরাসক্ত ছিলেন। ঐ বর্ণনায় একথা আছে যখন বাদশাহ হারেমে সুরাপান নিষিদ্ধ করলেন তখন জাহানারা উলামাদের (ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিতদের) স্ত্রীদের নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁদের সুরা দেওয়ায় তখনকার আচার অনুযায়ী তাঁরা পান করলেন। জাহানারা তখন আওরঙ্গজেবকে বললেন, মৌলানাদের স্ত্রীর যখন এই অবস্থা তখন বাদশার হারেমে এ নিষেধমূলক নির্দেশ কেন ? (মুজীবের 'ইণ্ডিয়ান মুসলমানে' উদ্ধৃত)।

ভারতে নানান মতের স্থফীদের প্রভাবও কম ছিল না। ধর্মে রক্ষণশীল মৌলানা ইসমাইল শহীদ স্থফীদের সম্বন্ধে বলেছিলেন এঁদের মধ্যে অনেকেই নাস্তিক (উপরি উক্ত পুস্তক, পৃঃ ৪৪৫) "রক্ষণশীলতাকে সব সময়ই মানুষের চিন্তার স্বাধীনতার অধিকারের দাবীর সম্মুখীন হতে হয়। মুসলিম গোঁড়ামীর ক্ষেত্রে ভারতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি।···রক্ষণশীলেরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন রেখে বিপর্যয়কারী (সাব্ভারসিভ) ধ্যান-ধারণা প্রবেশ না করতে পারে তার চেষ্টা করতেন।" (উক্ত পুস্তক পৃষ্ঠা ৪০৩) তবু লোকে যেমন মৌলভী নজীর আহমদের এ ফতোয়াও জানতো যে খোদা প্রকৃতির বিষয়ে তদন্ত নিষেধ করেছেন, তেমনই এও জানতো স্থফী খাজা আহমদ মাশুক নামাজ তাঁর পক্ষে বাধ্যতামূলক মনে করতেন না ও পড়তেন না। (উক্ত পুস্তক পৃষ্ঠা যথাক্রমে ৪১১ এবং ১৫৮)

রক্ষণশীলেরা যাকে বিপর্যয়কারী (সাবভারসিভ) ধ্যানধারণা বলেছেন রামমোহনের বিদ্যার্জনকালে আরবী শিক্ষা-জগতে তারও প্রচলন এদেশে কিছু ছিল একথা বোঝা যায়।

নগেন্দ্রনাথ লিখছেন: "যুক্তিবাদ বিষয়ে রাজা আরব দেশীয় মতাজল নামক দার্শনিক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে অনেক শিক্ষা করিয়াছিলেন।··· মতাজল সম্প্রদায় খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বোগদাদের খলিফ আল-মামুন এবং তাঁহার পরবর্তী খলিফাদিগের সময় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।···তাঁহাদের মতের সহিত অনেক পরিমাণ যুক্তিবাদ মিশ্রিত ছিল।···মতাজেলারা বলিতেন কোরান শাস্ত্র একটি নূতন বস্তু। উহা দেশকালের সৃষ্ট, দেশকালে বদ্ধ। স্থতরাং উহা একটি ঘটনা। পরমেশ্বরের স্বরূপের অন্তর্গত নহে। স্থতরাং উহা নষ্ট হইতে পারে। সেই জন্য, কোরানকে অনাদি অনন্তকাল স্থায়ী বলা যাইতে পারে না। গোঁড়া মুসলমানরা কোরানকে নিত্য বলেন। ···যে সকল মুসলমানেরা কোরানকে নিত্য বলিতেন, মতাজেলারা তাঁহাদের কথার প্রতিবাদ করিয়া প্রমাণ করিতেন যে কোরান অনিত্য।" (নগেন্দ্রনাথ পৃষ্ঠা ৪২৬-৪৩০)। আল্-আশারী এর বিরুদ্ধে গোঁড়া মত ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। আধুনিক ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের মত "বোগদাদ ধ্বংসকারী মোঙ্গলবাহিনী চেঙ্গীজ খান ও হালকু খান আর অন্যদিকে আল আশারী আব্বাসীয় খলিফার আমলের আরবের স্বর্ণযুগ ধ্বংস করেন।" (ব্রাউন, লিটারারী হিষ্ট্রী অব পারশিয়া, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা :৮৬) প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার আজকালকার 'নব্য চিন্তার মুসলিম' অনেকে আরব সভ্যতার এই স্বর্ণযুগের

বড় বড় দার্শনিক, গণিতবিদ ও বৈজ্ঞানিকদের নাম দিয়ে প্রচার করেন। কিন্তু শুধু এইটুকু যোগ করতে ভোলেন যে এঁদের অনেকে (প্রায় সকলেই) ছিলেন মোতাজেলা অর্থাৎ যাঁরা কোরানকে অনিত্য ভাবতেন।

পূর্বেই দেখেছি অক্ষয় কুমার দত্তের বক্তব্যে ক্রমোত্তর যুক্তিবাদ ও বস্তুবাদের উপরে জোর পড়ছিল।

প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার তাঁর উপরে উদ্ধৃত পুস্তকে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্তকে দেবেন্দ্রনাথের বিরোধী বলে বর্ণনা করেছেন।

১৮৭৭ সালের ১৫ই জুলাই-এর ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকার একটি বক্তব্যে প্রতিফলিত হয় যে কতকগুলি ধারণা দেবেন্দ্রবাবুকে ত্যাগ করতে হয়েছিল অক্ষয়বাবুর জন্য।

দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে উক্ত মত সমর্থিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন: "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক।...অক্ষয়কুমারের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম।—তিনি যাহা লিখিতেন তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিতে চেষ্টা করিতাম; কিন্তু তাহা আমার বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায় আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ; আকাশ পাতাল প্রভেদ!"

ব্যালানটাইনকে লিখিত তাঁর পত্র থেকেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিন্তাধারার পরিচয় আমরা পেয়েছি। যুক্তিবাদী মনোভাব তাঁর শৈশব থেকেই তিনি পেয়েছেন। পিতা-মাতার দিক থেকে তাঁর সৌভাগ্য কম নয়। জীবনীকার (চণ্ডীচরণ) লিখছেন: "বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগের নিকট বলিয়াছিলেন: আমার মা বলিতেন, যে-দেবতা আমি নিজের হাতে গড়িলাম, সে আমাকে উদ্ধার করবে কেমন করে? বাঁশ, খড়ি, দড়ি, মাটিতে ঠাকুর গড়ে কি ধর্ম হয়?"

হাতে গড়া দেবতা আর মনে গড়া দেবতাতে আর তফাৎ কতটুকু? সুতরাং শৈশবের শিক্ষা জ্ঞানবৃদ্ধিতে আরও সুনিশ্চিত হয়েছে, আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। এই শৈশব বা কৈশোরের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। চণ্ডীচরণ বলছেন: "তিনি যাহা কিছু পাঠ করিতেন তাহা সম্যক স্মরণ করিয়া রাখিতেন বলিয়া কখনোই তাঁহাকে কোনও বিষয়ে পরাস্ত হইতে হইত না।...সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন বলিয়া অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় আবৃত্তি করিতে পারিতেন।"

পর পৃষ্ঠাতেই তিনি লিখছেন ঐ সময় ঈশ্বরচন্দ্র সান্ধ্যাদি নিত্যকর্ম ভুলে গিয়েছিলেন এবং পিতৃব্যের পরীক্ষায় ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। এক ক্ষেত্রে স্মৃতি, অন্য ক্ষেত্রে বিস্মৃতি বিশেষ অর্থসূচক।

উত্তরকালে একটি ঘটনা উপলক্ষে তাঁর প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে অধুনাকালের স্বনামখ্যাত একজনের প্রতিক্রিয়ার তুলনা করলে অদ্ভুত লাগে। ১৯৩৩ সালে বিহার ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা ও হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর ঘটনার পর গান্ধীজী বলেন, মানুষের পাপের ফলেই এই সর্বনাশ হয়েছে। এ হলো ঈশ্বরের দণ্ডদান। অনেক যাত্রীসহ "স্যার জন লরেন্স" নামক একটি জাহাজ যখন জলমগ্ন হয়, তখন ব্যথিত বিদ্যাসাগর বলেন, আমি যা পারি না দুনিয়ার মালিক পরম করুণাময় একজন থাকলে সে কি তা করতে পারে। এই সব কারণে কেউ মালিক আছে বলে তাঁর মনে হয় না।

চণ্ডীচরণ লিখেছেন, "সূক্ষ্মতর রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার নিত্য জীবনের আচারব্যবহার, ক্রিয়াকলাপসম্পন্ন আস্থাবান হিন্দুর অনুরূপ ছিল না, অপর দিকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের লক্ষণের পরিচয়ও কখন পাওয়া যায় নাই।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে তিনি ছিলেন অ্যাগনস্টিক (সংশয়বাদী)। শিবনাথ শাস্ত্রী নিজ পিতার কথায় ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একই ধরনের মত প্রয়োগ করছেন।

একবার ক্ষুব্ধ হয়ে স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ তাঁর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর অন্য দুইজনের (যাঁদের বলা হোতো গ্রন্থাধ্যক্ষ) অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর মহাশয় উভয়ের সম্পর্কে এক পত্রে লেখেন: "কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইঁহাদিগকে এ-পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।"

"বালকদের বোধশক্তি বিকাশের জন্য যখন তিনি বোধোদয় লিখেছিলেন তখন প্রথম কয়েক সংস্করণে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই তিনি করেননি পরে ঈশ্বর প্রসঙ্গ যোগ করেন, কিন্তু সে ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ। বালকদের সাধ্য নেই এর সত্তা বোঝে।...কিন্তু যখন করলেন তখনো দেখা গেল, বোধোদয়ের প্রথমে 'পদার্থ' বা 'Matter' তার পরে ঈশ্বর।"[২২]

তবু তাঁর মনে একটা কিছু বিশ্বাস ছিল এরকম কথা বলতে দেখা যায়। তা হলে সে বিশ্বাসটা স্বীকার করতে বাধা কোথায় ছিল? ঈশ্বরে বিশ্বাসটাই তো সমাজে বিরোধিতা আকর্ষণ করে না। অনেক তৎকালীন হিন্দু বা ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মের মত নিজেকে Deistও তো বলতে পারতেন।

মার্কস্-এঙ্গেলস্ লিখেছেন "ব্যবহারিক বস্তুবাদীদের পক্ষে ধর্ম থেকে অব্যাহতি পাবার সহজ পদ্ধতি হল শেষ পর্যন্ত, Deism."

কাজেই আমরা আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মতকেই সঠিক বলব। বিশেষ করে এই জন্য যে দেখছি তিনি এই সঠিক কথাটা বলেছেন যে সে-যুগের শিক্ষিতদের মধ্যে নাস্তিকতার ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে শুধু বিদ্যাসাগর বা অক্ষয় দত্তের ব্যাপারে নয়, অনেকের।

আচার্য বলছেন :[২৩] "বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, একথা বোধ হয় তোমরা জান না; যাঁহারা জানিতেন তাঁহারা কিন্তু সে-বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না।...... উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আমাদের দেশে যখন ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন আরম্ভ হয়, তখন আমাদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া গিয়াছিল। যে সবল বিদেশীয় পণ্ডিত বাংলাদেশে শিক্ষকতা আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের অনেকের নিজ নিজ ধর্মে বিশ্বাস ছিল না। ডেভিড হেয়ার নাস্তিক ছিলেন, একথা তিনি কখনও গোপন করেন নাই; ডিরোজিও ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভগবানকে সরাইয়া Reason পূজা করিতেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাববন্যায় এদেশীয় ছাত্রের ধর্মবিশ্বাস টলিল। চিরকাল পোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর নাস্তিক হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি?"

উপসংহার

বিদ্যাসাগরের জীবনে স্ববিরোধিতা ও অসঙ্গতি ছিল না এ-কথা লেখা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। যেটুকু উদ্দেশ্য ছিল তাতেই প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। সুতরাং ঐ শ্রেণীসুলভ স্ববিরোধিতার আলোচনার আর বিশেষ স্থান নাই। ধর্মমত বিষয়ে তাঁর আরও বেশী সোচ্চার হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। আর একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। ব্যাপক জনসাধারণকে প্রাথমিক শিক্ষাদান বা স্বল্পসংখ্যক মানুষকে উচ্চ শিক্ষাদান এই দুইটি প্রশ্ন সংযোজক অব্যয় 'ও' বা 'এবং' দ্বারা যুক্ত না হয়ে 'কিংবা' দ্বারা যুক্ত হয় এবং বৃটিশ সরকার কর্তৃক বিকল্প হিসাবে উপস্থিত করা হয়। শেষোক্ত প্রস্তাব বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করলে জনসাধারণকে বঞ্চিত করা হয়। এই বঞ্চনাকে আবার একটি সূক্ষ্ম পর্দার আড়ালে ঢাকা হলো। বলা হলো চুইয়ে চুইয়ে বিন্দু বিন্দু জ্ঞান সব জনসাধারণকে জ্ঞান-সিক্ত করবে। দুইটি বিষয় বিকল্প হিসাবে ধরার কোনও হেতু ছিল না। জ্ঞানবিদ্যায় পশ্চাৎপদ দেশে দুইটিরই প্রয়োজন ছিল। উচ্চ শিক্ষার প্রসার প্রয়োজন ছিল এবং ব্যাপক

প্রাথমিক শিক্ষারও প্রয়োজন ছিল। ১৮৫৪ সালে ছাত্রের বেতন ও গ্র্যান্ট মারফত প্রাথমিক শিক্ষার যে চেষ্টা হয় তা ব্যর্থ হল কারণ, 'যারা ধনী তারা ইংরাজী স্কুল চায় প্রাথমিক পাঠশালার প্রয়োজন বোধ করে না এবং যারা গরীব তারা স্কুলের বেতন দিতে পারে না" (১৮৫৯ সালের সেক্রেটারী অব স্টেটের ডিসপ্যাচ)। উক্ত ডিসপ্যাচে সেক্রেটারী অব স্টেট প্রস্তাব করলেন, শিক্ষার জন্য একটি রেট অর্থাৎ পৃথক শিক্ষাকর বসাতে হবে। "এরই ফল স্বরূপ ১৮৬১-৭১-এর মধ্যে বাংলা প্রদেশ ছাড়া সমস্ত প্রদেশেই শিক্ষাকর প্রযুক্ত হয়।...বাংলা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রতিবন্ধক হলো" (ভগবান দয়ালকৃত ডিভেলপমেণ্ট অব মডার্ণ ইণ্ডিয়ান এডুকেশন, পৃষ্ঠা ১০০)। জমিদারদের বিরোধিতার আসল সমস্যাটিকে ঢাকা দিয়ে প্রত্যক্ষ বিদ্যা বিতরণ কিংবা পরোক্ষ 'চুয়ানো' জ্ঞান বিতরণ, এইরূপ এক বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের দ্বারা বিষয়টিকে ঘোলাটে করার চেষ্টা হল। জমিদারদের বিরোধিতা ব্যতিরেকে দুটিরই সমাধান সম্ভব ছিল কারণ, বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার ব্যয় সরকারী খাতে কমই ছিল। (বিষয়টি লেখকের রচিত "শিক্ষা ও শ্রেণী সম্পর্ক" পুস্তকে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। এখানে আলোচনার প্রয়োজন নেই) দুঃখের বিষয় বিদ্যাসাগর মহাশয় দুইটিসমস্যার বিকল্প হিসাবে উপস্থাপনার প্রতিবাদ করেন না এবং 'স্বল্প সংখ্যককে উচ্চ শিক্ষা'—এই প্রস্তাবের সমর্থকদের সারিতে দাঁড়ান। ১৯৩০ সালে বাংলার মুষ্টিমেয় সংখ্যার মুসলমান জমিদাররা রাজনৈতিক কারণে প্রাথমিক শিক্ষার সমর্থন করেন। কিন্তু ১৮৮২ সালের হানটার কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায় সে-সময় বাংলাদেশে উপর থাকের মুসলমানরাও নীচের থাকের মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার চাইতেন না। আমার উপরিউক্ত পুস্তকের একটি প্রবন্ধে একটি কথা লিখেছিলাম—সেইটির পুনরুক্তি করে এ প্রবন্ধ শেষ করছি। "বাংলাদেশের নব জাগরণে আমাদের গর্ব আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ হয় দেশের জনসাধারণের বিরাট অংশ কৃষক শ্রমিক এমন কি সকল শ্রেণীর গরীব গ্রাম ও শহরবাসী এই আয়োজনের বাইরে থেকে গেছে।...এই ভোজে সমথাকে না হোক, তখনই না হোক, কোনও সময় তাদের জন্য কোনও একটা পংক্তি ব্যবস্থাও কিছু থাকবে লক্ষ্যের মধ্যে এমন কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। দুঃখটা সেইখানেই। বহিরাঙ্গনে যারা রয়ে গেল তাদের ডাক দেওয়ার কথাই কারও মনে হয়নি।"

(১) চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (২) নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায় (৩) আরটিকল্‌স্ অন ইণ্ডিয়া, কার্ল মার্কস (৪) নগেন্দ্রনাথ

পৃষ্ঠা ২৭৫ (৫) উক্ত বই ২৭৪ পৃষ্ঠা (৬) বাদশাহী আমল, শ্রীবিনয় ঘোষ (৭) ইন্দ্র মিত্র, করুণা সাগর বিদ্যাসাগর পৃঃ ৮৭ (৮) চণ্ডীচরণ পৃষ্ঠা ২০১ (৯) বাদাউনী ও আইনী আকবরী থেকে উদ্ধৃত, এ মুজীব, দি ইনডিয়ান মুসলমানস্, পৃষ্ঠা ২৬৩ (১০) মৌলানা আবুল হাসান প্রণীত সৈয়দ আহমদ শহীদের উর্দ্দু জীবনী পৃষ্ঠা ১৮৪ (১১) শ্রীবিনয় ঘোষ বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ (১২) জন স্টুয়ার্ট মিল লিবার্টি, রেপ্রেসেনটেটিভ গভর্নমেন্ট, সাবজেকশান অব উইমেন, ওয়ালর্ড ক্লাসিক্স্ সংস্করণ পৃষ্ঠা ৪৪৯ (১৩) রবীন্দ্র জীবনী প্রথম খণ্ড (১৪) রবীন্দ্রনাথ, আধুনিক সাহিত্য (১৫) নগেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩১০ (১৬) নগেন্দ্রনাথ ; অক্ষয়কুমার দত্ত ভারতের উপাসক সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকা (১৭) শ্রীবিনয় ঘোষ কৃত অনুবাদ, মূল ইংরাজীর জন্য ইন্দ্র মিত্র দ্রষ্টব্য (১৮) রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা (১৯) নকশে হায়াত মৌলানা সৈয়দ হোসেন আহমদ মাদানী ১৩৮-১৪০ (২০) নকশেহায়াত, পৃষ্ঠা ১৫৫ (২১) ঢাকায় প্রকাশিত অনুবাদ পৃষ্ঠা ১৫-১৭ ; মূল উর্দ্দু ৩৬-৩৮ (২২) বিনয় ঘোষ (২৩) পুরাতন প্রসঙ্গ, বিপিন গুপ্ত, পৃষ্ঠা ২২৮

মাইকেল, দীনবন্ধু ও গিরিশচন্দ্র

"স্বপ্ন দিয়ে গীত লেখানোটা দেবতাদের সাধারণ রোগ। অনেক পঞ্চম শ্রেণীর কবি স্বপ্নের দোহাই দিয়া হস্ত কণ্ডূয়ণ করিয়া গিয়াছেন।" (মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)। এরকম স্বপ্নের একটা কৈফিয়ত দিয়ে আসরে নামতে পারলে কুণ্ঠা বর্জন সহজ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান কালের মর্তবাসীরা দেবতাদের এ রোগের আশ্রয় হতে বঞ্চিত। অথচ যে সম্বন্ধে লিখতে বসেছি, তাতে বর্তমান লেখকের কুণ্ঠা হবার যথেষ্ট কারণ আছে। তবু মহান স্মৃতি উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রধানত পাঠক আর কিয়দংশে দর্শক হিসাবে যা পরিচয় তাই পুঁজি নিয়ে কিছু নিবেদন করতে চাই। বাংলা নাটকের আনুপূর্বিক ইতিহাস নিয়ে আমি আলোচনা করছি না। আমি কেবল উনবিংশ শতাব্দীর চিরস্মরণীয় দিকপালগণ এবং তাঁদের রচিত নাটক বা নাট্যচরিত্র সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করব।

আধুনিক যুগে সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রায় সব ভাষাতেই উপন্যাসের পূর্বেই নাটকের আবির্ভাব। বাংলা ভাষাতেও তাই ঘটেছে। বরং ইউরোপীয় ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে (ধরুন, ইংরাজী ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে) নাটকের পর উপন্যাস এই পরম্পরায় বাংলায় ব্যবধানের কাল এতই কম যে হঠাৎ মনে আনলে আশ্চর্য হতে হয়। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বের সৃষ্টির কথা বাদ দিয়ে সেক্সপীয়রের নাটক সৃষ্টির কাল (ষোড়শ শতাব্দীর শেষ) থেকে ইংরাজী প্রথম সার্থক উপন্যাস ডেফোর রবিনসন ক্রুসোর রচনার কাল (১৭১৯) শতাধিক বৎসরের ব্যবধান। ১৮৫২তে বাংলার প্রথম সার্থক নাটক 'ভদ্রার্জুন' থেকে বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) মাত্র ১৩ বৎসরের তফাৎ। (আলালের ঘরের দুলালের সঙ্গে ফারাক আরও কম)। রবীন্দ্রনাথের বহু উদ্ধৃত উক্তি, "বঙ্কিমের উপন্যাসের আবির্ভাবের সঙ্গে বাংলা ভাষা বাল্যাবস্থা হতে হঠাৎ যৌবনপ্রাপ্ত হলো"—এর মর্ম উপরিউক্ত তুলনাতে আরও সুস্পষ্ট হয়। ১৮৫৯এ মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটক প্রকাশের পর দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশ পর্যন্ত চতুর্দশপদী বাদ দিয়ে মাইকেলের প্রায় সমস্তই প্রধান সৃষ্টি সম্পন্ন। কাজেই মাইকেলের সব নাটকগুলিই এই সময়ের মধ্যে। (মৃত্যুর পূর্বে রচিত 'মায়া কানন' নাটকটিকে গুরুত্ব দিচ্ছি না)। কালসূচী নিম্নরূপ—শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯), একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৬০), বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০), পদ্মাবতী (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)।

মাইকেলের নাটক রচনার উৎসাহ আসে প্রতিক্রিয়া হিসাবে। পাইক-পাড়ার জমিদার বাড়ীর নাটক অভিনয়ে ইংরাজ গণ্যমান্য নিমন্ত্রিত দর্শকদের জন্য অভিনীত নাটক 'রত্নাবলী' অনুবাদ করে দেবার জন্য মাইকেল অনুরুদ্ধ হন এবং অনুবাদ করেন। উক্ত নাটক দর্শনকালে তাঁহার উন্নত নাটক রচনার অভিপ্রায় হয়। তা তিনি তখনই ঘোষণাও করেন। এর ফলেই 'শর্মিষ্ঠা' ও পর পর অন্য নাটকগুলির রচনা।

মধুসূদন নাটকে হাত দেওয়ার পূর্বেই সামাজিক সমস্যা নিয়ে নাটক লেখা শুরু হয়েছিল। বস্তুতঃ একদিকে নাটক রচনার অনুপ্রেরণা ও আবেদন এবং অন্যদিকে তৎকালীন জনসমাজে নাটক সম্বন্ধে আগ্রহ এসেছিল দুই দিক থেকে। ইংরাজ গ্রামভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করল। নতুন নগরজীবন আরম্ভ হলো। দুইয়ে মিলে প্রাচীন অচল অনড় সামাজিক ব্যবস্থাকে এমন ঘা দিল যা অতীতের কোনও বহিরাক্রমণে সম্ভব হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে নতুন ব্যক্তিমানস নতুন আশায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো এবং সমাজের এমন রূপান্তর চাইলো, যা নতুন সমাজব্যবস্থা গঠন করার সহায়ক হবে। ইংরাজের সংস্পর্শে এসে উপরতলায় যে থাক গড়ে উঠলো তার মধ্যে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষাও দেখা দিল। রাজনীতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাও উকিঝুঁকি মারতে আরম্ভ করলো। রামমোহনের একটি সংক্ষিপ্ত উক্তিতে এই সমগ্র ব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া যায়। "দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে ধর্মের আচার যা হিন্দুরা এখনও ধরে রেখেছে তা **তাদের রাজনৈতিক স্বার্থকে উন্নত করতে সাহায্য করবে না**। বর্ণ-বৈষম্য অসংখ্য ভেদ ও ব্যবধান প্রবর্তন করেছে। এই ভেদাভেদ তাদের দেশপ্রেমের আবেগ থেকে বঞ্চিত করেছে। অগণিত আচার-পালন এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান তাদের যে কোনও কঠিন উদ্যোগ গ্রহণ করার ব্যাপারে অযোগ্য করেছে। আমার মনে হয় অন্ততঃপক্ষে **রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা** ও সামাজিক স্বস্তি ও আরামের জন্য তাদের ধর্মে কিছু পরিবর্তন ঘটা উচিত।" (পত্র, ১৮ই জানুয়ারী, ১৮১৮—মোটা অক্ষর অমার)

রামমোহনের সেই উক্তির পর তখন চার দশক কেটে গেছে। ইতিমধ্যে মাইকেলের নাটক রচনার অব্যবহিত পূর্বে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ; এর ঘাত-প্রতিঘাত উদ্দীপনা ও শঙ্কা উপরোক্ত আবেদনগুলিতে এনে দিয়েছে তীব্রতা।

এই সব সামাজিক আবেদন ছাড়া নাটকের আগ্রহ এসেছিল রুচির দিক থেকেও। মাইকেল শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রস্তাবনাতেই লিখেছেন, "...অলীক কুনাট্যরঙ্গে, মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে নিরখিয়া প্রাণ নাহি সয়..." এবং 'ভারত-

ভূমিকে' উদ্দেশ্য করে বলছেন "মধু কহে, জাগো মাগো বিভুস্থানে এই মাগ, স্বরসে প্রবৃত্ত হ'ক তব তনয়-নিচয়।"

কুরুচি ও কু-রসেরও কারণ ছিল। পলাশীর যুদ্ধের দুই শতাধিক বৎসর পূর্বে আরম্ভ হয়েছিল পশ্চিমের বণিকদের আগমন ও পশ্চিমের সঙ্গে আদানপ্রদান। নব অধিকৃত ও লুণ্ঠিত আমেরিকা থেকে ইউরোপে আসছিল ধনরত্ন, প্রধানতঃ মূল্যবান ধাতু 'প্রেশাস্ মেটাল্স্' যা মুদ্রা তৈরীর উপাদান। ইউরোপে বিলাস-দ্রব্যের চাহিদা বাড়লো, ভারতের বাড়লো রপ্তানী আর তার বদলে এলো সোনা ও রূপা। বিনিময়ের মাধ্যমের অধিকতর প্রাপ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বাড়লো ব্যবসা বাণিজ্য ও আদান প্রদানে ক্ষিপ্রতা। কিন্তু তবু ভারতের গ্রামসমাজ ও বর্ণাশ্রমে আবদ্ধ অচলায়তনে ইউরোপের বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মতো শক্তিসম্পন্ন নতুন শ্রেণীর স্ফীতির পথ ছিল রুদ্ধ। ফলে স্ফীতি শুধু সৃষ্টি করলো পুরাতন সমাজের অবক্ষয়ের আবর্ত। সমাজের নানান দিকেই এর পরিচয় ফুটে উঠতে লাগলো। পুরাতন রাজস্ব ব্যবস্থায় আবির্ভাব হলো নতুন এক ব্যবস্থা—জমিদারী ইজারার ডাক। মুর্শিদকুলী খাঁর আমলেই এর সূচনা—এবং পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে তার কঠোরতম রূপে স্থিতিকরণ। "ইংরাজদের ভূমিরাজস্ব নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির আসল উৎস হলেন মুর্শিদকুলী খাঁ। সেই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচ্ছন্ন ও কঠোর রূপ দিয়েছিলেন কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে।" (শ্রীবিনয় ঘোষ কর্তৃক উদ্ধৃত যদুনাথ সরকারের উক্তি, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, পৃষ্ঠা ১৩) তবে এও বুঝতে হবে ইংরাজ আমলের সূচনাতেই কৃষকের বা প্রজার যেমন সর্বস্বত্ব অবলুপ্ত হলো এমন পূর্বে কখনও হয়নি। আদিতেই বাংলার কৃষকের স্বত্ব ছিল খুব দৃঢ়। "ভারতের অন্য সব প্রদেশে রাজারা যে তাম্রশাসন দিয়েছেন তাতে প্রজাদের লিখেছেন 'বিদিমস্তু ভবতাম' অর্থাৎ একে যে জমি দিলাম তা তোমাদের জানা হোক। বাংলার তাম্রশাসনে লেখা হত 'মতমস্তু ভবতাম্' অর্থাৎ একে যে জমি দিচ্ছি তাতে তোমাদের মত চাই। কাজেই বোধ হয় বাংলাদেশে প্রজাদের অধিকার ছিল ভূমিতে, রাজাদের নয়।" (ভারতের সংস্কৃতি, ক্ষিতিমোহন সেন পৃষ্ঠা ৫৩; ইচ্ছাকৃত ভাবেই এখানে বাংলার প্রজার স্বত্বের স্বরূপটা উল্লেখ করলাম। পরে এর প্রয়োজন হবে।)

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই অবক্ষয়ের নানান দিকের মধ্যে একদিক ছিল (যৌন-বিষয় উল্লেখে) যা লেখক ও পাঠক উভয়েই অশ্লীল বলে মনে করেন তা কেবল অশ্লীলতার আনন্দেই বিশেষ অশ্লীলরূপে পরিবেশন।

"শর্মিষ্ঠা" নাটকের বিষয়বস্তু পৌরাণিক। সংস্কৃত নাটকের রীতিতে আবদ্ধ

না থাকলেও সংস্কৃত নাটকের হাবভাব রাখায় প্রেমিকা হিসাবে নায়িকাকে উপস্থিত করতে কোনও অসুবিধা ঘটেনি—যদিচ প্রেমের যাজ্ঞা করছেন নায়ক, যযাতি। ("হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে কোর্ট-শিপের পাত্রী হইয়া যিনি কোর্ট করিতেছেন, তাঁহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙ্গালী সমাজে ছিল না—কেবল আজকাল নাকি দুই একটা হইতেছে শুনিতেছি। ইংরাজের ঘরে তেমন মেয়ে আছে; ইংরাজ কন্যার জীবনটাই তাই। আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তেমনি আছে।"—বঙ্কিমচন্দ্র, কবিত্ব)

মধুসূদন নিজেও দেশাচারের এই সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এদেশীয় নাট্যসাহিত্যের দুর্বলতা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন:

"It would shock the audience if I were to introduce a female (a virtuous one) discussing with a man unless that man be her husband, brother or father." সুতরাং শর্মিষ্ঠায় তাঁকে বিশেষ আগল ঠেলে এগোতে হয়নি—প্রচলিত সংস্কারকেও আঘাত করতে হয়নি। তবু ভাষা, ভঙ্গিমা প্রভৃতিতে চরিত্রগুলির মধ্যে এমন একটি ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটিত যা সমসাময়িক যুগের নতুন উঠতি শ্রেণীর কামনার সঙ্গে খাপ খায়। "পদ্মাবতী" নাটকে পৌরাণিক চরিত্র সমাবেশ শুধু নামে। মূল কাহিনী, রূপ ও চরিত্রায়নে গ্রীক গল্পের অবলম্বন। পৌরাণিক নাম ইত্যাদি দেওয়ায়, বাঙ্গালী গৃহস্থ ঘরের কন্যার যা অসুবিধা তা আর থাকলো না। "শর্মিষ্ঠা" নাটক পাইকপাড়ার রাজাদের নাট্যশালায় সার্থকভাবেই প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনের জন্য যুগোপযোগী হওয়া সত্বেও মধুসূদনের পরবর্তী নাটকগুলি প্রদর্শিত হল না।

জমিদার হলেও কালা চামড়াও যায় না আর জাতির পরিচয়ও যায় না। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত বাবুদের ক্ষেত্রেও তাই। সুতরাং জাতির শাসকদের তুলনায় অনগ্রসরতা পীড়াদায়ক বোধ হওয়া স্বাভাবিক। ফলে কারও কারও মধ্যে সেই অনগ্রসরতা দূর করার আকাঙ্ক্ষা হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ জমদিারদের ক্ষেত্রে এই ধরনের অনুভূতিবোধও ছিল বিরল দৃষ্টান্ত। নাটকের ক্ষেত্রে অন্যান্য কিছু জমিদারের সঙ্গে পাইকপাড়ার রাজারাও এই বিরল দৃষ্টান্তের অন্যতম হিসাবে দেখা দিলেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত বেলগেছিয়া নাট্যশালা সুখ্যাতি অর্জন করে। ("গৌর দাস বসাক তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়া গিয়াছেন যে বেলগেছিয়া নাট্যশালার অভিনয় কৃতিত্ব কাহিনী সুপরিচিত প্রবাদ বাক্যের মত সর্বজনবিদিত। তাঁহার বিবরণ হইতে বেলগেছিয়া নাট্যশালা সম্বন্ধে অনেক

জ্ঞাতব্য তথ্য আমরা জানিতে পারি।" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৩৭)। এইরূপ নাট্যশালায় সকলের প্রবেশাধিকার ছিল না। কেবল তাঁদের নিমন্ত্রিত অতিথিরাই দর্শক হতে পারতেন। সাহেবদেরও নিমন্ত্রণ করা হতো। সাহেবরা বিচার করে দেখবেন, আমরা 'সভ্য' এরূপ অন্যতম উদ্দেশ্যও সাধিত হতো। "ছোটলাট বাহাদুর নাটক শেষ হওয়া কালীন অনেক প্রশংসা করিলেন এবং কহিলেন যে এতদ্দেশীয় যুবাব্যক্তিরা লেখাপড়া শিখিয়া কতশত মহাত্মাকে সুখী করিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত··· যাহা হউক **বাংলাদেশ সভ্য হইয়াছে** এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তিবর্গ বিদেশী বিদ্যায় ব্যুৎপন্নশালী হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে?···" (সংবাদ প্রভাকর ৪ঠা আগস্ট, ১৮৫৮ ব্রজেন্দ্রনাথ উদ্ধৃত, মোটা অক্ষর আমার।)

শাসকদের অনুমোদনের আশা বা অননুমোদনের আশঙ্কা, বা তাদের নিকট 'পুওরম্যান্‌ড্‌' হওয়ার ভীতি, এইসব সীমাবদ্ধতাও উপর তলার মানুষদের সখের অনুষ্ঠান সম্পাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি করতো। বলা বাহুল্য তখনকার কালের মধ্যবিত্তেও এর সংক্রমণ ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্রের মধ্যেও এর পরিচয় আমরা পাই। "সাধারণের সম্মুখে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করায় আমার অমত ছিল। কারণ একেই তো তখন বাঙালীর নাম শুনিয়া ভিন্নজাতি মুখ বাঁকাইয়া যায়—, এরূপ দৈন্য অবস্থা ন্যাশনাল থিয়েটারে দেখিলে কি না বলিবে—এই আমার আপত্তি।" (গিরিশচন্দ্র, বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী)। সমালোচনার মধ্যেও ভয়ভীতির প্রকাশ দেখা যেতো। ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৭৩ এর ১৫ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিত একটি ব্যঙ্গার্থক প্যানটোমিম অনুষ্ঠানের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে; "এইহতভাগ্য নির্জ্জিত দেশে শাসনকর্তার ভ্রম এরূপ প্রহসিত হওয়া পরামর্শসিদ্ধ কিনা বলিতে পারি না।" (মধ্যস্থ, ৬ই মাঘ, ১২৭৯, ব্রজেন্দ্রনাথ উদ্ধৃত)। নাটক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পরে যে আইন রচিত হলো তাতে এবং অভিনেতাদের গ্রেপ্তার আদিতে দেখা গেল এরূপ শঙ্কার কারণও ছিল। তাছাড়া ছিল জমিদারদের পারিপার্শ্বিক সমাজের চাপ। একেও অতিক্রম করতে বেশ সাহস ও দৃঢ়তার প্রয়োজন হতো।

মধুসূদনের "একেও কি বলে সভ্যতা?" ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" এবং পরে "কৃষ্ণকুমারী" জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতার সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে দিল। প্রথম দুটি প্রহসনে আছে ব্যঙ্গ, একটিতে নবীন সমাজকে, অন্যটিতে পুরাতন সমাজকে। মধুসূদন "দুটি প্রহসন লিখেছিলেন এবং দুটিই বেলগেছিয়ার কর্তৃপক্ষকে অভিনয়ের জন্য দিয়েছিলেন। ···প্রহসন দুটি বেলগেছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হল না।

প্রভাবশালী মহল থেকে এ জাতীয় ব্যঙ্গাত্মক রচনা সম্পর্কে আপত্তি করায় ঈশ্বরচন্দ্র-প্রতাপচন্দ্র প্রহসন অভিনয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করেছিলেন।" (ডক্টর ক্ষেত্রগুপ্ত, ভূমিকা, মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃষ্ঠা ৫৩) কৃষ্ণকুমারী নাটকও "বেলগেছিয়ায় অভিনীত হবার আশা ছিল। কিন্তু নাটকটি অভিনীত হয় নি।"...(ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ৫৭)

নাটক-কাব্য রচনায় মধুসূদনের নিজের মানসিকতাও আলোচ্য হতে হয়।

ইউরোপের প্রতি তাঁর আকর্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে তাঁর ভোগবিলাসের দিকে দুর্বলতার কথা তুলেছেন। একথা অবশ্য সত্য যে তিনি আচরণে ও চরিত্রগতভাবে ভোগবিলাসী ছিলেন। সুতরাং ইউরোপের ভোগবিলাস তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু তবু এই 'ভোগের' মার্জিত অংশটা ভুললে চলবে না। ফ্রান্সে ভারত অপেক্ষা অনেক সস্তায় অনেক ভাল জিনিস ভোগ করা যায়, তাঁর এই উক্তি ও বিবরণকে উল্লেখ করে ভোগবিলাসে তাঁর আসক্তির কথা অনেকে বলেছেন। কিন্তু মধুসূদন বলেছিলেন 'such music, such dancing, such beauty'; তাছাড়া ইউরোপ প্রবাসে শত কষ্টের মধ্যেও তাঁর জ্ঞানানুশীলন ও পাঠানুশীলনে অধ্যবসায় সমানে চলেছে। এ বিষয়ে ইউরোপে তিনি যে সুযোগ পেয়েছিলেন ভারতে তা লভ্য ছিল না। এ সবও তাঁর কাছে সম্পদই ছিল। উপরে বর্ণিত সব কিছুকে মিলিত করেই তিনি ইউরোপে বসবাসকে লোভনীয় সম্পদ হিসাবে দেখতেন। অবশ্য ভোগবিলাসের প্রতি একটা অদম্য আকর্ষণ তাঁর মানসিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এটা সঠিক। তাঁর জীবনের কাহিনীই তা প্রমাণ করে।

কিন্তু ইউরোপ সম্বন্ধে তাঁর প্রধান আকর্ষণ ছিল অন্য কিছু। সে কথার পূর্বে তাঁর একটি উক্তির উল্লেখ করব। তিনি লিখেছেন:

"Besides, remember I am writing for that portion of my countrymen, who think as I think, whose minds have been more or less imbued with western ideas and modes of thinking and that is in my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit."

এখানে 'সার্ভাইল' শব্দটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংস্কৃতের অনুকরণ 'দাসসুলভ' হবে কেন? অবশ্য এক বিশেষ মনোবৃত্তিতে চর্চিত অনুকরণকেই তিনি বলছেন। তবু সংস্কৃতের ক্ষেত্রে এই ধরনের বিশেষণের অলঙ্করণ আজকের দিনে একটু কানে ঠেকে। অবশ্য পুরাতন পণ্ডিতসমাজ সংস্কৃতের নিগড়ে

যেরূপ আবদ্ধ ছিলেন তার কথা ভাবলে মাইকেল ব্যবহৃত শব্দ অসঙ্গত মনে হয় না।

পাশ্চাত্য চিন্তার রীতিনীতি (ওয়েস্টার্ন আইডিয়াজ অ্যাণ্ড মোডস্ অব থিঙ্কিং) সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত কম বয়সে তাঁর কি ধারণা ছিল বিভিন্ন উক্তি ও উল্লেখে তা পাওয়া যায়। তবে নিম্নের রচনাতে এর একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় :—

Oft like a sad imprisoned bird I sigh
To leave this land though mine own land it be ;
In green robed meads—gay flowers and cloudless sky
Though passing fair have but few charms for me.
For I have dreamed of climes more bright and free
Where virtue dwells and heaven-born liberty
Makes even the lowest happy ;—where the eye
Doth sicken not to see man bend the knee
To sordid interest ;—climes where science thrives,
And genius doth meet her guerdon meet ;
Where man in all his nicest glory lives.
And Nature's face is exquisitely sweet,
For those fair climes I heave the impatient sigh
there let me live and there let me die.

বোঝা যায় পশ্চিম সম্বন্ধে তাঁর কল্পনায় ছবি যাই থাকুক, প্রধান আকর্ষণ ছিল ব্যক্তির স্বাধীনতা ও ব্যক্তির মর্যাদা তথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য।

যেখানে তাঁর স্বাদেশিকতা থাকার সেটা ঠিকই ছিল। মেঘনাদবধ কাব্যের পৌরাণিক উৎস প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন :—

"I must tell you my dear fellow, that though as a jolly Christian youth I don't care a pin's head for Hinduism I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry. A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it." (Samsad edition. page 32)

"কৃষ্ণকুমারী" নাটকে (১৮৬১) তিনি তাঁর স্বদেশপ্রীতি এবং স্বাজাত্য বোধকে স্থাপিত করতে চেয়েছেন। এই নাটকে তা সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করেছে।

"পাইকপাড়ার রাজাদের ঔদাসিন্য দেখিয়া মধুসূদন আশা ছাড়েন নাই, ভাবিয়াছিলেন হয়তো যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় করাইবেন। সে আশাও যখন টিকিল না তখন মধুসূদন নাটক রচনা ছাড়িয়া দিলেন। বাংলা নাটকের ইতিহাসে এ বড় দুর্ঘটনা।" (সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২) অথচ "যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীতে একটি নূতন নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়।" (ব্রজেন্দ্রনাথ পৃষ্ঠা ৪৫) সেখানে মাইকেল মধুসূদনের নাটকের স্থান হল না। কি নাটকের স্থান হল? "উহাতে ১৮৬৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর 'বিদ্যাসুন্দরের' অভিনয় হয়।" (ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪৬) এখানে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সম্বন্ধে আর একটি ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্য ১৮৭৮ সালে ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট পাশ করা হয়। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে একটি সুপরিচিত অধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন:

The Vernacular Press Act was passed at one and the same sitting of the Imperial Legislative Council in April, 1878···The Act came upon the educated community as a bolt from the blue. In the Council Chamber not a single dissentient voice was raised. Maharaja Sir Jatindra Mohan Tagore who was then a member of the Imperial Legislative Council had been, so the report went, sent for and he voted with the Government.

স্বাভাবিক ভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে বেলগেছিয়াতে মধুসূদনের নাটকের অভিনয় বন্ধ হওয়ার ব্যাপারেও কি এর কোনও হাত ছিল? আরও অদৃশ্য কোনও হস্ত কি এর পিছনে ছিল? পরবর্তীকালে নীলদর্পণ উপলক্ষে লং সাহেবের জেল এবং নাটক নিয়ন্ত্রণের আইনে যে অশুভ শক্তির বিকাশ ঘটলো তার সক্রিয়তা কি মধুসূদনের প্রহসন ও নাটক অভিনয়ের বন্ধ থেকেই শুরু হয়েছিল? এ সবই এখন রহস্যাবৃত। তবে এ রহস্য উন্মোচন ভবিষ্যৎ গবেষণার উপযুক্ত বিষয়বস্তু।

যাই হোক, সাধারণ নাট্যশালার প্রয়োজনীয়তা কত জরুরী হয়ে উঠেছিল উপরের বিবরণেই তার যথেষ্ট পরিচয়।

দীনবন্ধু মিত্র

মাইকেলের পর বাংলা নাটকের শীর্ষস্থানীয় রচয়িতা হচ্ছেন দীনবন্ধু। বস্তুতঃ অনেকের মতে তাঁর দুটি নাটক নীলদর্পণ ও সধবার একাদশী বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ নাটক। প্রথমোক্ত নাটকই তাঁর প্রথম নাটক।

নীলদর্পণ নাটকের সার্থকতার পরিচয়-এর মধ্যেই যে একদিকে এই নাটক সম্পূর্ণ ক্রটিহীন না হলেও শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছিল, অন্যদিকে এ শুধু বাস্তব অবস্থার প্রতিবিম্ব নয়, এর মধ্যে আছে সেই বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনে সক্রিয়তার আহ্বান। সে আহ্বান এর ছত্রে ছত্রে। শেষোক্ত চরিত্রটি নাটকটিকে বাংলার ইতিপুর্বের এবং সমসাময়িক সমস্ত সামাজিক নাটক থেকে স্বতন্ত্র এক বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। যে কোন ঘটনা ঘটেছে ও আক্রমণ এসেছে উৎপীড়িত কৃষক প্রজা সকলে এমন কি মেয়েরাও তার প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের অংশগ্রহণ করতে তৎপর হচ্ছে। সমিতি, সংগঠন ব্যতিরেকেও একটি সার্বিক প্রতিরোধের রূপ বিকশিত হচ্ছে। নাটকের শেষে মৃত্যুর 'ঘনঘটাও' এর ছেদ টানতে পারছে না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিচরিত্রের জীবনাবসান ঘটলেও মনে হচ্ছে যেন একটা কিছু থেকে গেল যার অবসান ঘটেনি। কারণ, জীবন স্তব্ধ হলেও প্রতিরোধের অভিব্যক্তির রেশ রয়ে যাচ্ছে।

"...মাতা আমার পিতার মত ভীতা নন, তাঁহার সাহস আছে, তিনি একেবারে হতাশ হন না..." এই ছবি নাটকের আর এক চরিত্রের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করছে। প্রতিরোধে অংশগ্রহণকারী একজন নারীও তাঁর করণীয় সম্বন্ধে বিচলিত নন। আজও যারা প্রধান নারী চরিত্রকে দুর্বল কলঙ্কিত এবং বিশ্বাস-ঘাতী কিংবা আত্মসমর্পণকারী করে উপস্থিত ক'রে কেবল অনস্বীকৃত অভিনয় নৈপুণ্য ও আঙ্গিকের বিচিত্র কৌশলের আচ্ছাদনে আধুনিকতার নামে ও বামপন্থার অসত্য ভনিতায় পার হয়ে যায় তাদিকেও এই চিরায়ত নাটক অনেক শিক্ষা দিতে পারে। "মায়ের আমার সাহস আছে" আজও বাংলার কলে-কারখানায়-মাঠে সেই স্বর ধ্বনিত হচ্ছে, সেই ভরসা বুকে নিয়ে মায়ের গৃহচ্যুত সন্তানেরা. ছেলেরা ও মেয়েরা অমিত বিক্রমে লড়ে যাচ্ছেন। নীলদর্পণে উৎপীড়িতা নারীর এই প্রতিরোধের মহিমাকে তুলে ধরা হয়েছিল। নাটকের আর একটি ছবিও সঙ্গে সঙ্গে এই নাটককে এক বিশেষ মর্যাদায় স্থাপিত করে। ইংরাজের বিরুদ্ধে দেশের নিপীড়িত মানুষের ঐক্য, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিত মেহনতী মানুষের সংগ্রামী ঐক্য। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সাহিত্যে বিভ্রান্তিকর জাতীয়তা, "ইংরাজের সঙ্গে সখ্য ও নেড়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম" যা জাতীয় ঐক্যকে

বিস্মিত করে তার বদলে এই নাটকে এসেছে মেহনতী মানুষের অবিচ্ছিন্নতার আহ্বান। ইতিহাসের ঘটনাস্রোত নীলদর্পণের নবীন ও তোরাপের ঐক্যের রূপকেই সজীব করে তুলেছে। এখানেও দীনবন্ধু এক সার্থক ভূমিকা রেখে গেছেন।

দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'নীলদর্পণ' নাটকের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার একজন গ্রাহক লিখেছেন (২৪ ভাদ্র, ১২৬৯): "নীলদর্পণের বর্ণনায় যদি কোনও মহাত্মার সন্দেহ থাকে, তবে বারেক এ প্রদেশে আগমন করিয়া নীলকরদের অত্যাচার ও বিচার প্রণালী ও অস্মদের অবস্থা ক্ষণকাল দর্শন করিলেই বর্ণিত পুস্তকের একটি কথার প্রতিও অবিশ্বাস করিবার অনুমাত্র কারণ থাকিবে না।" (শ্রীবিনয় ঘোষ উদ্ধৃত)

"সধবার একাদশী" প্রহসন। নিমচাঁদের চরিত্রটি সুকৌশলে রচিত। নিমচাঁদ শিক্ষিত ও মাতাল। ভাল-মন্দ বিচার তার কিছু বাকি আছে। সুতরাং ব্যক্তি হিসাবে সে পাঠক বা দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। এই সামান্য সহানুভূতিটুকু নাটক রচয়িতার খুবই প্রয়োজন। কারণ নিমচাঁদের শিক্ষাকে তিনি দীপ্তি হিসাবে ব্যবহার করেছেন, যার স্বল্প ঠিকরে পড়া রশ্মিতে, নিমচাঁদ কোন্ অন্ধকার গহ্বরে পড়েছে তাও বোঝা যাচ্ছে, আবার আশেপাশের সব চরিত্রের বাবুদের ভণ্ডামির মুখোশকেও উন্মোচন করছে। তার লজিক কোনও-টাই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু সে লজিকের ঘায় সমাজের আর একটা দিকের মুখোস খুলে যায়, আসল চেহারা বেরিয়ে আসে। যেমন বড়লোকের ছেলের মদের পয়সা আসছে কোত্থেকে? "কিছু বলো না বাবা, ওর বাবা অনেকের সর্বনাশ করে বিষয় করেছে, টাকাগুলো সৎকর্মে ব্যয় হ'ক।" কিংবা ঘটিরাম ডেপুটির সঙ্কোচের পাতলা বহিরাবরণটুকু প্রশ্নের খোঁচায় ছিঁড়ে ফেলা "তুমি ব্রাহ্ম হয়েছ, হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা, এর তুমি সব ত্যাগ করেছ, কি দুটি একটি রেখেছ, সাত দোহাই তোমায়; যথার্থ বলো?" বিপর্যস্ত ঘটিরাম বলতে বাধ্য হলো **'the question is pointed'** নিমচাঁদের পাল্লায় বৈদিক ব্রাহ্মণের নাজেহাল হওয়া ইত্যাদি। পাঠক কিংবা দর্শককে সমস্তক্ষণ ধরে হাসিয়ে শেষে যে সিদ্ধান্তে নীত করেন তা হচ্ছে সুরা ও কামাশক্তিতে মানুষের অধঃপতন কতদূর হয় তারই পরিচয়। বড়লোকের ইয়ারের প্রকৃত অবস্থা কি, নিমচাঁদকে অটল আসলে কি চোখে দেখে, তার এত বিত্তের আস্ফালন সত্ত্বেও তার আসল দৈন্যটা কী তাও লেখক দাসীর মুখ দিয়ে বলে দিয়েছেন—পথে নিমাই পড়ে থাকলো এবং অটল আত্মীয় বাড়ী ঢুকে পড়ল। দাসী বলছে, "এই যে দেখছি অটলবাবুর ইয়ার, এই

গাড়ি করে নে বেড়ানো হয়…তা গাড়ি করে বাড়ী দিয়ে আসতে পারলেন না।" এই সামান্যতেই সব পরিষ্কার। মজা এই যে যারা বিচারক হয়ে শাস্তি দিচ্ছে নাট্যকার তাদের মর্যাদা দিতে পারছেন না শুধু অপরাধীদের দণ্ডবিধান করিয়ে দিচ্ছেন। কারণ তথাকথিত ভদ্রসমাজের আবরণের আড়ালে কি আছে তা নাট্যকার জানেন এবং সেই জ্ঞান তাঁর কলমকে উক্ত সমাজকে মর্যাদা দেওরার ক্ষেত্রে সংযত করছে। ওদের বিষয় আসয় অর্জন সম্বন্ধে নিমচাঁদ খোঁচা দেয়। সম্পত্তির মালিকদের প্রতি এই খোঁচার বাণ যেন লেখকেরও মনের কথা।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক আলোচনায়, ন্যাশনাল থিয়েটারের কথা প্রথমেই আলোচনা করতে হয়। উপরে আমরা দেখেছি, তৎকালীন জমিদারদের ব্যক্তিগত সখের থিয়েটারে মধুসূদনের "শর্মিষ্ঠা"র পর তাঁর অন্য কোন নাটকই গৃহীত ও অভিনীত হয় নি। মধুসূদনকে আশাহত হতে হয়েছিল। বস্তুত এই কারণেই মধুসূদন নাট্য রচনা বন্ধ করলেন। ইতিমধ্যে সখের নাট্যানুষ্ঠান বন্ধ ছিল না। সখের নাট্যানুষ্ঠানকে অবলম্বন করে আগ্রহী অভিনেতৃবৃন্দ গড়ে উঠেছিলেন। সাধারণের মধ্যেও আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। জমিদার ও ধনীদের ব্যক্তিগত রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখার সুযোগ সকলের হতো না। অথচ সংবাদপত্রে ও লোকমুখে প্রচারিত সংবাদে অনেকের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছিল। ('বর্তমান রঙ্গভূমি', গিরিশচন্দ্র, দ্রষ্টব্য) প্রয়োজন ছিল উদ্যোগের।

বাগবাজারের কয়েকজন যুবকের উদ্যোগে একটি এ্যামেচার অভিনেতৃদল গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে "নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাধামাধব কর ও অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তাফীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদেরই মধ্যে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গড়ে ওঠে। গিরিশচন্দ্রের অমত হয়। তাঁর নিজের বর্ণিত তাঁর অমতের কারণ উপরে একবার বিবৃত হয়েছে। পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। তবে ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বর্ণিত ইতিহাস পাঠে তাঁর বর্ণিত কারণ সম্পূর্ণ কারণ কিনা সে বিষয়ে সংশয় হয়। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা হলেই নাট্যশালা সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে অন্ততঃপক্ষে তাঁদের টিকিট কিনেও দেখার সুযোগ হবে—এটা স্বভাবতই গণতন্ত্রের পথে অগ্রগতি। কালের পরিপ্রেক্ষিতে এর গুরুত্বও যথেষ্ট। গিরিশচন্দ্র পরে নিম্নস্তরের ভাষায় এর সমালোচনা করেছিলেন—"স্থান মাহাত্ম্যে হাড়ি শুড়ি পয়সা দে দেখে বাহার।"—জমিদার ও ধনিক সহচরগণের বাইরের কিছু মানুষকে সুযোগ দেওয়াতেই তাঁর

এরূপ উষ্মা। ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকার পর পর দুইটি বিদ্বেষপূর্ণ পত্রে ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা বের হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "গিরিশচন্দ্র এগুলির রচয়িতা তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে।" সমসাময়িক মানুষেরও তাই ধারণা ছিল। পত্রগুলি পড়লে আজও কারও ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতান্তর হবে না। কিছু রাজনীতিক শঙ্কাও গিরিশচন্দ্রের এই মনোভাবে মিশ্রিত ছিল কিনা কে বলবে? ন্যাশনাল থিয়েটারে যা' প্রথম প্রদর্শিত হওয়ার কথা ছিল এবং প্রদর্শিত হয়েছিল তা হচ্ছে "নীলদর্পণ"। ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর সাধারণ রঙ্গালয় হিসাবে ন্যাশনাল থিয়েটার, আর তার প্রদর্শনী শুরু হয়। প্রথম দিনই হয় 'নীলদর্পণ'। সাত দিন অন্তর হতে থাকে। ১৪ই হয় "জামাই বারিক"। কিন্তু ২১শে পুনরায় হয় "নীলদর্পণ"। ১৯শে ডিসেম্বর ও ২৭শে ডিসেম্বর উপরে উল্লেখিত গিরিশচন্দ্রের বিদ্রুপাত্মক সমালোচনার চিঠি বের হয়। আর এই সময়েই ১৯শে ডিসেম্বর স্থানীয় ইংরাজদের সাম্রাজ্য-বাদী ঔদ্ধত্যের প্রতীক পত্রিকা "ইংলিশম্যানে" নিম্নে উদ্ধৃত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়:—

"A native paper tells us that the play of Nildarpan is shortly to be acted at the National Theatre in Jorasanko Considering that the Rev. Mr. Lang was sentenced to one month's imprisonment for translating the play, which was pronounced by the High Court a libel on Europeans, it seems strange that the Government should allow its representation in Calcutta unless it has gone through the hands of some competent censor and the libellous parts have been excised"

অমৃতবাজার পত্রিকা ন্যাশনাল থিয়েটারকে খুব উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছিল। প্রথম রজনীর অনুষ্ঠানের পর অমৃতবাজারে রিপোর্ট ছিল নিম্নরূপ:—"গত শনিবারে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। নাটকের অভিনয়··· নূতন নহে। কিন্তু এ সেরূপ অভিনয় নহে। সে সকলের স্থায়িত্ব অনেক অব্যবস্থিত চিত্তের প্রসাদের উপর নির্ভর করে, তাহাতে প্রায়ই সাধারণের মনোরঞ্জনের উপায় নাই। নীলদর্পণের অভিনেতৃবৃন্দ সমাজবদ্ধ হইয়া এই অভিনয় কর্ম সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহারা টিকিট বিক্রয় করিতেছেন এবং সেই অর্থে অভিনয় সমাজের উন্নতি ও পুষ্টি সাধন করিবেন মানস করিয়াছেন। আমরা একান্ত মনে তাঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। এখন সকলে দেখিতে পারিবে···মাছের তৈলে, মাছ ভাজা

চলিবে কাহারও খোশামদি করিতে হইবে না।" গিরিশচন্দ্র তাঁর উপরিউক্ত সমালোচনামূলক পত্রে বলেন "Amrita Bazar may call them who differ from it shallow or traitor ..." এখন প্রশ্ন, একথা কেন গিরিশচন্দ্রের মনে জাগলো যে অমৃতবাজার তাঁদের "বিশ্বাসঘাতী" বলতে পারেন? তিনি কেন মনে করছিলেন যে তখনকার দিনে যা নিঃসন্দেহে জাতীয়তাবাদী পত্রিকা বলে বিবেচিত তা তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করতে পারে?

পরে যখন ন্যাশনাল থিয়েটার নাম ডাকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এবং প্রতিষ্ঠার কারণে প্রাথমিক পদক্ষেপের চিন্তাভাবনা শঙ্কাদি দূরীভূত হলো তখন গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ দিলেন। এর পর আবার দলাদলি হয়েছিল। সে সব নিয়ে আমরা এখানে সংশ্লিষ্ট নই। গিরিশচন্দ্র নাট্যকার হিসাবে আবির্ভাব হওয়ার পূর্বে তাঁর প্রথম জীবনের উপরোক্ত অংশটুকু জানার দরকার বলে কিছু বিস্তৃত বিবরণ দিতে হলো।

এ রকম মন সংস্কারবর্জিত হওয়া কঠিন। ফলে একের পর এক পুরাণ, ধর্মতত্ত্ব, অবতার প্রভৃতি আসক্তিতে ঢলে পড়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। বিশেষ করে যুগটা হচ্ছে সেই যুগ যখন চাকা ঘুরেছে। প্রায় শতখানিক বছর ধরে এক-দিকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ অন্যদিকে তার সৃষ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে জমিদারি ব্যবস্থা বুকে চেপে বসেছে। প্রজা সম্পূর্ণ সত্বহীন। বাংলার প্রজার কাছে রাজার আবেদনের প্রশ্ন নেই। প্রাচীনকালের মতো "মতমস্তু ভবতাম" --আশাকরি তোমাদের মত হবে একথা তাদের আর কেউ বলছে না। তাছাড়া একা রাজা এখন সনদ বা প্রস্তরলিপি দেওয়ার মালিক নন। শুধু মূল পারমিট জমিদাররা পেয়েছে তা নয়, তাদের অধীনে পারমিট দেওয়ারও অধিকার পেয়েছে, আবার সে অধিকারও অপরকে অর্সাবার ক্ষমতা পেয়েছে। ফলে গভর্ণমেণ্ট আর প্রজার মাঝে জমিদার ছাড়াও পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, সেপত্তনীদার, ইজারাদার, তালুকদার অনেক থাক সৃষ্টি হয়েছে। এই সব নবসৃষ্ট মধ্যস্বত্বের সঙ্গে সুদীকারবার যুক্ত করে মূলে আর শিকড়ে বিস্তৃত হয়ে এক বিরাট পরভুক প্যারাসাইট সংগঠন বাংলার কৃষকের বুকে বসেছে। "সংগঠন" অর্থেই তাকে বুঝতে হবে। কারণ, যে আইনের বলে তারা সৃষ্ট সেই আইনের ফলেই থাকের পর থাক তারা একের সঙ্গে এক বাঁধা, সংগঠিত এবং সংহত। বড় জমিদার থেকে গ্রামের ক্ষুদে তালুকদার, ইজারাদার পর্যন্ত জানে যে তারা একই স্বার্থে জড়িত এবং তাদের উত্থান ও পতন একই সঙ্গে। সাম্রাজ্যবাদের দরুন বিক্ষোভ ও বঞ্চনাও আছে, তার বিরোধিতাও আছে। তবু স্ফীতি ও ব্যাপ্তি স্বত্বেও,

জমির উপসত্ব ভোগের পেশার সুযোগের একটা সীমা আছে। "ক্ষুদ্রত্বের" অভাব অভিযোগ ছাড়াও প্রতিরুদ্ধ উচ্চাশার বিক্ষোভও আছে। তাই রাষ্ট্র ক্ষমতার স্বপ্ন জেগে উঠছে। কিন্তু যখনই প্রজাদের বিক্ষোভ মাথা উচিয়ে উঠেছে তখনই সব 'রাইচাস ইনডিগনেশান' জন ষ্টুয়ার্ট মিল আর হিতবাদ (বৃহত্তম সংখ্যার মানুষের বৃহত্তম মঙ্গল) সঙ্কুচিত হয়ে আড়চোখে তাকিয়ে দেখছে বৃটিশ ব্যায়নেট কতক্ষণে শাস্তি ফিরিয়ে আনতে পারে। নিরুপদ্রবের নির্বিঘ্নতার ক্রোড়েই নিরাপত্তা। ন্যূনতমরূপে অন্ততঃ এইটুকু সচেতন সতর্কতা পরিব্যাপ্ত ছিল। কৃষকের অনুকূলে সহানুভূতির প্রবাহ রোধ করার জন্য এইটুকুই ছিল যথেষ্ট। অবশ্য অভিনয় দর্শকদের মধ্যে এদের সংখ্যা নিশ্চয়ই কম থাকতো! তবু কোনও না কোনও রকমে সংশ্লিষ্ট এরূপ কিছু অংশ থাকতো। কিন্তু নাট্যপরিবেশনা যতই ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে পরিসর বাড়াতে লাগলো ততই 'সম্পত্তির' প্রভাব ধনীদের প্রভাব সংগঠকদের মধ্যে দর্শাবে এতো স্বাভাবিক। প্রারম্ভে অবশ্য তেমন বোধ্য কিছু ছিল না ("...শুনিলাম এই ন্যাশনাল থিয়েটার কোনও বড় মানুষের বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই..." অমৃতবাজার পত্রিকা, ১২।১২।১৮৭২ ব্রজেন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ৮৯)। উদ্যোগ খেটে খাওয়া মধ্যবিত্তেরই। কিন্তু যা বোধ্য ছিল না পরে আরও বোধ্য হয়েছে এবং পরিমাণে অনেক বেড়েছে। আবার গিরিশচন্দ্র উল্লিখিত দৌরাত্ম্য (এবং বর্তমানে একটি নাটকের অভিনয় বিজ্ঞপিত) শুধু কাপ্তেনবাবুর কাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ("...একটার একট্রেস তো একে লেখা পড়া জানেনা, তাহার উপর যে একট্রেসটিকে শিক্ষিত করা যায় তাহাকে অনেক কাপ্তেনবাবু স্টেজ হইতে লইয়া যান..." গিরিশচন্দ্র, 'বর্তমান রঙ্গভূমি' বসুমতী সংস্করণ, ১১শ খণ্ড পৃষ্ঠা ১০৫)। ধনীদের প্রভাব সমস্ত সংস্কৃতির দিকস্থিতি (ওরিয়েন্টেশান) উল্টে দিয়েছে। উপরন্তু এই ধনী বলে যাঁরা উল্লিখিত হচ্ছেন তাঁরা গোড়া থেকেই জমির উপসত্ব-ভোগী কিংবা পরে তাই হয়েছেন কিংবা পেশা হিসাবে (যেমন আইন ব্যবসায়ী-দের ক্ষেত্রে) ঐরূপ স্বার্থের সঙ্গেই জড়িত। সংস্কৃতিতে কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থের বৈপরীত্য স্পষ্ট হয়েছে। সে বৈপরীত্য দর্শিয়েছে মাইকেল বা দীনবন্ধুতে নয়। তা দর্শিয়েছে সেই পুনরুত্থানে (রিভাইভ্যালিজমে) বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যার কেন্দ্রে অবস্থিত বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক, সামাজিক ও রাজনীতিক মতবাদ। রামমোহন, মাইকেল, বিদ্যাসাগরের জগৎ থেকে দিকস্থিতি হটিয়ে দেওয়া হয়েছে। পূর্বের সে প্রভাব গিরিশচন্দ্র ভালই বর্ণনা করেছেন। "...যাঁহারা Young Bengal নামে অভিহিত হইতেন তাঁহারাই সমাজে মান্যগণ্য ও বিদ্বান বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। বাংলায় ইংরাজী শিক্ষার তাঁহারাই প্রথম ফল। তাঁহাদের

মধ্যে অনেকেই জড়বাদী, অল্পসংখ্যক ক্রিশ্চিয়ান হইয়া গিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা তাঁহাদের কাহারও মধ্যে প্রায় ছিল না বলিলেও বলা যায়।·· আবার জড়বাদীরা বুদ্ধি-বিদ্যায় সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য, ঈশ্বর না মানা বিদ্যার পরিচয়।" (গিরিশচন্দ্র 'ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব')। অর্থাৎ গিরিশচন্দ্রের ছাত্রাবস্থায় শতাব্দীর শেষার্দ্ধের গোড়ায় এনলাইটেনমেণ্টের নবালোকের প্রভাব আছে। এনলাইটেনমেণ্ট সম্বন্ধে লেনিন বলেছেন, এঁরা ভবিষ্যতের দ্বন্দ্ব আঁচ করতে পারতেন না। অর্থাৎ শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণীস্বার্থের বৈপরীত্য তাঁদের শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে এমন ভয়ভাবনা তাঁদের ছিল না। ফলে এঁদের যুক্তিভিত্তিক চিন্তা-ধারায় কোনও আগল ছিল না। রিভাইভেলিজম সেই যুগের পরিচয় যে যুগের উপরতলার শ্রেণী শ্রেণীসংঘর্ষ ও বিক্ষোভের পরিচয় পেয়ে গেছে, আতঙ্কিত হয়েছে এবং চাকা ঘোরাবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছে। সেই জন্য মাইকেল 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' লিখতে পারেন—যদিচ রঙ্গমঞ্চ পান না। পরের যুগের ঐরূপ শ্রেণীর ক্ষেত্রে ঐ দৃষ্টান্ত বিরল। পরে ঐ শ্রেণী, এমন কি (জমির উপসত্বভোগী স্বার্থের প্রসারের কারণে) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশের মধ্যেও এন-লাইটেনমেণ্টের প্রভাব সংকীর্ণ, এমন কি অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। লেনিন দেখিয়েছিলেন যারা ভবিষ্যৎ শ্রেণীদ্বন্দ্ব সম্বন্ধে অচেতন থেকে প্রগতির পথে থেকেছে তাদের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের মিলবে কিন্তু যারা পরে দ্বন্দ্ব সচেতন হয়ে পিছন ফিরবে, তাদের সঙ্গে মিল থাকবে না। বরং বিরোধিতা হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যে সব ইংরেজেরা এদেশের চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন তাঁরাও ছিলেন গিরিশচন্দ্রের ভাষায়—"জড়বাদী"। ডেভিড হেয়ার ঘোষিতভাবেই ছিলেন নাস্তিক। হিন্দু কলেজের বিশিষ্ট অধ্যাপক রিচার্ডসনও ছিলেন তাই। ডিরোজিও ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের সৃষ্ট 'Reason' এর উপাসক। তাছাড়াও ইংলণ্ডের বুর্জোয়া সংস্কৃতিতেও তখন বস্তুবাদের প্রচুর প্রভাব এবং তার সংস্পর্শে এলেও সে প্রভাব সংক্রামিত হয়। কিন্তু পরে ধনতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া সংস্কৃতিতে ঐ প্রভাব আর থাকল না। এঙ্গেলসের প্রসিদ্ধ পুস্তক "সোশ্যালিজম্ ইউটোপিয়ান এণ্ড সায়েনটিফিক"-এ দেওয়া এঙ্গেল্সের ব্যাখ্যাই এখানে উদ্ধৃত করছি:

"···I am perfectly aware that the contents of this work will meet with objection from a considerable portion of the British public. But if we continentals had taken the slightest notice of

the prejudices of British "respectability" we should be even worse off than we are. This book defends what we call "historical materialism" and the word materialism grates upon the ears of the majority of the British readers. "Agnosticism" might be tolerated but materialism is utterly inadmissible.

And yet the original home of all modern materialism, from the seventeenth century onward, is England, Materialism is the natural-born son of Great Britain. The real progenitor of English materialism is Bacon……Hobbes had systematized Bacon without, however, furnishing a proof for Bacon's fundamental principle, the origin of all human knowledge from the world of sensation It was Locke who, in his "Essay on Human understanding" supplied this proof…"

"Hobbes had shatterd the theistic prejudices of Baconian materialism. Deism is but an easygoing way of getting rid of religion."

শেষের অনুচ্ছেদটি এঙ্গেলস কর্তৃক মার্কসের 'হোলিফ্যামিলি' হতে উদ্ধৃতি। যাদের অনুসরণ করা উচিত মানুষের সেই শিক্ষাদাতা হিসাবে বেকন আর লক এই দুই জনেরই নাম তুলে ধরেছিলেন বাংলায় এনলাইটেনমেণ্টের প্রতিনিধি—রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর।

কিন্তু ইংলণ্ডেও অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল। কেন, কি কারণে হলো তার বিস্তৃত বিবরণ এঙ্গেল্‌স্ উল্লেখিত পুস্তকে দিয়েছেন কিন্তু তার আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। শুধু এঙ্গেল্‌সের উপসংহারটা উদ্ধৃত করব।

"But the English middle class—good men of business as they are—saw farther than the German professors. They had shared their power but reluctantly with the working class They had learnt during the chartist years, what that *puer robustus sed malitiosus* the people is capable of. And since that time, they had been compelled to incorporate the better part of the People's charter in the Statutes of the United Kingdom. Now, if ever the people must be kept

in order by moral means and the first and foremost of moral means of action upon the masses is and remains religion. Hence the parsons' majorities in the School Boards, hence the increasing self-taxation of the bourgeosie for the support of all sorts of revivalism, from ritualism to the Salvation Army……"

ইংলণ্ডের অবস্থা শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এইরকম। ফলে এখানকার রিভাই-ভেলিস্ট মত ইংলণ্ডের অনুরূপ মতের কাছে সমর্থন পেল। এ তো গেল শোষকশ্রেণীর শোষণের প্রয়োজনে ধর্মের দিকে ঘুরে দাঁড়ানোর একটি বিশেষ নিদর্শন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় বুর্জোয়া প্রগতিশীলতা এবং তার ধর্মবিরোধী প্রচারের ধার এরকম ব্যর্থ বা ভোঁতা হয়ে যায় কি করে? লেনিন বলেছেন, শহরের প্রলেতারিয়েত, আধা-প্রলেতারিয়েতের একটা ব্যাপক সংখ্যা আর কৃষকের উপর ধর্ম তার প্রভাব রাখে কি করে? জ্ঞান ও শিক্ষার অভাবে, প্রগতিশীল ও নাস্তিক বুর্জোয়ার এই জবাবের উত্তরে লেনিন বলেছেন—মার্ক্সবাদী মনে করে তা সত্য নয়, এটা হচ্ছে সঙ্কীর্ণ ও বাহ্যিকভাবে দেখা।

যারা জনগণকে 'উত্তোলন' করবে এই মনোভাব নিয়ে কথা বলে তারাই এ রকম বলে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে লেনিন বলছেন—

"It does not explain the roots of religion profoundly enough ; it explains them not in a materialist way but is an idealist way. In modern capitalist countries these roots are mainly social. The deepest root of religion today is the socially downtrodden condition of the working masses and their apparently complete helplessness in face of the blind forces of capitalism, which every day and every hour inflicts upon ordinary working people the most horrible suffering and the most savage torment, a thousand times more severe than those inflicted by ordinay event such as wars, earthquakes etc."

"Fear made the gods" fear of the blind force of capital-blind because it cannot be foreseen by the masses of the people which at every step in the life of the proletarian and

small proprietor threatens to inflict and does inflict 'sudden' 'unexpected' 'accidental' ruin, destruction, pauperism, prostitution death from starvation such is the root of modern religions...."

জনসাধারণের কথা ছাড়াও গিরিশচন্দ্র নিজেই নিজের জীবন সম্বন্ধে যা বলেছেন তাতেও শেষের ধরনের বর্ণনার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ধর্মের দিকে তাঁর আকর্ষিত হওয়ার সম্বন্ধে তিনি বলছেন: "পরের দুর্দিন আসিয়া ঠিক নিশ্চিত থাকিতে দিলনা। দুর্দিনের তাড়নায় চতুর্দিক অন্ধকার দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম, বিপদমুক্ত হইবার কোনও উপায় আছে কি? দেখিয়াছি অসাধ্য রোগ হইলে তারকনাথের শরণাপন্ন হইয়া থাকে, আমারও তো কঠিন বিপদ, একরূপ উদ্ধার হওয়া অসাধ্য। এ সময়ে তারকনাথকে ডাকিলে কিছু হয় নাকি?" (গিরিশচন্দ্র, 'ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব') এর থেকে বিবর্তনে তিনি শেষে রামকৃষ্ণের ভক্তে পরিণত হন। উল্লিখিত প্রবন্ধে তিনি তারই বর্ণনা দিয়েছেন। (অপ্রত্যাশিত বিপদের আঘাত গিরিশচন্দ্রের মাথায় এমন চেপে বসেছিল যে তাঁর নাটকগুলির কাহিনীতে এরই প্রাচুর্য্য।)

গিরিশচন্দ্র প্রসঙ্গে রিভাইভেলিজমের ব্যাপারটা বেশী করে আলোচনা করলাম এই জন্যই যে এটা শুধু গিরিশচন্দ্রের নাটকের ব্যাপার নয়, অমৃতলাল বসু প্রমুখ সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালের অনেকের নাটকে এর প্রচুর প্রভাব রয়েছে। তাছাড়া সাধারণভাবে সাহিত্য এবং নাটকের অন্যান্য বিভাগেও সংশ্লিষ্টকালে এর সমরূপ প্রভাব থেকেছে।

ডক্টর অজিত ঘোষের একটি উদ্ধৃতি এখানে প্রাসঙ্গিক—"গিরিশচন্দ্রের নাটকে আমরা সনাতন ধর্ম ও আদর্শের প্রতি অটুট আস্থা লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহার পঞ্চরংগুলিতে পাশ্চাত্য অনুকরণপ্রিয় যুব সমাজকে নিন্দা করা হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের পরে অমৃতলাল এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গাত্মক রচনায় এই সমাজকে নির্মমভাবে আঘাত দেওয়া হইয়াছে। পাশ্চাত্য ভাব ও আদর্শের প্রতি এককালে যে অনুরাগ জন্মিয়াছিল তাহার পুরাপুরি প্রতিক্রিয়া এই সময়ে দেখা গিয়াছিল। মাইকেল ও দীনবন্ধুর প্রহসনেও ইংরাজী শিক্ষিত অধঃপতিত সমাজকে উপহাস করা হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহারা 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'সধবার একাদশী' লিখিয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'জামাই বারিক', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' রচনা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী যুগের নাট্যকারদের মধ্যে সংস্কার

পক্ষপাতী উন্নত মতবাদ লক্ষিত হইয়াছিল। রামনারায়ণ তর্করত্ন, দীনবন্ধু মিত্র এবং মনোমোহন বসু প্রভৃতি নাট্যকারের নাটক এবং প্রহসনে কৌলীন্য, বহুবিবাহ, বৈধব্য প্রভৃতি প্রাচীন প্রথার দোষ ও অনিষ্টকারিতা দেখানো হইয়াছে। গিরিশযুগের প্রতিক্রিয়াপন্থী নাট্যকারদের মধ্যে এইসব কুপ্রথার সম্বন্ধে কোনও নিন্দাবাদের পরিবর্তে বরং সমর্থনের ভাব লক্ষ্য করা যায়। অমৃতলালের প্রহসনেও সর্বত্র নব্যতন্ত্র উপহসিত এবং প্রাচীনতন্ত্র প্রশংসিত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র বিধবা-বিবাহের কুফল দেখাইয়াছিলেন, অমৃতলালও 'খাসদখল', 'বাবু' প্রভৃতি নাটকে বিধবা-বিবাহ যে একটি হাস্যকর অসঙ্গত ব্যাপার তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন। পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহ আন্দোলন বঙ্কিম-গিরিশ-অমৃতলালের হাতে এই পরিণাম লাভ করিল।" (বাংলা নাটকের ইতিহাস, ৪র্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২২৫)

বিশেষজ্ঞগণ গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনাকে কালানুযায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম মশ্‌ক হয় বঙ্কিম, মাইকেল, নবীন সেন প্রমুখের উপন্যাস বা কাব্যকে নাট্যরূপ দান করে। ১৮৮১ থেকে শুরু হয় তাঁর মৌলিক রচনা। যুগ এবং তার আখ্যায়নে দেখা যাবে ধর্মভাবের প্রাবল্য। "পৌরাণিক যুগ, অবতার মহাপুরুষ যুগ। তার পর যে যুগ প্রধানতঃ গার্হস্থ্য ট্রাজেডি ও বিয়োগান্ত পৌরাণিক, শেষে আসছে মহৎচরিত্রে দেশপ্রেম ও প্রাচীন জগতের আদর্শখ্যাপন।" শেষের এই "আদর্শখ্যাপনে"ও আছেন "শঙ্করাচার্য্য" এবং "তপোবল"।

ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন : "গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার মূল নির্দ্ধারণের পূর্বে এই কথা অবশ্য স্মরণীয় যে তিনি ছিলেন সুদক্ষ অভিনেতা, অভিনয়ের জন্যই তিনি নাটক লিখিতেন এবং সাধারণ দর্শক রঙ্গমঞ্চে কি চাহিত তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহার নিজের মনে যে আধ্যাত্মিক আদর্শ জাগরূক ছিল তাহা তিনি নাটকের মধ্যে রূপ দিতে চেষ্টা করিতেন।" অবশ্য "সাধারণ দর্শক রঙ্গমঞ্চে কি চাহিত তাহা তিনি জানিতেন"—একথাটা আমরা অন্য মতো বুঝবো। সাধারণের সংস্কার ধর্মের প্রতি দুর্বলতা তিনি বুঝতেন। তাঁর নিজের এসব ছিল বলে তিনি এগুলি আরও ভাল করে বুঝতেন। কিন্তু ঐ সাধারণ মানুষ যদি শুধু ধর্মই চাইতো তা হলে "নীলদর্পণ" উপভোগ করতো কি করে? এও স্মরণ রাখতে হবে যে এই "নীলদর্পণই" সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে বেগ সঞ্চার করে দিয়ে ঐরূপ রঙ্গালয়ের সম্ভাবনাকে সার্থক করে লোকের সামনে তুলে ধরেছিল। এই সার্থকতাই যোগদানে অনিচ্ছুক গিরিশচন্দ্রকে টেনে

এনেছিল। পরমহংসদেব অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী করেছিলেন বলে তাঁর ভক্ত দাবী করেন; আলোচ্য ক্ষেত্রে 'নীলদর্পণ' কি সেইরূপ অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসীতে পরিণত করেনি? গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন "ধর্মপ্রাণ হিন্দু ধর্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে।" তাঁর নিজের নাটকের ক্ষেত্রে কি তাঁর প্রত্যাশিত এই 'আদরের স্থায়িত্ব' থেকেছে? সুতরাং সাধারণ শুধু চায় না—তাকে চাওয়ানোও হয়। কে কি চাওয়ায় সেটাও আলোচ্য বা বিচার্য।

গিরিশচন্দ্রের নাটক পৌরাণিক বলেই তা সমালোচনার বস্তু কথাটা তা নয়! মাইকেলের "মেঘনাদও" তো পৌরাণিক। পৌরাণিক কাহিনীর রূপায়ন কিরূপে করা হলো তার মধ্যে বিষয়বস্তু, লক্ষ্য ইত্যাদি কি থাকলো সেইটাই প্রধান কথা। ধর্মের আর একটা দিক থাকে সেটা হচ্ছে বিভেদের দিক। সমসাময়িক এবং পরবর্তী কালের অনেক নাটক ও সাহিত্যে এই বিভেদ ও বিদ্বেষের কাজেই ধর্মকে প্রধানতঃ ব্যবহার করা হয়েছে। গিরিশচন্দ্র অন্ততঃ এই অভিযোগ থেকে মুক্ত। তাঁর লেখায় এমন কিছু করা হয়নি যাতে আসল শত্রুকে ছেড়ে দিয়ে হানিফ আর বাচস্পতি কিংবা তোরাপ আর নবীনমাধব পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।

ইবসেন একবার বলেছিলেন তাঁর কারবার মানুষ, মানুষের ভাগ্য প্রভৃতি নিয়ে। কিন্তু তিনি শুনে আশ্চর্য হয়েছেন তাঁর ঈপ্সিত না হলেও তাঁর লেখা এমনভাবে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যাতে সোশ্যাল ডেমোক্রেসির নৈতিক তত্ত্বের দার্শনিকরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে পৌঁছেছেন। (রুবিনসটাইন কর্তৃক উদ্ধৃত গ্রেট ট্রাডিশান অফ ইংলিশ লিটারেচার, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৮৯২) তিনি অবশ্যই প্রগতিশীল নাট্যকার ছিলেন। কিন্তু যাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল সেসব সাহিত্যিকের সাহিত্য সৃষ্টিতেও তাঁহার উদ্দেশ্য সেরূপ না থাকলেও অনেক সময় টুকরো টুকরোভাবে প্রগতিশীলতার রূপ বেরিয়ে থাকে। যুগের প্রভাব; সাধারণ মানুষের প্রভাব শিল্পীর হাত থেকে কোনও কোনও সময় মোচড় দিয়ে কিছু অর্ঘ্যও আদায় করে নেয়।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক 'জনা'তে এরই নিদর্শন পাওয়া যায়। মাইকেলের বীরাঙ্গনা কাব্যে 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' কবিতার প্রতিফলন এখানে দেখা যায়। "জনার গৌরবময় মাতৃত্ব, স্বদেশ হিতৈষনা, তেজস্বিতা এবং সর্বোপরি তাহার জীবনের করুণ ট্রাজেডি মধুসূদন তাহার সংক্ষিপ্ত কবিতায় অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন। মধুসূদনের সংহত এবং সংক্ষিপ্ত চরিত্র গিরিশচন্দ্রের নাটকে বিস্তৃত এবং বিশ্লেষিত হইয়াছে।" (ডক্টর ঘোষ, পৃষ্ঠা-১৯২)

বলবানের কাছে. অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে জনার ঘৃণা, প্রতিরোধে পুত্রকে উৎসাহ দান, পুত্র নিহত হওয়ার পরও আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি নারীর এই মহিমময় ও বীরাঙ্গনা চরিত্র সমস্ত নাটকটিকে আলোকিত করে রেখেছে।

জনা পুত্রবধূকে বলছেন :

"পতির মঙ্গল যদি চাহ গুণবতী
ইষ্টদেবে পূজা কর পতির কল্যাণে
রাজকার্য্য পুরুষের ভার
অংশী তুমি কেন হও তার ?"

কিন্তু সমস্ত নাটকটিতে জনার যা ভূমিকা তা হলো উপরোক্ত উক্তির ঠিক বিপরীত। বাধ্য হয়ে তাঁকেই নেতৃত্ব নিতে হচ্ছে। মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলছেন :

"ধিক মন্ত্রীবর, শত ধিক সেনাপতি !
প্রায় নিশা অবসান,
আছ সবে জম্বুক সমান দাঁড়াইয়ে ?
প্রাতে অরি আক্রমিবে পুরী
উৎসাহ বিহীন আছ পুতলী সমান ?
মরণে কি মন্ত্রী এত ভয় ?
রণ-মৃত্যু না হলে কি এড়াবে শমন ?
ধিক-ধিক কি কব অধিক
সুসজ্জিত না হেরি বাহিনী !
ঘোর রবে কর সিংহনাদ
বজ্রাঘাত করি শত্রু বুকে।"

প্রবীরের কামোন্মত্ত হয়ে প্রতারণার শিকার হওয়া সমস্ত নাটকের চরিত্রের বিপরীত। জনসাধারণের ভূমিকাকে অহেতুক ছোট করা হয়েছে। যুদ্ধের পূর্বে প্রবীরের বর্ণনায় রয়েছে "কালি সন্ধ্যাকালে ভ্রমিয়া নগরে হেরিলাম সবে, হতাশ সবার প্রাণে।" এবং যুদ্ধের পর বিজেতাকে অভ্যর্থনা করার ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ জনা বলেছেন, "আনন্দ উৎসব দেখিলাম নগরে রাজন্ ! মহোৎসব—মহা-আয়োজন কার অভ্যর্থনা হেতু ?" রাজা, মন্ত্রী প্রমুখ যারা আত্মসমর্পণ করছে তাদের সঙ্গে জনসাধারণকে টেনে আনার তো কোনও প্রয়োজন ছিল না। জনসাধারণকে বাদ দিয়ে একক বীরত্বের আদর্শ মধ্যবিত্ত পেতিবুর্জোয়ার খুব

প্রিয়। তাই প্রবীরের মুখে "হারি জিনি একেশ্বর পশিব সমরে।" প্রবীরের বিচ্ছিন্নতাকে সুস্পষ্ট করার জন্যও এর প্রয়োজন ছিল না। তবু 'জনা' চরিত্রে নতি স্বীকারের বিরুদ্ধে মানুষের অটল ও অদম্য শক্তির পরিচয় সকল মানুষের মনকে নাড়া দেয়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়লো। কয়েক বৎসর পূর্বের একটি নাট্য-প্রদর্শনী বামপন্থীদের মধ্যে খুব উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল। সাধারণ রাজনীতিক ঘটনার সঙ্গে তাতে একটি আখ্যায়িকা যুক্ত ছিল। তাতেও শাশুড়ী ও পুত্রবধূর চরিত্র ছিল। পুত্রবধূ দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলো এবং শাশুড়ী—যার চরিত্র ছিল সংগ্রামী সেও আত্মসমর্পণকারী বধূকে মেনে নিয়ে বধূর আত্মসমর্পণ সিদ্ধান্তে অনুমোদন প্রকারান্তরে প্রত্যাহার করলো। গিরিশচন্দ্রের জনা ও পুত্রবধূর সঙ্গে এর তুলনা করতে গেলে কোন্ সিদ্ধান্তে পৌছোতে হয়?

"একটি কথা আমার বিবেচনায় কলিকাতায় গৃহস্থ ভদ্রলোকই দুঃখী, এই পাড়ায় দেখো চাকরী বাকরী করে আনছে—নিচ্ছে, খাচ্ছে, যেই একজন চোখ বুজলো, অমনি তার ছেলেগুলি অনাথ হ'ল; কি খায় তার আর উপায় নাই। তাদের যে কি অবস্থা তার আর বলবো কি! ভাইরে আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি!" এই হাড়ে হাড়ে বোঝার ছবি গিরিশচন্দ্রের নাটকের পটভূমিকা। 'প্রফুল্ল' নাটকে এক গৃহস্থ পরিবারের কাহিনী—তাদের বর্তমানের সৌভাগ্য নিয়ে আরম্ভ হচ্ছে, কিন্তু অতীতের খোলার ঘরের দিনগুলির ভয়াবহতা পশ্চাৎপট হিসাবে থাকছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দৃশ্যেই এই সৌভাগ্যের অন্যতম উৎসেরও পরিচয় আছে। বৃন্দাবন যাবার আগে মা বলছেন ছেলেকে "আর বলছিলাম কি চাটুয্যে ঠাকুরপোর তো কিছু নেই, ঢের সুদ খেয়েছি, ওর বন্ধকী জিনিসগুলি ফেরৎ দিও।" পুনরায় "আমার আর কিছু দাবি নাই। যারা যারা ধারে তাদের যদি ঋণে মুক্তি দিতে পারি, এইটি আমার ইচ্ছা। শুনেছি বাবা দেনা দিতেও আসতে হয়, পাওনা নিতেও আসতে হয়।"

সমগ্র মিলে তখনকার কলকাতা শহরের মধ্যবিত্তদের মধ্যে ব্যাপক সংখ্যায় যাদের দুর্ভাগ্য আর মুষ্টিমেয় যাঁদের সৌভাগ্য উভয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। এই সৌভাগ্যবান পরিবার বজ্রাঘাতে বিধ্বস্ত হবার মতো বিধ্বস্ত হয়ে গেল। কিন্তু মেকলের অতি পরিচিত উপমা—"As falls on Mount Alvernus the thunder-smitten oak." সে উপমা ঠিক খাপ খায় না! কারণ এক চোটেই শেষ হলো না। ত্বরিত ঘটলেও ক্রমোত্তরতা আছে।

দারিদ্র্য অভাবজীর্ণতা যে কোনও যুগেই হতে পারে। কিন্তু এ কাহিনী

পড়লে বোঝা যাবে এ এক বিশেষ সময়ের কথা এবং এক বিশেষ শহরের কথা। প্রথম যে আঘাত আসছে সে হচ্ছে—ব্যাঙ্ক ফেল। শ্রমজীবী মানুষের উপর এ আঘাতের কিছু অংশ পড়তে পারে, পরোক্ষ ভাবে। কিন্তু প্রত্যক্ষ আঘাতের শিকার হচ্ছে 'সৌভাগ্যবানেরা' আর 'স্বল্পবিত্ত' মানুষেরা। এ একটা ব্লাইণ্ড ফোর্স অব ক্যাপিট্যালিজম্ যা হচ্ছে (উপরে উদ্ধৃত) লেনিনের ভাষায় "এ থাউজ্যাণ্ড টাইম্‌স্ মোর সিভিয়ার গ্যান দোজ ইনফ্লিকটেড বাই একস্ট্রা অর্ডিনারী ইভেনট্‌স্ সাচ্ অ্যাজ ওয়ার্‌স আর্থকোয়েক্‌স্"। এর সঙ্গে আছে উকিলের সৃষ্ট সর্বনাশ—জোচ্চোরি, ধাপ্পাবাজি, নানান রকম। বড় ভাই যোগেশই খেটে খুটে সম্পত্তি করেছে। প্রতারক মেজ ভাই আর সম্পত্তির সাময়িক চরিত্র—ক্যাপিট্যালিজম্ আর তার সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি যার সমসাময়িক প্রতাপ ছিল আইন আর ওকালতির ব্যবসায়—এই সবে মিলে পরিবারটির সর্বনাশ। আমার বলার উদ্দেশ্য, এই পরিবেশ থেকে দুর্দশার কাহিনীটি বিচ্ছিন্ন করা যায় না। প্রথম দৃশ্য থেকেই নাট্যকার একটি একটি করে খোলা খুলে পরিবেশের এই চরিত্রের অভ্যন্তরের সব কিছু নোংরামিকে দেখবার সুযোগ দিচ্ছেন। এ অবলম্বন না থাকলে তাঁর কাহিনী এগোয় না।

কেউ কেউ বলেছেন যোগেশের ট্রাজেডির কারণ তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা। অন্যেরা তা অস্বীকার করেছেন। যে খেটে খুটে সম্পত্তি করলো তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা থাকবে কেন? সে কথাও মানতে হয়। কেউ কেউ আকস্মিক একটা ব্যাঙ্ক ফেলের ঘটনা—এই ঘটনাতেই ট্রাজেডি—তাতে ট্রাজেডির সার্থকতাকেই মেনে নিতে পারছেন না। এ সবই হলো বিচ্ছিন্ন করে দেখার ফল। ব্যাঙ্ক ফেলটা একটা যুগের বৈশিষ্ট্য। পৌরাণিক যুগে ব্যাঙ্ক ফেল নেই।

"The bourgeoise wherever it has got the upper hand, has put an end to all feudal patriarchal, idyllic relations. It has pitilessly torn asunder the motley feudal ties that bound man to his natural superiors and has left remaining no other nexus between man and man than naked selfinterest." কমিউনিস্ট ইস্‌তাহারের এই উদ্ধৃতি এখানে প্রাসঙ্গিক। যোগেশের দুর্বলতা হচ্ছে তার "feudal tie, patriarchal tie"—কিছু values. কিছু মূল্যমান যা সে ছাড়তে পারছে না। সম্পত্তিশালী হচ্ছে। বুর্জোয়া হয়েও নেকেড সেল্ফ্-ইনটারেস্টটাই সব—তা সে মেনে নিতে পারছে না। ভাইদের মুখ দেখে যে অকাতরে পরিশ্রম করে গেল সে ব্যক্তি সেই বন্ধন যে ভুয়া তা স্বীকার করবে কি

করে? এরকম অন্যান্য বন্ধনও। ভাই রমেশ সই করিয়ে নিয়ে গেল। বুর্জোয়া যোগেশ বোঝেনি তা নয়। "রমেশ মাতাল দেখে সই করিয়ে নিয়ে গেল।" প্যাট্রিয়ারক্যাল যোগেশ সই করে দিল। "কেউ আমার সুখ চেয়েছিলে? কেউ আমার সুখ চাচ্ছ? আমি এই যে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছি, বিষয় চিনেছিলে বিষয় নিয়ে থাক—" যোগেশের উক্তির অর্থ কী? জ্ঞানদার অপরাধ কী? নিজের দ্বন্দ্ব, নিজের গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসার অক্ষমতার বিক্ষোভ জ্ঞানদার উপর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ বিক্ষোভের মধ্যে রয়েছে একটা আবিষ্কারের বিক্ষোভ। সে আবিষ্কার হচ্ছে উপরে কমিউনিস্ট ইস্তাহার উদ্ধৃত নগ্ন স্বার্থের বন্ধনের সত্যতা, প্যাট্রিয়ারক্যাল বন্ধন অবাস্তব এই নগ্ন সত্যের আবিষ্কার।

যোগেশ বলছে: "গাড়ী থেকে নেবে দোরে ছেলেকে দেখতেম্, বাড়ীর ভেতর তোমাদের দেখতেম্, বাড়ী আসতেম্, স্বর্গে আসতেম্! আজ সেই বাড়ী আমার নরক। বাড়ী আমার না। জোচ্চুরি করে এ বাড়ীতে রয়েছি। মা আমায় চান না, বিষয় চান; পরিবার আমায় দেখেন না, বিষয় দেখেন। ভাই আমায় দেখেন না, বিষয় বাগিয়ে নেন। বাঃ কি সুখের সংসার।" এতো শুধু একটা ব্যাঙ্ক ফেল নয়। বজ্রপাতের বিদ্যুৎ ঝলসানিতে শুধু জ্বলে পোড়া নয়, একটা কঠিন সত্যের আবিষ্কার। যে মূল্যমান নিয়ে একজন সারাজীবন ছুটে বেড়ালো, শেষে সেই মূলমানই দেখলো ভূয়া।

সঙ্গে সঙ্গে যোগেশের নৈতিক সত্তায় আরও একটা আবিষ্কারের বড় আঘাত। যোগেশ বলছে "আমার মনে স্পর্দ্ধা ছিল, পরিশ্রমের চেষ্টায় সকলেই সিদ্ধ হয়, সে দর্প চূর্ণ হলো। চেষ্টায় ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া রোধ হয় না, দরিদ্র হওয়া রোধ হয় না, ভাই চোর হওয়া রোধ হয় না, বৃদ্ধা মাকে বৃন্দাবনে পাঠান হয় না; চেষ্টায় কোন কার্য্যই হয় না। আমি আজীবন চেষ্টা কল্লেম্, কি ফল পেলেম্?" যোগেশের এই আবিষ্কার অর্থনৈতিক সংকটের সময় ধনতান্ত্রিক বাজারের অনেক ফাটকাবাজও আবিষ্কার করে—যখন ধরা শেয়ারের দাম পড়ে বা বাঁধি-করা পণ্যের দাম পড়ে সর্বস্ব চলে যায়। ১৯২৯-৩০এ বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময় আমেরিকার ওয়াল ষ্ট্রীটের কয়েকতলা বাড়ীর ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে ফাটকা-বাজদের আত্মহত্যা স্মরণ করিয়ে দেয়। অনেক ছোট বোয়াল বড় বোয়ালের শিকার হয়। চেষ্টা করে তা ঠেকানো যায় না, যদি চেষ্টা করে (বাস্তব অবস্থা সেরূপ হলে) সমাজটাকেই না পালটে দেওয়া যায়। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তো তখন এ স্বপ্ন দেখতে পারেন না। যদি নাট্যকারের "রামপ্রসাদ বলে" এরকম ভনিতায়

কিছু বলার সুযোগ থাকতো তাহলে তিনি হয়তো বলতেন, বাবা তারকনাথের পায়ে ধর যেমন তিনি নিজে ধরেছিলেন। সেদিকেও বাধা। কারণ তিনি নৈতিক মূল্যমানের কদয়ের দিক থেকে চরিত্রটিকে যে ভাবে গড়ে তুলেছেন, তাকে আর বাবার পায়ে নত করা সম্ভব নয়। বরং সে মদ খেয়ে চুলোয় যাবে তবু ও পথে নয়। যোগেশের সব কিছু ব্যর্থতার মধ্যেও এই বিশেষ বিষয়ে নেতিবাচক দৃঢ়তা সহানুভূতি আকর্ষণ করে। নাটকের শেষের দিকে গিরিশবাবুর লেখা—জমিদারদের ধ্বংসলীলাকেও জড়িয়ে নিয়েছে। ভজহরি সুরেশকে শোনাচ্ছেন তাঁর নিজেরও পিতামাতা ভাইবোন সমগ্র পরিবার জমিদারদের অত্যাচারে বিধ্বস্ত হয়েছে। ঘর থেকে বিতাড়িত মা ও ভাইয়েরা অন্নাভাবে পথে পথে মরেছে ও বোন অপহৃত হয়েছে। ধনতন্ত্রের ধ্বংসলীলার সঙ্গে জমিদারী প্রথার ধ্বংসলীলাকেও তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন।

আজকের পরিমাপে 'প্রফুল্ল' নাটকে অনেক ত্রুটি আছে। তা সত্ত্বেও এখনও তার জনপ্রিয়তা লুপ্ত হয় নি। উপরে বর্ণিত বাস্তবতার ছাপ আছে বলেই তার এই জনপ্রিয়তা। নাটকের এই চরিত্র মানুষকে আকর্ষণ করতে পেরেছে।

১৯০৫-৬ সালের স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউয়ের সঙ্গে গিরীশচন্দ্রের কলম এক মোড় নিয়েছিল। ইংরাজের বিরুদ্ধে জাতীয় বিরোধিতা তীব্র করতে তিনি সিরাজউদ্দৌলা ও মীরকাশীম লিখলেন যা পরে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

পঁচিশে বৈশাখ

গত বৎসরের ২৫শে বৈশাখ অনুষ্ঠান সম্বন্ধে পৃথক পৃথক দুটি বক্তব্য উদ্ধৃত করে আরম্ভ করছি।

বামপন্থী ধারার লেখক বলেছেন '...তারা রবীন্দ্রনাথের রচনাকে সীমাবদ্ধ করতে চায় জন্মদিনের কার্ডের বাণীর মধ্যে, বিবাহ উৎসবে, গানে, সরকারী অনুষ্ঠানে কিংবা সারাদিনের শোষণ শাসনে ক্লান্ত রাজপুরুষদের ক্লান্তি লাঘব করার জন্য নিশীথে নৃত্যনাট্য পরিবেশনের মধ্যে' (সৌরি ঘটক, নন্দন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩)।

অন্যপক্ষে বলছেন :—'...এ দেশে আজকাল বারোয়ারীর ধুম পড়েছে। উৎসবে ব্যসনে শোকে সন্তাপেও বারোয়ারীর আয়োজন। রবীন্দ্র জন্মতিথি পালনে, ভক্তি নিবেদনে আমাদের আপত্তি নেই। **আপত্তি বারোয়ারী ভক্তিতে**। ...গত কয়েক বছর রবীন্দ্র জন্ম-উৎসব পালনের যে প্রথা প্রবল আকারে দেখা দিয়েছে তার কোথাও একটা অসুস্থ উত্তেজনা আছে এমন সন্দেহ হয়। সহরের পাড়ায় পল্লীতে পল্লীতে ইদানিং অতি সমারোহে বারোয়ারী পূজার মত কবির জন্মতিথি পালিত হচ্ছে।...বারোয়ারী রবীন্দ্র উৎসব পালন করে ভাবি তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন করছি।'—(দেশ, সম্পাদকীয়, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৩। বড় হরফ আমার—লেখক)

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি নিয়েই আমাকে প্রধানতঃ আলোচনা করতে হবে। উদ্ধৃতিতে পরিষ্কার বলে দেওয়া হচ্ছে, 'আপত্তি বারোয়ারী ভক্তিতে'। নচেৎ 'ভক্তি নিবেদনে আমাদের আপত্তি নাই।' অর্থাৎ ঘরের কোণে আলাদা করে হলে, ভক্তির নিদর্শন হিসাবে সুশ্রী পুরুষ রবীন্দ্রনাথের সুন্দর ছবি দিয়ে ড্রইং রুম সাজালে বা দুই একটি উক্তি উৎসব উপহারে ব্যবহার করলে আপত্তি নাই—আপত্তি শুধু অনুষ্ঠানের 'বারোয়ারীত্বে'। পড়লেই মনে হয় অক্ষরে অক্ষরে প্রচ্ছন্ন রয়েছে একটা আতঙ্ক, জনতার সমাবেশের আতঙ্ক। একটা যেন অস্পষ্ট ভয় রয়েছে পাছে শত শত 'বীজের বলাকা' বিশ্বের 'পদধ্বনি' শুনে সচকিতে সচেতন হয়। ('বলাকা')। 'অনুর্বর অভিশাপ' থেকে অহল্যাকে মুক্ত করার ব্যাপারে শুধু শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শের কথা কবির মনে রূপ নেয় নাই—কবির মনে জেগেছিল 'অযুত পান্থের পদধ্বনি অনুক্ষণ ..' যাতে 'জীবন উৎসাহ ছুটিত সহস্র পথে ...সহস্র আকারে।' ('অহল্যা')

মনে হয় নাকি এ আতঙ্ক তাদের যারা 'অনুক্ষণ অযুত পান্থের পদধ্বনি' ভয় করে!

তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে অভ্যস্ত না হলেও, সমস্ত বুঝে সচেতনভাবে না হোলেও সাহিত্যপাঠ, সঙ্গীত শ্রবণ দীর্ঘদিন হতে থাকলে তার সামগ্রিক প্রভাব মানুষকে আচ্ছন্ন করে এবং উদ্দীপিতও করে। তার ভালও আছে, মন্দও আছে। সেটা নির্ভর করে সাহিত্যের প্রকৃতির ওপর। যা বলা হল তা অতি সাধারণ কথা। কিন্তু বারেক আউড়ে নিলে এমন কিছু ক্ষতি নাই।

সং সাহিত্য (যা অবক্ষয়ের সঙ্গী নয়) স্বভাবতই সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার গোচরে হোক, অগোচরে হোক, খাপ খেয়ে যায়, জীবন-সংগ্রামে তার জীবনী-শক্তিকে সজীব, সরস ও সমৃদ্ধ করে, সামনে এগিয়ে যাওয়ায় সাহায্য করে।

রবীন্দ্রনাথের বারোয়ারী পরিবেশনে শোষকশ্রেণীর মুখপাত্রদের যখন এত আপত্তি তখন সহজেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এমন কিছু আছে যার সঙ্গতি আছে আজকের ইতিহাসের প্রগতির ধারার সঙ্গে, অসঙ্গতি আছে অবক্ষয়ের সঙ্গে।

নানারূপ স্ববিরোধীতা ও অসঙ্গতি রবীন্দ্র সাহিত্যে আছে। তা' খুঁজতে 'খেয়ার' কুহেলিকার মধ্যে ডুব দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

তাঁর বিরাট সাহিত্য-সৌধকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখা ও বিচার করা অনেক হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। আমরা, 'যাদের দৈনন্দিন কাজ-কারবার মাঠে-ঘাটে, রাজনীতির কর্মক্ষেত্রে, এ বিচারে আমাদের আগ্রহ থাকলেও সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এ ক্ষেত্রেও আসরের পাশে জনান্তিকে পর্যবেশিত হই—আমাদের অনুস্মৃতিতে ছেদ-বহুলতাও এক এক সময় দীর্ঘকালের বাধ্যতা-মূলক বিচ্ছিন্নতার দরুন।

তা হলেও দু'চারটে বেশ স্থুল রেখা অনেক সময় আমাদের অস্বস্তির কারণ হয়েছে। এ সবের আমি বেশী উল্লেখ না করে সামান্য দু-চার কথায় সারতে চাই। ধরুন, স্বনামধন্য প্রমথ চৌধুরীর 'রায়ত কথা'য় রবীন্দ্রনাথের আলোচনা।

জমিদারী তুলে দেওয়ার প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে বলছেন, জমিদারী "কাকে ছেড়ে দেব? অন্য এক জমিদারকে?·· প্রজাকে ছেড়ে দেব? তখন দেখতে দেখতে এক বড় জমিদারের জায়গায় দশ ছোট জমিদার গজিয়ে উঠবে। রক্ত পিপাসায় বড় জেঁাকের চেয়ে ছিনে জেঁাকের প্রবৃত্তির কোনও পার্থক্য আছে তা বলতে পারিনে। তুমি বলেছ, জমি চাষ করে যে জমি তারই হওয়া উচিত। কেমন করে তা হবে? জমি যদি পণ্যদ্রব্য হয়,—যদি তার হস্তান্তরে বাধা না থাকে? ···জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই, তাহলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ

করে তার কেনার সম্ভাবনা অল্পই, যে লোক চাষ করে না কিন্তু যার আছে টাকা অধিকাংশ বিক্রয়যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই। জমির বিক্রয়ের সংখ্যা কালে কালে ক্রমেই যে বেড়ে যাবে একথাও সত্য। এমনি করে ছোট ছোট জমিগুলি স্থানীয় মহাজনের বড়ো বড়ো বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে। তার ফলে জাঁতার দুই পাথরের মাঝখানে গোটা রায়ত আর বাকি থাকে না। একা জমিদারের আমলে জমিতে রায়তের যেটুকু অধিকার, জমিদার মহাজনের দ্বন্দ্বসমাসে তা' আর টেঁকে না।…"

এ যেন মার্কসের সেই উক্তি যে এক শোষণকারীর কর্মলীলার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শোষণকারীর লীলা শুরু হয় তারই প্রতিধ্বনি: "শিল্পের মালিক কর্তৃক মজুরের শোষণ যখন এতটা পৌছাইয়াছে যে মজুরির টাকাটা তাহাকে দেওয়া চলে, ঠিক সেই মুহূর্তে বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্যান্য অংশ—বাড়ীওয়ালা, দোকানদার, মহাজন প্রভৃতি—মজুরকে ছাঁকিয়া ধরে।"

—(কমিউনিস্ট ইস্তাহার)

কিন্তু মার্কস্ এর থেকে সমাধানে পৌছেছেন: মুক্তির পথ সমাজতন্ত্রেই। রবীন্দ্রনাথ তা গেলেন কৈ ?

তবে কি প্রাচীন বাংলার সমাজে ফিরে যেতে বলছেন যে সমাজ-ব্যবস্থায় কেনাবেচা সরল ছিল না, জমি কেনাবেচা নিরঙ্কুশ ছিল না, জমিদার, রাজা, প্রজা সবারই অধিকার সীমিত ছিল ? "ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল বলিয়াই কোনো ব্যক্তি যে কোনো সর্তে যে কোনো ক্রেতার কাছে ভূমি বিক্রয় করিতে পারিতেন না। কিংবা দানও করিতে পারিতেন না। এই বিক্রয় অথবা দান কর্মের প্রয়োজন হইলে প্রস্তাবিত ক্রেতা ও দানগ্রহীতা রাষ্ট্রের কাছে অর্থাৎ রাষ্ট্রের স্থানীয় অধিকরণের প্রধান প্রধান লোকেদের কাছে আবেদন করিতেন এবং তাঁহারাই বিক্রয় ও দানের ব্যবস্থা করিতেন। বস্তুত কোনো গ্রামে কোনো ক্রেতা বা দানগ্রহীতা ব্যক্তির নবাগমন গ্রামবাসীদের অগোচরে হইতে পারে না, এ ব্যাপারে রাষ্ট্র অপেক্ষা গ্রামের সমষ্টিগত স্বার্থই অধিকতর বিবেচ্য। এই কারণেই সর্বত্র এই দান বিক্রয়ের ব্যাপারে গ্রামবাসীদের গোচরে ও সাক্ষাতে হওয়াই প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইত।'—(বাঙ্গালীর ইতিহাস: নীহার রঞ্জন রায়, পৃষ্ঠা ২৪৯)। মার্কস্ একেই বলেছেন, গ্রাম মণ্ডলীর আধিপত্য (ভারতের সম্বন্ধে মার্কস্ দ্রষ্টব্য)। 'বাংলা দেশে প্রাপ্ত যতগুলি তাম্রশাসন আছে, তাহার প্রায় সবগুলিতেই দেখি রাজারা ভূমিদান করিয়া যে শাসন বাহির করিতেছেন তাহাতে ক্ষেত্রকার কৃষকদের পর্যন্ত যথার্থ সম্মান করিয়া বুঝাইয়া প্রার্থনা করিতেছেন তাঁহাদের

দান যেন প্রজাদের সম্মত হয়। ... রাজা যোগ্যপাত্রকে ভূমিদান করিতে গিয়া বলিতেছেন 'ইহাতে আপনাদেরও মত হউক', মতমস্তু ভবতাম্ ...' (চিন্ময় বঙ্গ : ক্ষিতিমোহন সেন, পৃঃ ১৪০-৪১)। "দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর"-এর রচয়িতা কি তা হলে সেই প্রাচীন বাংলার জমি সম্পর্কে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, যেখানে জমিদার হবে স্বত্বহীন? তা তো নয়। জমিদারের কেনা-বেচার নিরঙ্কুশ অধিকার রোধ করতে তো তিনি চান নি। এমন কি সাধারণ প্রজার কেনাবেচার অধিকারের উপর জমিদারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তার উচ্ছেদেও আপত্তি। ১৯২৮-৩০ ভূমি সংস্কারের পূর্বে—প্রজার গাছ কাটার অধিকার ছিল না, উত্তরাধিকারের নাম পত্তন বা ক্রেতার নাম পত্তন নির্ভর করত জমিদারের মর্জির উপর। এই সব ক্ষমতাকে ব্যবহার করে জমিদার, স্বরূপে আবার তেজারতি কারবার মাধ্যমে মহাজন রূপে, পুরুষানুক্রমে বাংলার চাষীর সর্বনাশ করে এসেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যাকে বাংলার চাষীর 'দাসত্ব' বলেছিলেন, সে শুধু উপরোক্ত অধিকার এবং অন্যান্য অধিকারের অভাবের দরুন। জমিদারের অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী কৃষকের মাথা উন্নত রাখা কত কঠিন!

১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলন ও তারপর কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে মুজফ্ফর আহ্মদ, নজরুল ইসলাম, হেমন্ত সরকার প্রমুখের প্রাথমিক প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের দাবি মুখরিত হয়ে উঠছিল, বাংলার কৃষক বুদ্ধিজীবিদেরও একাংশকে তার সমর্থনে আনতে পেরেছিল। প্রমথ চৌধুরী তাদের পক্ষে উপরোক্ত সামান্য অধিকারের দাবীগুলি উপস্থিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জমি হস্তান্তরের অধিকারের বিরোধিতা করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। এতে তাঁর অমর লেখনীর মহিমা কত ক্ষুণ্ণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে এও স্বীকার করতে হবে সমাজতন্ত্রে সমাধানের পথ তাঁর আয়ত্তের বাইরে গেলেও ধনতন্ত্রে যে চাষীর মুক্তি নাই, এটুকু তিনি ধরতে পেরেছিলেন।

প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ জমির পণ্য হওয়ার কথা তুলেছেন; কিন্তু জমিদারী ও তৎসহ জমি পণ্য হয়েছিল তো দশসালা বন্দোবস্ত এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে। ব্যবসায়ী নীলমণি-রামলোচন-দ্বারকানাথ ঠাকুর জমিদারী 'পণ্য' ক্রয়ে যদি জমিদার হয়ে থাকেন, দেড়শত বৎসর পর সামান্য ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার চাষী পেলে তাতে আপত্তি কেন?

স্থূল দৃষ্টিতে সামান্য একটা নিদর্শন নিয়ে শুরু করতে গিয়ে অনেক দূর চলে গিয়েছি। উদ্দেশ্য এইটুকু যে সব কবি-সাহিত্যিকের মত রবীন্দ্রনাথও মাটির মানুষ এবং শ্রেণীচেতনার গণ্ডী অতিক্রম করতে তাঁকেও বেগ পেতে হয়েছে

এবং তাতে বিফল হওয়ার নিদর্শনও আছে। ঋণাত্মক তো হল, এবার ধনাত্মকে আসা যাক। কারণ, আসলে আমার সেইটাই উদ্দেশ্য। লেখার প্রথমে তার আভাসও দিয়েছি।

কতরূপেই তো সাহিত্য প্রাণবন্ত হোতে পারে। ক্রুপস্‌কায়ার লেনিনের স্মৃতিতে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। জ্যাক লণ্ডনের একখানা বই ক্রুপসকায়া লেনিনকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন। এই কাহিনীতে জীবনের উর্ধ্বমুখ গতি, শীতকালে নেকড়েদের ক্ষুধার তাগিদে মিলিতভাবে আহার সংগ্রহের জন্য যুথ গঠন, সকলে মিলে টিকে থাকার সংগ্রাম, গ্রীষ্মের সময় যৌনক্ষুধার তাগিদে যুথের মধ্যে ভাঙ্গন সত্ত্বেও নেকড়ে জীবের অস্তিত্ব রক্ষা ও প্রসারের তাগিদে পুনঃ পুনঃ যূথসত্তায় প্রত্যাগমন—এই সব দ্বন্দ্বমান প্রাকৃতিক প্রাণশক্তির জীবন্ত ছবি লেখক নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সব চেয়ে বড় প্রকৃতির সমস্ত প্রতিকূল শক্তিকে জয় করে মানুষ টিকে যাচ্ছে। লেনিন এই লেখার প্রশাংসা করলেন।

প্রাণের স্পন্দন, প্রাণের লীলা, জীবনের অফুরন্ত বিকাশ আর আহ্বান রবীন্দ্রনাথকে শৈশব থেকেই আকর্ষণ করেছিল। জীবনের মৌল আবেদন তাঁর প্রাণকে স্পর্শ করেছিল। শৈশবে ভৃত্যরাজের বন্দী শিশু জানলা দিয়ে বাইরের মুক্ত আকাশের আর গাছের পাতায় জীবনের যে অনুভূতি পেয়েছিল, যৌবনের প্রারম্ভে সদর স্ট্রীটের বাড়ী থেকে অদূরে নারকেল গাছের মাথায় প্রভাত সূর্যের কিরণ ঝলকে উঠতে দেখে জীবনের যে দুর্বার গতি কবিচিত্ত উপলব্ধি করেছিল আর 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গে' অঝোরে ঝরে ঝরে পড়েছিল তার অবিচ্ছিন্ন গতি কেউ কোনও দিন স্তব্ধ করতে পারে নি, কোনও দিন কম্পিতও করতে পারে নি। মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষের মহান অগ্রগতিতে অবিচল আস্থা —এই গুণ বিশ্ব সাহিত্যে যাদের শীর্ষে নিয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথ তার অন্যতম।

পরাধীন ভারতের চারিদিকের তমসা ও গ্লানি কখনও তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি, দুর্বল করতে পারে নি। তার চেয়েও বড় আক্রমণ নতুন নতুন চকচকে মোড়কে পুরাতন জীর্ণ ইউরোপের অবক্ষয়ের ধারা আর কলুষের আক্রমণও তাঁকে কখনও দ্বিধাগ্রস্ত করতে পারে নি, আজ যেমন আমেরিকা থেকে আমদানি ঐরূপ পণ্য নানান রূপে নানান ঢং-এ সংস্কৃতির বাজারে চালু করা হচ্ছে। নাগিনীদের বিষাক্ত নিশ্বাসও তাঁর চিনতে বিলম্ব ঘটেনি আর তার প্রতিরোধ ও পরাভব যে অবশ্যম্ভাবী সে বিশ্বাসেও তাঁর ভাঁটা পড়ে নি। তাই দৃঢ় আস্থার সঙ্গে ডাক দিয়েছেন তাদের—'যারা প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।' মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনের আস্বাদই তাঁকে তাঁর নিষ্ঠায় অবিচল রাখতে পেরেছিল।

রবীন্দ্রনাথের, সৃষ্টির বিপুল সম্পদ ও বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্যের মধ্যে এই একটি প্রধান সুরকে স্মরণ করছি আজকের প্রয়োজনের তাগিদে, অন্য দ্যুতিকে ম্লান করার জন্য নয়।

মনে পড়ে কবির অন্যতম প্রিয় কবি ব্রাউনিং-এর আশাবাদের কথা। তাঁর লেখায় শিশুসুলভ সরলতার অনেক ফাঁক আছে, অনুবীক্ষণে যাচাইএ হয়তো সব সময় টেকে না, তবু বলিষ্ঠ আশার ধ্বনি ভাল লাগে: Each sting that bids nor sit nor stand but go.—মরণকে দেখেছেন জীবনের মহান পরিণতি রূপে -The last of life for which the first was made.—আর পৃথিবীটা? যেটা চক্কর মেরে মেরে পাক খেতে খেতে চলেছে, বীর চরিত্র সেখানে কি করে?—grapples with the escaping world—আমরা আছি কিসে?—mid this dance, of plastic circumstance.—যা প্লাসটিক তাকে নমনীয় করতে পারব। আর যদি শক্ত জিনিস আসে? What though about thy rimskull things in order grim? Grow out in graver mood···এই হচ্ছে আশার বাণী।

এর মধ্যে সে মায়া নাই যা মৃত জীর্ণ পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকে, প্রতিক্রিয়ার কাছে আত্মসমর্পিত কবি যেমন ফরাসী বিপ্লবের বাত্যাহত ইংলণ্ডের প্রতিক্রিয়ার প্রতিচ্ছবির দিকে মুগ্ধ নেত্রে বলেছিলেন

And this huge Castle, standing here sublime
I love to see the look with which it braves
Carved in the unfeeling armour of old time
The lightning the fierce wind, and the trampling waves.

—(Wordsworth)

আজ স্টিফেন স্পেণ্ডারের দল তাকিয়ে আছে ধ্বংসোন্মুখ বুর্জোয়া ইংল্যাণ্ডের দিকে। ব্রাউনিং-এর আশাবাদ সেই আশাবাদের সঙ্গেই সঙ্গতি যা শেলীর ভাষায় —'শুষ্ক জীর্ণ পাতা যা নবজন্মের কিংশুকের বারতা বয়ে' নিয়ে আসে।

ফুল মরার জন্য ফোটে কিংবা ফোটার জন্য মরে? আদিকাল থেকে ভাবুক কবির এই দুই দল। শেলীই হন, আর রবীন্দ্রনাথই হন, জীবনের অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিশ্বাসী, মানুষের উদ্যম, মানুষের সাফল্য জয়গান পেয়েছে এদের কাছে নতুন ভবিষ্যতের দিকে মানুষকে হাতছানি দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছে তাঁদের অনুপ্রেরণা।

রবীন্দ্রনাথের কাছে এ আকস্মিকও নয়, সাময়িক ভাবও নয়। জীবনের গোড়াতেই যা প্রকাশ পেয়েছিল:—

"বরষা হইয়া বৃদ্ধ শীতবেশ হয়ে যায়
যযাতির মত পুন বসন্ত যৌবন ফিরে পায়।
এক শুধু পুরাতন, আর সব নূতন নূতন
এক পুরাতন হৃদে উঠিতেছে নূতন স্বপন॥"
—(প্রভাত সঙ্গীত)

"নৈরাশ্য কভু না জানে, বিপত্তি কিছু না মানে
অপূর্ব অমৃত পানে অনন্ত নবীন
···স্নেহ মৃত্যুঞ্জয়ী"।—(সিন্ধু তরঙ্গ)

—জীবনের শেষ পর্যন্ত তা ছিল। শেলীর মতই তিনি বিশ্বাস করতেন 'উড়ে যাক্, দূরে যাক বিবর্ণ জীর্ণ পাতা' কারণ সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখতে পাচ্ছেন "নবাঙ্কুর ইক্ষুক্ষেতে ঝরে বৃষ্টি ধারা'।

ব্রাউনিং-এর আশাবাদের ও জীবনে বিশ্বাসের কথা উপরে উল্লেখ করেছি। একটু প্রয়োজন ছিল বলেই। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ কবির সৃষ্টি স্বভাবতই বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ববাদকে অতিক্রম করে উঠতে পারে নাই। বলিষ্ঠ ব্যক্তি-সত্তার পরিচয় আমরা তাঁর সাহিত্যে পাই। এইখানে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার বিষয়। তাঁর ব্যক্তি বিশ্বশক্তি হতে, সমষ্টি হতে বিচ্ছিন্ন নয়, বিশ্বশক্তি হতে, সমষ্টি হতেই তার শক্তি এবং সমষ্টির মধ্যেই তার শক্তির পরিচয়। কবির সমগ্র সাহিত্যের মধ্যেই এই ভাবধারা ছড়িয়ে আছে।

কবি জীবনের প্রারম্ভে লিখেছিলেন—

স্বর্গ হতে ঝরে ধারা, চন্দ্র হতে ঝরে ধারা
কোটি কোটি তারা হতে ঝরে
জগতের যত হাসি যত গান যত প্রাণ
ভেসে আসে সেই স্রোতভরে···"
—(অনন্তজীবন, প্রভাতসঙ্গীত)

তাঁর অহল্যারই মত তাঁর কবিতা যেন পেয়েছিল "সেই কোটি জীবস্পর্শসুখ"। তিনি মিলে যেতে চেয়েছিলেন 'বসুন্ধরায়'—'হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া, কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া, শিহরিয়া, সচকিয়া, আলোকে পুলকে প্রবাহিয়া, চলে যাই সমস্ত ভূলোকে প্রান্ত হতে প্রান্ত ভাগে উত্তরে দক্ষিণে পূরবে পশ্চিমে, শৈবালে শাদ্বলে তৃণে শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া নিগূঢ় জীবন রসে।" —(বসুন্ধরা)

তাই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন "এই নিঃশব্দের তলে, শূন্যে জলে স্থলে পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।" —(বলাকা)

মৃত্যুর বিভীষিকার জয়গান চলেছে আজ চতুর্দিকে। আমি যদি বেঁচে যাই বা আমার জাতিটা যদি কোনও মতে বেঁচে যায়—এই দুর্বলতাকে এই অবাস্তব স্বাতন্ত্র্যকে বিশ্বপ্রবাহ থেকে নিজের সত্তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার মিথ্যা প্রয়াসকে আজ আদর্শ বলে প্রচার করার চেষ্টা হচ্ছে।

১৯৬৮ সালের প্রথমার্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারী দৈনিক পত্রিকা ইজভেস্তিয়ায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলসনের স্ত্রীর এক কবিতা বড় করে প্রকাশ করা হোল। সে কবিতাটিতে আছে :—

'After the bomb had fallen
After the last sad cry
When the earth was a burnt out cinder
Drifting across the sky.

—'শয়তান এসে বলল, 'Look, this is the work of man.'

ক্রুশ্চেভ বলতো দুটো মেড়ার দ্বন্দ্বে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ আর সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্বে দুটোই ধ্বংস হবে। উপরোক্ত কবিতা তারই কাব্যরূপ, আর তাই ইজভেস্তিয়ার পাতায় তার শীর্ষস্থান। ধ্বংসোন্মুখ সাম্রাজ্যবাদ--শেলীর ভাষায় withered leaves বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা—আর বিকাশমান সমাজতন্ত্র যে একইরূপ মেড়া, এই হল ক্রুশ্চেভের অবদান। সাহিত্যে কবিতায় প্রচারপত্রে, সর্বত্র এই একই কথা। এমনকি সোভিয়েত শিশু সাহিত্যের রূপান্তর দেখলে অবাক হতে হয়। প্রথমে ছিল এই ধরনের : নেকড়ে বাঘ একটি ছাগলছানা নিল, ছাগলছানার মা আর ছানারা মিলে ফাঁদ পেতে নেকড়েকে কুপোকাৎ করলো। এখন হচ্ছে এই ধরনের : দুটি বিড়াল পরস্পরের মধ্যে লড়াই করতে লাগল, শেষে বাকী থাকল কেবল দুইজনের দুইটি লেজ।

দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী উচ্ছিষ্ট ভিখারীদের কাছে এর চেয়ে ভাল উপহার আর কি হতে পারে ? তারা তো তাদের কাজ করেই যাচ্ছে। দুঃখের বিষয়, কিছু কিছু সহৃদয় মানুষও এইসব প্রচারের প্লাবনে বিচলিত হচ্ছেন। ফরাসী বিপ্লবের পর প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের সময় সংস্কৃতিতে তার যা রূপ নিল, তার সম্বন্ধে শেলী একটা কথা বলেছিলেন তাই মনে পড়ে : "Gloom and misanthropy have become the characteristics of the age in which we live, the solace of a disappointment that unconsciously finds

relief only in the wilful exaggeration of its despair"—যারা আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে, নিজেদের কাল্পনিক নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের আশায় প্রতিহত হয়ে যারা ব্যক্তিগত হতাশাকে বিশ্বমানবের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চায় তাদের প্রতিরোধ করার প্রয়োজন হয়েছে। যুদ্ধের রক্তবন্যায় ভীতিকাতর সে যুগের এদের প্রতিনিধিদের কান্না দেখে শেলী বলেছিলেন,—'যুদ্ধ দেখে ফিরে এমন কান্না কেঁদোনা, যাতে চুলো ভিজে কাদা হয় আর বেঁচে থাকা জীবনের খাওয়াদাওয়া ভবিষ্যৎ সৃষ্টি অসম্ভব হয়।' এই ভীরু ছিঁচকাঁদুনের দলের ভণ্ডামীর মুখোশকে আজ খুলে দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে।

অজেয় ভিয়েতনামের মানুষ দেখিয়েছে মার্কিন পরাক্রমকে পর্যুদস্ত করা যায়। ভিয়েতনাম আজ বাংলার মানুষের মুখে ভাষা জুগিয়ে দিয়েছে।

কবি বলেছিলেন, 'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা' তার চেয়ে সঠিক, সর্বহারার সচেতনতা নিয়ে কমিউনিস্ট কবি বলেছিলেন—

"Yea, the voiceless wrath of the wretched, their unlearned discontent,
We must give it voice and wisdom
till the waiting tide is spent." (Morris)

বিপ্লবের জোয়ারের প্রতীক্ষার কালটা তিনি এই ভাবে কাটাতে চেয়েছিলেন। আর তো প্রতীক্ষা নয়। কয়েকযুগ হল বিপ্লব আরম্ভ হয়েছে আর শেষ সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। এখন যারা মৃত্যুর বিভীষিকা সামনে নিয়ে এসে সংগ্রামী ও বিজয়ী জনতার শিবিরে বিভ্রান্তি আনতে চায়, লুকিয়ে চুরিয়ে সংশয়ের অনুপ্রবেশ ঘটাতে চায়, তাদের মুখে ছুঁড়ে মারতে হবে আমাদের জাতীয় জীবনের শাশ্বত ঐতিহ্য—জীবনের জয়গান; স্তব্ধ করতে হবে তাদের ঘৃণ্য কণ্ঠস্বর। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হবে—

'যত বড় হও,
তুমি তো মৃত্যু চেয়ে বড় নও
আমি মৃত্যু চেয়ে বড়।'

কাজেই ব্যক্তিগত উৎসব অনুষ্ঠানেই হোক, আর বারোয়ারী ভাবেই হোক, রবীন্দ্রনাথের মূল সাহিত্য, গান, শিল্প পরিবেশনে কোনওটিতেই আমার আপত্তি নাই। অর্থাৎ যে উদ্ধৃতি দুটি দিয়ে আমি আরম্ভ করেছিলাম উভয়ের বক্তব্যের সঙ্গেই আমি একমত হতে পারছি না। উপরের প্রয়াস আর কিছু নয়, তারই কৈফিয়ত।

বাংলার গ্রাম, সমাজ, সংস্কার : শরৎচন্দ্র

প্রথিতযশা সাহিত্যিক নারায়ণ চৌধুরী বলেছেন "শরৎচন্দ্র নিজে কেঁদেছেন ও পাঠক সাধারণকে কাঁদিয়েছেন।" যদিও এই স্বতঃউত্থিত হৃদয়াবেগের দিকটা এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়, তবু আমার আলোচ্য বিষয়ের জন্য শরৎচন্দ্রের ঐ রকম দরদেভরা একটি উপন্যাস 'অরক্ষণীয়া'র একাংশ উল্লেখ করেই শুরু করবো। "এগারো বৎসর পরে দুর্গামণি হরিপালে বাপের ভিটায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন শরতের সন্ধ্যা এমনি একটা অস্বাস্থ্যকর ঝাপসা ধুঁয়া লইয়া সমস্ত গ্রামখানির উপর হুমড়ি খাইয়া বসিয়াছিল প্রবেশ করিবামাত্র দুর্গামণির বুকের ভিতরটা ছাঁত করিয়া উঠিল। বাড়িতে বাপমা নেই বড়ভাই আছেন। শম্ভু চাটুজ্যের সেদিন ছিল বৈকালিক পালা জ্বরের দিন।⋯ তাহাদের নিজেদের গ্রামটা সহর নয় বটে কিন্তু সেখানে এরূপ গোবর ও পাট পচা গন্ধ চতুর্দিক হইতে আসিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়াকে ব্যাকুল ভারাক্রান্ত করিয়া দেয়না। তখনও অন্ধকার হয় নাই। একটা শৃগাল উঠানের উপর দাঁড়াইতেই বড় ছেলেটা তাড়া করিয়া গেল। দেয়ালের গায়ে একটা শুকনা ডালে হঠাৎ অশ্রুতপূর্ব্ব এক-প্রকার বিশ্রী শব্দ শুনিয়া জ্ঞানদা সভয়ে চুপি চুপি কহিল, ওকি ডাকে মা? মামি শুনিতে পাইয়া কহিলেন, ওযে তক্ষোপ।" সামান্য কয়টি বাক্যে ম্যালেরিয়াজীর্ণ বাংলার একটা ছবি ফুটে উঠলো। আমাদের শৈশব তরুণ বয়সের পল্লী-গ্রামের, বিশেষ করে বর্ধমান হুগলী যশোরের ম্যালেরিয়া বিধ্বস্ত এলাকার গ্রামের, বাস্তব যা অবস্থা ছিল তার একটি ছবি। নিয়ত ম্যালেরিয়া ও দুর্ভোগের শঙ্কায় পীড়িত বাংলার এই ভয়াবহ চিত্র শরৎচন্দ্রের অন্যান্য পুস্তকেও ছড়িয়ে আছে। আরো দু-একটা দৃষ্টান্ত না হয় দেওয়া যাক। "বিকেল বেলায় একটুখানি বেড়াবার পক্ষে নদীর ধারটা মন্দ জায়গা নয় বটে কিন্তু এই সময়টা ম্যালেরিয়ার ভয়ও কম নেই। এ বুঝি আপনাকে কেউ সাবধান করে দেয়নি?" (দত্তা)

"কোন্ দুর্গাপুর? বর্ধমান জেলায়? সুধীর বলিল, হাঁ, বাবার মুখে তাই শুনেছি। কালনার কাছে কোন্ একটি ছোট্ট গ্রাম, এখন নাকি ম্যালেরিয়ায় সে দেশ ধ্বংস হয়ে গেছে।" (বিপ্রদাস)

"বর্ষা শেষ হইয়া আগামী পূজার আনন্দ এবং ম্যালেরিয়াভীতি বাংলার পল্লী-জননীর আকাশে, বাতাসে এবং আলোকে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল, রমেশও

জ্বরে পড়িল। গত বৎসর এই রাক্ষসীর আক্রমণকে সে উপেক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু এ বৎসর আর পারিল না। তিন দিন জ্বরভোগের পর আজ সকালে উঠিয়া খুব খানিকটা কুইনিন্ গিলিয়া লইয়া জানালার বাহিরে পীতাভ রৌদ্রের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, গ্রামের এই সমস্ত অনাবশ্যক ডোবা ও জঙ্গলের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীকে সচেতন করা সম্ভব কি না।" (পল্লী-সমাজ)

দেশের নানান দুঃখ দুর্দ্দশা ও ব্যথা বেদনার মতো এ দুঃখও (অর্থাৎ গ্রামের এই অবস্থাও) একদিন দেশের মহাপ্রাণ মানুষদের ধাবিত করেছিল এর গ্রাস থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধানে এবং শেষে, সব দুঃখের সঙ্গে, সব দুঃখের মতো, এ দুঃখও নিয়ে এসেছিল রাজনীতির পথে।

প্রতিকারের পথ রমেশও ভাবছিল। "এই তিন দিন মাত্র জ্বরভোগ করিয়াই সে স্পষ্ট বুঝিয়াছিল, যা হোক কিছু একটা করিতেই হইবে।···কয়েকদিন পূর্ব্বে এই প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া সে এইটুকু বুঝিয়াছিল, ইহার ভীষণ অপকারিতা সম্বন্ধে গ্রামের লোকেরা যে একেবারেই অজ্ঞ তাহা নহে।" তাহলে প্রতিবন্ধকটা কী? অজ্ঞ তারা নয়—"কিন্তু পরের ডোবা বুজাইয়া এবং জমির জঙ্গল কাটিয়া কেহই ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইয়া বেড়াইতে রাজী নহে। যাহার নিজের ডোবা ও জঙ্গল আছে, সে এই বলিয়া তর্ক করে যে, এ সকল তাহার নিজের কৃত নহে, বাপ-পিতামহের দিন হইতেই আছে। সুতরাং যাহাদের গরজ তাহারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া লইতে পারে, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু নিজে সে এজন্য পয়সা এবং উদ্যম ব্যয় করিতে অপারগ।" (পল্লী-সমাজ)

অর্থাৎ ব্যাপারটি শুধু গ্রামবাসীদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্ন নয়। স্বভাবতই সে ইচ্ছা অনিচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয় স্বার্থের পরিমাপে। খরচের মামলা থাকলেই সামর্থ্যের প্রশ্ন ছাড়াও মানুষ হিসেব করবে। সেই হিসেব যখন সামনে আসছে, বেরিয়ে আসছে একটা দ্বন্দ্ব যা এর মূলে আছে, সামাজিক স্বার্থ বনাম ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যক্তিগত স্বার্থ। লেখক পর্দ্দাটুকু তুলে সেইটুকু দেখিয়ে দিলেন।

মানুষ যেখানেই বাস করে সামাজিক স্বার্থ কিছু থাকেই। এখানে সমস্যাটা সেই সাধারণ ধরনের নয়।

ভারতের বিশেষ অবস্থা

ভারতের ক্ষেত্রে সমস্যাটা আরও একটু গভীরের। প্রাকৃতিক কারণে গ্রামের একটা যৌথ সত্তার প্রয়োজনীয়তা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সেই প্রয়োজনের কারণে

ইংরেজ আসার আগে পর্য্যন্ত হাজার হাজার বছর ধরে গ্রামের ঐ চরিত্র টিঁকে ছিল। ইংরেজের শোষণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং বিদেশী ধনতন্ত্রের ঘা সব মিলে গ্রামের যৌথসত্তা গেল ভেঙ্গে। তার বদলে বিকল্প উন্নততর সামাজিক ব্যবস্থা তৈরী হলোনা। শতাধিক বৎসর পূর্বে মার্কস্ তাঁর অমর লেখনীতে এই বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে না ওঠার বেদনাকে প্রকাশ করেছিলেন। "পুরোনো জগতের অপহৃতি অথচ নতুন কোনো জগতের অপ্রাপ্তির ফলে হিন্দুদের* বর্ত্তমান দুর্দ্দশার ওপর একটা বিশেষ রকমের বিষাদের আবির্ভাব ঘটেছে। বৃটেন শাসিত হিন্দুস্তান তার সমগ্র ঐতিহ্য তার সমগ্র অতীত ইতিহাস থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।" নতুন থেকে বঞ্চিত অথচ অতীতের ইতিহাস থেকে পৃথক বিষাদে ভরা সেই ভারতের ছবি শরৎচন্দ্রের লেখার পাতায় পাতায়।

কিন্তু গ্রামের প্রতি কোনও অন্ধ মোহ নিয়ে শরৎচন্দ্র সেই চিত্র আঁকছেন না। তাঁর লেখায় কোনটা সুবিধা কোনটা অসুবিধা এইটে হিসেব করে গ্রামবাসীরা চণ্ডীমণ্ডপ থেকে উঠে যাচ্ছেন এমন নয়। শরৎচন্দ্রের অনিরুদ্ধ কামাররা[১] শুধু চণ্ডীমণ্ডপ থেকে নয় ইহজগত থেকেই বিদেয় নিচ্ছেন নিজেদের ইচ্ছা অনিচ্ছা নির্বিশেষে একের পর এক ম্যালেরিয়া, কলেরা[২] প্লেগ[৩], প্রভৃতির গ্রাসে। ডাক্তার বেণ্টলি হুগলি বর্দ্ধমানের ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শন কালে নাকি বলেছিলেন বিশ বৎসর পরে এদেশে ম্যালেরিয়া থাকবেনা এবং—পরে আশ্চর্য্যান্বিত জিজ্ঞাসু নেত্রের উত্তরে বলেছিলেন, শেয়ালের তো আর ম্যালেরিয়া হয় না, মানুষ থাকলে তো ম্যালেরিয়া হবে। এই নির্বাণপ্রায় গ্রামের দুর্দশার ছবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন শরৎচন্দ্র।

এই মাত্র একটা সমস্যা ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রকে সূত্র ধরে এগিয়ে দেখলেও—যা বিধ্বস্ত হয়েছে সেই গ্রামের চরিত্র বোঝা যাবে। ম্যালেরিয়ার কারণ মশা ও সেই মশার জন্ম ও বৃদ্ধি বদ্ধ জলা ও জঙ্গলা থেকে। এ সব আবিষ্কারের পূর্ব্বেও নির্দ্দিষ্ট কারণটা মানুষ না জানলেও ঐ বদ্ধ জলা ও জঙ্গলা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর মানুষ তা জানতো। এর প্রতিকার ছিল বাংলা দেশের প্রাচীন সেচ ও জল নিষ্কাসন ব্যবস্থায়। একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন এর প্রবর্ত্তনের

---

* ভারতবাসীর ক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে 'হিন্দু' লেখা চলতেই পারে। কিন্তু এখানে বিশেষ ভাবে আমেরিকান পত্রিকায় লেখা প্রবন্ধ বলে 'হিন্দু' লেখা বাধ্যতামূলক হয়েছে। ইণ্ডিয়ান লিখলে "রেড ইণ্ডিয়ান" বোঝার বা বিভ্রান্তির সুযোগ থাকে।

(১) তারাশঙ্করের গণদেবতা (২) পণ্ডিতমশাই (৩) গৃহদাহ

ইতিহাস তিন হাজার বৎসরের পূর্ব্বে। মার্কস্ তো উত্তর আফ্রিকা থেকে শুরু করে এশিয়া পর্যন্ত এই মহাদেশ জুড়ে যে বিস্তৃত এলাকা তার মধ্যে এই মানুষের তৈরী ও বজায় রাখা সেচ ব্যবস্থা ও তার অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন বাস্তবের এই প্রয়োজনীয়তাই ভারতের গ্রাম্যসমাজের গড়ন যা তা স্থির করে দিয়েছিল। ইংরেজ আমলে এই সেচব্যবস্থা ভেঙ্গে গেল, নদী নালা পুকুর বুজে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো মহামারী কলেরা ও ম্যালেরিয়া। এই অকল্যাণের যোগাযোগ মানুষ বুঝছিল। মশার তত্ত্ব আবিষ্কারের পর সে উপলব্ধি আরও তীক্ষ্ণ হলো। ১৯১৩ সালের দামোদরের বন্যার পর সেচ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ এবং গ্রামের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সম্বন্ধে জনমত সচেতন হয়। বলা বাহুল্য এর মধ্যেও স্বদেশী আমলের দেশহিতৈষণার প্রেরণা কাজ করে। পত্র পত্রিকাদিতে খ্যাত অখ্যাত অনেকেরই লেখা প্রকাশ হতে থাকে। ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস থেকে শুরু করে ইদানিংকালের ডাঃ মেঘনাদ সাহা অনেকেরই নাম এর সঙ্গে জড়িত। সুতরাং তত্ত্বের কথা অবিদিত ছিল না।[৪] কিন্তু শরৎচন্দ্র জল, খাল, সেচ ও ম্যালেরিয়াকে জীবন্ত পরিবেশে উপস্থিত করলেন ও প্রতিকারের পথ কোন্ নির্দিষ্ট সমস্যা ও দ্বন্দ্বের মধ্যে ঠেকেছে তাও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। অন্যান্য মহৎ মানুষের লেখা কাজে দিলেও, তাঁর সাহিত্যের জন্য বলতে হয়, অন্যান্য বিষয়ের মতো দেশে এবিষয়েও আলোড়ন সৃষ্টি করতে সাহায্য করলো।

মার্কসের কথা ও শরৎচন্দ্র

মার্কসের লেখা জানা কথাটা একবার স্মরণ করে নিলে শরৎচন্দ্রের অবদানটা আরও পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে আসবে। সেই জানা কথাটা একবার আউড়ে নিলে ক্ষতি নেই।

"এশিয়ায় স্মরণাতীত কাল থেকে সরকারের সাধারণত তিনটি বিভাগ বর্ত্তমান ছিল : অর্থ বিভাগ অর্থাৎ দেশের ভিতর লুটের বিভাগ, যুদ্ধ অর্থাৎ বাইরের দেশে লুটের বিভাগ এবং শেষে পাবলিক ওয়ার্কস্ ও পূর্ত্তকর্মের বিভাগ। আবহাওয়া বৈশিষ্ট্যের জন্য···খাল ও জলাশয় দিয়ে কৃত্রিম সেচ ছিল প্রাচ্য কৃষির ভিত্তি।··· বিনা অপচয়ে **সমবেতভাবে** জল ব্যবহারের প্রাথমিক যে প্রয়োজন থেকেছে

(৪) তত্ত্বটা প্রসিদ্ধ শিল্পীর ভাষায় "···পাহাড় থেকে পলি নিয়ে প্রবহমান জলকে উপত্যকার গ্রাম ধরে বইয়ে দিতে হবে যাতে জমি উর্ব্বর হয়, আর আবহাওয়াও স্বাস্থ্যকর থাকে।···" — লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯)

প্রাতীচ্যে যেমন, ফ্ল্যাণ্ডার্স ও ইতালির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলি স্বেচ্ছামূলক সমিতিতে আবদ্ধ হতে এগিয়েছিল তার জন্য প্রাচ্যে দরকার হয়েছিল **সরকারের কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ**।...সুতরাং সমস্ত এশিয়ায় **সরকারগুলির ওপরেই এসে বর্তায়** একটি অর্থনৈতিক দায়িত্ব—পূর্তকর্ম সংগঠনের কাজ। এর থেকেও ব্যাখ্যা করা যায় কেমন করে একটিমাত্র বিধ্বংসী যুদ্ধেই শতাব্দীর পর শতাব্দী একটি দেশ জনশূন্য হয়ে পড়ে থাকে, তার সমস্ত সভ্যতা লোপ পায়। ভারতে বৃটিশ তাদের পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে অর্থ ও যুদ্ধের বিভাগটি গ্রহণ করেছিল বটে কিন্তু পূর্তকর্মটি একেবারে অবহেলা করেছে।" অর্থাৎ রাজস্ব মাধ্যমে ও যুদ্ধের দ্বারা লুট—এই দুটো লুট বজায় রেখেছে, কিন্তু যেটি উৎপাদন ও আর্থিক এবং সামাজিক জীবনের প্রাণ সেই পূর্তকর্মটিই অবহেলা করেছে। মার্কসের উক্ত লেখার পর পরবর্তীকালে রেল ও পথ তৈরীর সময় বৃটিশ সরকার যথাযথভাবে জল প্রবাহের দিকে নজর রেখে পুল, কালভার্ট ইত্যাদি সরবরাহ করল না। সুতরাং শেষে যা দাঁড়ালো শুধু অবহেলা নয় প্রত্যক্ষভাবে জলের প্রবাহের পথ রুদ্ধ করে অবহেলার ক্ষতিতে আরও কয়েকগুণ ক্ষতি সাধন যোগ করল।

এরপর মার্কস্ যা বলেছেন আলোচ্য ক্ষেত্রে বিশেষ করে নিদর্শিত। "সেই জন্যই কৃষির এ অবনতি, **অবাধ প্রতিযোগিতার বৃটিশ নীতি** লেসে ফেয়ার লেসে অ্যালার (কার্যকলাপের স্বাধীনতা দাও)—**এই নীতিতে এই কৃষি পরিচালিত হতে পারে না।**" সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটা কোনও রকমের পরিচালনা একটা নিয়ন্ত্রণ কৃষির জন্য প্রয়োজন। ফলে গ্রাম্য-জীবনেরও তা অপরিহার্য্য অংশ। এই প্রয়োজনীয়তার আরও বেশী খাপসই নিদর্শন ঐ 'পল্লী সমাজেই' আছে। "অকস্মাৎ প্রায় কুড়িজন কৃষক আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল—ছোটবাবু, এ-যাত্রা রক্ষে করুন, আপনি না বাঁচালে ছেলে-পুলের হাত ধরে আমাদের পথে ভিক্ষে করতে হবে।· একশ' বিঘের মাঠ ডুবে গেল, জল বার করে না দিলে সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে যাবে বাবু, গাঁয়ে একটা ঘরও খেতে পাবে না। কথাটা গোপাল সরকার···রমেশকে বুঝাইয়া দিল।···দক্ষিণ ধারের বাঁধটা ঘোষাল ও মুখুজ্যেদের। এই দিক দিয়া জল-নিকাশ করা যায় বটে, কিন্তু বাঁধের গায়ে একটা জলার মত আছে। বৎসরে দু'শ' টাকার মাছ বিক্রি হয় বলিয়া জমিদার বেণীবাবু তাহা কড়া পাহারায় আটকাইয়া রাখিয়াছেন। চাষীরা আজ সকাল হইতে তাঁহার কাছে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিয়া এইমাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া এখানে আসিয়াছে।···রমেশ কহিল, জলার বাঁধ আটকে রাখলে

এই প্রবন্ধে সমস্ত মোটা লেখা আমার—লেখক।

ত আর চলবে না, এখ'নি সেটা কাটিয়ে দিতে হবে। বেণী বলিলেন, কোন্ বাঁধটা ? রমেশ কহিল, জলার বাঁধ আর কটা আছে বড়দা ? না কাটলে সমস্ত গাঁয়ের ধান হেজে যাবে। জল বার করে দেবার হুকুম দিন। বেণী কহিলেন, সেই সঙ্গে দু-তিনশ' টাকার মাছ বেরিয়ে যাবে খবরটা রেখেচ কি ? এ টাকাটা দেবে কে ? চাষারা, না তুমি ?" যে যা ইচ্ছা করবে, মাছের গরজে বয়ে যাওয়া জল আটকে ফসল ডোবাবে, এতে চাষ হয় না। পুনরাবৃত্তি করে মার্কসের ভাষায় বলতে হয় "কার্য্যকলাপের স্বাধীনতা—লেসে ফেয়ার লেসে অ্যালার—এই নীতিতে এই কৃষি, অর্থাৎ ভারতের কৃষি পরিচালিত হতে পারে না।"

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরে এবং তার পরেও যে সব সেচের পুকুরের মামলা হয়েছে তার বিবরণ এক নজর দেখলেই মার্কসের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বক্তব্যের মিল এবং মার্কসের বক্তব্যে প্রদত্ত ব্যাখ্যা পরিষ্কার হয়ে যাবে। পুরোনো সেটেল্‌মেন্টের ম্যাপ চোখের সামনে রেখে গ্রাম ও মাঠের জমির দিকে চোখ বুলোলে একখণ্ড জমির সঙ্গে আর একখণ্ড জমির যে নাড়ির সম্পর্ক, বিভিন্ন প্রকারের ভূখণ্ড, পুকুর জলা, ক্যানেল, নামো জমি, ডাঙ্গা জমি, শুকনো জমি পরস্পরের সঙ্গে যে সম্বন্ধ দেখা যাবে বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবহারে অনেক জায়গাতেই তাদের এই পারস্পরিক সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গতি নেই।

জমিদারের বিলি ব্যবস্থায় সেদিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজনও থাকেনি, অবসরও হয়নি। সেচের পুকুরটি একজনের, পাশের জমি আর একজনের। 'লেসে ফেয়ারের' অবাধ কেনা বেচার ফলেও ভিন্ন ভিন্ন হাতে ছড়িয়ে গেছে। সেচের পুকুরের স্বত্বাধিকার মাছ চাষ করে সেচ বন্ধ করে। বাধে ঝগড়া। এ বলে সেচ হলে আমার মাছ যাবে, ও বলে সেচ না হলে ফসল যাবে। এমন কি অবহেলায় বুজে যাওয়া জল প্রবাহের ছোটখাটো নদী নালা খালও জমিদাররা চাষের জন্য বন্দোবস্ত করে দিয়ে দিল। পুরোনো ইডেন ক্যানেল এলাকায় এই সব বুজে যাওয়া খালে আবার ক্যানেলের জল ছাড়া হতো পাশের জমি আবাদের জন্য। ক্যানেলের জল যথাসময়ে না পেলে ঐ পাশের জমির চাষীরা তাগিদের জন্য আসতেন কৃষক সমিতির অফিসে। জল বইলে ছুটে আসতেন উপরে উল্লিখিত নামো জমির চাষীরা জল রোখার জন্য যাতে ফসল নষ্ট না হয়। আমাদের অবস্থা হতো দাঁড়াই কোথা। অর্থাৎ জমিদারী প্রথার যথেচ্ছচারিতার অধিকার এবং সে অধিকারের প্রয়োগ প্রতি গ্রামেই নানান চরিত্রের সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। এর ফলে চাষীর দুরবস্থা ইত্যাদির বর্ণনা হয়তো অনেক জায়গায় পাওয়া যাবে কিন্তু শরৎচন্দ্রের বই-এর পাতায় যা ফুটে উঠেছে তা দুষ্প্রাপ্য। তা

হচ্ছে ঐ যথেচ্ছচারিতার চরিত্র এবং এর ফলে সমাজের স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তি স্বার্থের প্রচণ্ড বিরোধ। বলা বাহুল্য গ্রামের জেঁাকেরা—জমিদার, জোতদার, মহাজনরা সুযোগ মতো এই বিরোধকে কাজে লাগাতে ছাড়ে না। (৫)

পুরোনো যে গ্রাম সমাজ ভেঙ্গেছে তার সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের কোনও মমতা নেই, মোহ নেই। ছাড়া ছাড়া ভাবে কোথাও কোথাও আমার এই উক্তির বিরোধী নজির পাওয়া যাবেনা এমন বলতে পারিনা। কিন্তু তাঁর লেখার সামগ্রিক চরিত্রের এ এক মহৎ বৈশিষ্ট্য। বাঙ্গালীর অন্তঃপুরের কথা অবশ্য আলাদা। সেখানে তিনি যৌথ পরিবারেরই উপাসক (৬)

বিস্তৃত বিবরণের প্রয়োজন এখানে হয় না। পল্লীসমাজ, অরক্ষণীয়া, বামুনের মেয়ে এই ধরনের বিশেষ কষাঘাতের পুস্তক তো আছেই। তাছাড়া গ্রামের সাধারণ মানুষকে নিয়ে লেখা অন্যান্য পুস্তকেও তিনি এর পরিচয় রেখে গেছেন।

---

(৫) একটি জিনিযে চমৎকৃত হতে হয়। আমরা যা ব্যবহারিক জীবনে বুঝছি, শরৎচন্দ্র যে বঞ্চনার ব্যাখ্যা তাঁর অমর লেখনীতে তুলে ধরেছেন, আজকের ইঞ্জিনিয়ার, বিশেষজ্ঞরাও কার্যরূপে যা উপলব্ধি করছেন—মার্কস্‌ শতাধিক বৎসর পূর্বে বৃটিশ মিউজিয়মের লাইব্রেরীতে বসে আমাদের দেশের গ্রামের সেই চরিত্র ধরেছিলেন, ভাল ভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি মার্কস্‌বাদের অপূর্ব ব্যাখ্যান ক্ষমতার নজির রেখে গেছেন। প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার স্যার উইলিয়াম উইলকক্স লিখেছেন, জলকে ক্ষেত্র হতে ক্ষেত্রান্তরে প্রবাহিত করা, প্রতিবেশীর সেচ বা জল নিষ্কাসনে সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী থাকার বাধ্যবাধকতা আমাদের দেশের চাষের এক চরিত্র। কারণ নিজের স্বার্থকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। নিজেরটা করতে গেলেই ব্যবস্থাটাই এমন হতে হবে যাতে প্রতিবেশী সকলের তা হয়। তাঁর ভাষায় "Your inherited love of co-operation did not descend on you from the clouds It came with the muddy waters of the overflow canals."

(৬) "অবশ্য বৃটিশেরা হিন্দুস্তানের উপর যা দুর্দ্দশা চাপিয়েছে তা হিন্দুস্তানের আগের সমস্ত দুর্দ্দশার চাইতে মূলগতভাবে পৃথক এবং অনেক বেশী তীব্র" দৃঢ়ভাবে একথা ঘোষণা করলেও মার্কস্‌ অতীতে হিন্দুস্তানের স্বর্ণযুগ থাকার কথা কল্পনা করেন নি। "যাঁরা স্বর্ণযুগে বিশ্বাস করেন এঁদের সঙ্গে আমি একমত নই" এই বলে মার্কস্‌ ব্যাখ্যা করেছেন। ইতিহাসের তথ্য এমনকি পৌরাণিক বিবরণানুযায়ী ভারতবাসীদের নিজেদের যা ধ্যান ধারণা তাও সেইরূপ কোনও স্বর্ণযুগ কল্পনা করার বিরুদ্ধে।

টুকরো টুকরো মন্তব্য যা এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে তাও পুরাতন জীর্ণসমাজের বুকে কম আঘাত নয়। টগর বোষ্টমীর প্রসিদ্ধ উক্তি জাত রাখা সংস্কারের বুকে প্রচণ্ড আঘাত। আমাদের দেশ তো বিলেত ইউরোপ নয়—পুরাতন সব কিছু ধুয়ে মুছে গিয়ে শুধু সোজাসুজি ধনতন্ত্রের সরল শ্রেণী সম্পর্কে দাঁড়িয়ে গেছে এমন নয়। সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় সামন্ততন্ত্র এমনভাবেই জাঁকিয়ে রাখা ছিল সব কিছুতে তার জটিলতা পাক খেয়ে খেয়ে জড়িয়ে আছে। তাছাড়া আমাদের ঐতিহ্যের বোঝাটাও কম নয়। যেদেশে সমাজ-বিচারে রাজাকেও তার প্রিয় স্ত্রীকে ত্যাগ করতে হয় এবং সেটাই হয় আদর্শের মহিমা, তপোবনে গান্ধর্ব্য বিবাহ করে স্ত্রীকে প্রাসাদে আনা যায় না, সে দেশের সমাজ-প্রাধান্য কি এত সহজে যাবে? যারা ধর্মান্তর গ্রহণ করে মুক্তি চেয়েছে তারাও কি এই প্রাধান্যকে অস্বীকার করতে পেরেছে? গলার দড়াটা একটু হয়তো লম্বা হয়েছে—এই পর্যন্ত তা নাহলে খুঁটির বাঁধন তাদেরও খোলেনি। সুতরাং শরৎচন্দ্রের এই কষাঘাত শুধু তাঁর ঘনিষ্ট পরিচিত হিন্দুসমাজেরই উপকার করেছে তা নয়, পরোক্ষভাবে সকল সম্প্রদায়ের সমগ্র ভারতীয় সমাজেরই উপকার করেছে। তাঁর উপন্যাস ও গল্পের জনপ্রিয়তার গণ্ডী নেই। তবু মেয়েদের মধ্যে জনপ্রিয়তার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এবং থাকা স্বাভাবিক। উল্লিখিত পরোক্ষ প্রভাবের এবং উপকারের নজির পাওয়া যাবে সম্প্রদায়ের গণ্ডী ডিঙিয়ে মুসলমান মেয়েদের মধ্যে এই জনপ্রিয়তার পরিমাণ ও ব্যাপ্তিতে। পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও বর্ণাশ্রম শাসিত সমাজ ভেঙ্গে খাপ খাইয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশের পক্ষে পদক্ষেপ অর্থাৎ সংস্কৃতির উপর কাঠামোতে তার অনুকূল অগ্রগতি তা সীমিত হলেও সম্বর্দ্ধিত হওয়া স্বাভাবিক।

শরৎচন্দ্র নিজে যা বলে গেছেন তাই উদ্ধৃত করে এই প্রসঙ্গ শেষ করবো। 'পল্লী সমাজে' তিনি কি বলতে চেয়েছিলেন—"এই পাড়া গাঁয়ের সমাজ। যাকে সহর থেকে মনে করছি—সেখানে পদ্ম ফুটছে, মানুষ ভাইয়ে ভাইয়ে প্রেমে গলাগলি করছে, জ্যোৎস্না ছড়িয়ে যাচ্ছে—সেখানেও শালুক ফুটছে, বিলাতী কচুরিতে সব ছেয়ে গেছে, দলাদলির তো অন্ত নাই।" (১) তাঁর এই বক্তব্যই আলোচনা করলাম।

(১) প্রেসিডেন্সী কলেজে সাহিত্য সভার অধিবেশনে অভিভাষণ—আগস্ট, ১৯২৩

গ্রাম সম্বন্ধে অন্যান্য লেখক ও শরৎচন্দ্র

গ্রাম সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর এই বৈশিষ্ট্য আরও পরিষ্কার হয় গ্রাম সম্বন্ধে অন্যান্য লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে। পুরোনোকালে গ্রামে আত্মীয়তা ছিল, কুটুম্বিতা ছিল, ছোট বড় মিলন ছিল, বড়লোক গরীবের মুখ চেয়ে দেখতো এই সব কথা শোনা যায়। আজকে তা নেই। এই হা হুতাশ্বি বাংলা সাহিত্যের অনেক জায়গাতেই ছড়িয়ে আছে। শরৎচন্দ্রের লেখাতেও এরকম কিছু কিছু নেই তা নয়। কিন্তু স্বর খুব অস্পষ্ট। অন্ততঃ বর্তমানটা তার লেখায় এমনই ছাপিয়ে উঠেছে যে তার গুরুত্ব কিছু থাকেনি। স্বদেশী আন্দোলন-এর ঢেউ-এর সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী সবকিছুর আবেদন যেমন মন নাড়া দিতে থাকে তেমনই স্বদেশী গ্রামটাও নিগৃহীত মানুষের মনে হাতছানি দিতে থাকে। তাঁত কুটির শিল্প আর সেই গ্রাম—প্রচার যতো চলতে থাকে খ্যাত অখ্যাত সাহিত্যিক-দের লেখাতেও তা স্থান পেতে থাকে। এর নির্ভেজাল একটি রূপ অক্ষয় মৈত্রের সিরাজউদ্দৌলার একটি পরিচ্ছেদে আছে। অতীতের সেই সুখের জগৎকে তাতে তুলে ধরা হয়েছে। গিরীশচন্দ্র এবং অন্যান্যদেরও লেখাতে পড়েছি। সব স্মরণ থাকছে না। সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেষণ, এবং ধনতন্ত্রের চাবুকের জ্বালায় এঁরা অতীতের মধুর স্মৃতির দিকে তাকিয়েছেন। কিন্তু অতীতের মোহের সঙ্গে তখনকার প্রকৃত অবস্থা তাঁরা চিন্তা করেননি। গ্রামের স্বৈরাচার, আচারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ, একদিকে দারিদ্র্য অন্যদিকে কুলমর্য্যাদার বোঝা, সবের উপর নবাব রাজা রাজড়া আমীর ওমরাহ ও থাকে থাকে সামন্ত প্রভুদের আধিপত্য ও যথেচ্ছাচার এসব তাঁরা ভুলে যান। "ভক্তি গাঢ় হইয়া একবার মস্তকে প্রবেশ করিলে লোকের বুদ্ধিখানি উচ্চতর সমালোচনায় কিরূপ অপারগ হয় তাহা আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাইতেছি" (মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)। পুরাতন গ্রামের প্রতি ভক্তি এই একই কাজ করে। পুরাতন স্থাণু সমাজ ভেঙে ধনতন্ত্রের বিকাশে দুটো শ্রেণী-বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতে—বিভক্ত হচ্ছে, এর মধ্যে ভবিষ্যতের শুভ পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি আছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ধ্বংসের জন্য ততো নয়, দেশীয় ধনতন্ত্র সম্ভব হলে সে-ধ্বংস দেশীয় ধনতন্ত্রের দ্বারাও হতে পারতো; অভিযোগ সাম্রাজ্যবাদ উপরিউক্ত বিকাশের বাধা আর সামন্ততন্ত্র ও পশ্চাৎপদতাকে জিইয়ে রাখার সহায়ক।

তবে ইউরোপে যারা সমাজতন্ত্রের ভয়ে মধ্যযুগের দিকে চলতে চান (যেন তা সম্ভব) এবং এখানে অন্ততঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে যাঁরা এরূপ করতেন, তাঁদের চিন্তাধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে। স্বাধীন ভারতে নতুন সমাজ পত্তনের

চিন্তার আগে আসতো মুক্তির চিন্তা। যেহেতু দেশ ইংরেজদের অধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবনতির এক শোচনীয় অবস্থার সূচনা হয়েছিল। সরল ও স্বাভাবিক ভাবেও অনেক মানুষের অতীতের দিকে দৃষ্টি যাওয়া স্বাভাবিক, যতই অবাস্তব হোক। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লব ব্যতীত অন্য কোনও বিপ্লবের (অর্থাৎ সর্বহারার বিপ্লবের) নজীর তখনও ঘটেনি। তাছাড়া যাঁরা ভক্তির বদলে বুদ্ধিবৃত্তিকে যথেষ্ট সুযোগ দিলেন তাঁদের কাছে মার্কসের চিন্তাধারা প্রাপ্যও ছিল না, প্রাপ্তও হয়নি। সুতরাং তাঁদের বিচ্যুতি লক্ষণীয় কিছু নয়। তাছাড়া তাঁদের অগ্রগতির স্বপ্ন ছিল কলকারখানা যন্ত্রশিল্প যা মধ্যযুগীয় গ্রামচরিত্রের বিনাশক। ১৯১৬ সালের কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে ব্যারিস্টার দাস সাহেবও (চিত্তরঞ্জন দাস) তাঁর রাজনীতি বর্জিত সভাপতির ভাষণে পুরানো গ্রাম সমাজে ফিরে যাওয়ার ডাক দিলেন। শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে পরিবর্তনের ভয় কিরূপ এতেই বোঝা যায়। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৫ সালে প্রকাশিত 'পল্লী সমাজ' চমৎকৃত করে।

কিন্তু যেক্ষেত্রে বৃটিশ অধীনতার কালেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এবং সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের পর ভবিষ্যতে যে-গ্রাম আমরা গড়তে পারি তার স্বপ্নের বদলে অতীত ও বর্তমানের পশ্চাদপদ গ্রামের প্রতি মোহ সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে সহজে ছেড়ে দেওয়া যায় না। অন্ততঃ অবহেলা করা যায় না।

তারাশঙ্করের দৃষ্টান্তই ধরুন। তাঁর 'গণদেবতা' হচ্ছে গ্রাম ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য বিলাপ এবং তার প্রতি মোহ সৃষ্টিতে ভরা। কিন্তু গ্রাম ভাঙলো কে? শরৎ-চন্দ্র আগে দেখাচ্ছেন কোন্ পরিস্থিতি সেটা ভাঙ্গলো, ফসলের সঙ্গে মাছের চাষের দ্বন্দ্ব, চাষীর সঙ্গে মাছ চাষের স্বত্বাধিকারী জমিদারের দ্বন্দ্বকে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে নিয়ে এসেছেন। অভিযোগ খাড়া করছেন, জমিদার বেণী ঘোষালের বিরুদ্ধে, যারা তাদের ফসল বাঁচাবার জন্য রমেশের কাছে ছুটে এসেছে সেই চাষীদের বিরুদ্ধে নয়। আর তারাশঙ্কর? "শুধু হিরুই কেন? গ্রামের কেহই কাহাকেও মানে না……" (চণ্ডীমণ্ডপ) "(হিরু আর অনিরুদ্ধ কামার)—ঐ দুজনেই গ্রামখানার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়াছে, গিরিশ ছুতোর, তারা নাপিতও আছে" (চণ্ডীমণ্ডপ) জমিদারের দায়িত্ব হয়ত ছিঁটে ফোঁটা কোথাও আছে যেমন দেবু ঘোষের বাবার জমি হারানোর পরোক্ষ দায়িত্ব, কিন্তু সহজে নজরে পড়ে না, ইংরাজীতে যাকে বলে "কনস্পিকুয়াস বাই অ্যাবসেন্স"। মোট কথা, তারাশঙ্করের মতে সাধারণ গ্রামবাসীরই প্রধান দায়িত্ব। পরে অন্য ক্ষেত্রেও তাই দেখবো। অবশ্য মহাজন ও হাল পয়সার কল্পনার বাবুদের কথা আছে। পরিস্থিতির বিচারে

তিনি হেতুটা কী দেখেন? কী কারণে গ্রামটা ভাঙলো বা যারা ভাঙলো তাদের সেই ভাঙার প্রবণতা হলো?

"সমাজ-সমাজ করছ, সমাজ কই? নাই। দেবু বুঝিয়াছে সমাজ নাই। সেকালে যেসব মানুষ এই সমাজ গড়িয়াছিল, এই সমাজ শাসন করিত সে ধরনের মানুষই আর নাই।" বাস্তব কোন অবস্থার গতিকে এ অবস্থা হলো তার কথা তো নাইই,·· তার অস্তিত্বও অস্বীকৃত। দেবুর মাধ্যমে তারাশঙ্করের পুরোনো গ্রামের প্রতি গ্রাম সমাজের প্রতি মোহের বিবরণ শোনা যাক:

"···চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া পাঠশালায় পড়াইতে পড়াইতে দেবু ঘোষ চণ্ডীমণ্ডপের কথা ভাবে। এই চণ্ডীমণ্ডপটি একদিন ছিল গ্রামের হৃৎপিণ্ড, জীবনীশক্তির কেন্দ্র-স্থল পূজা অর্চনার আনন্দ উৎসব অন্নপ্রাশন বিবাহ শ্রাদ্ধ সব অনুষ্ঠিত হইত এইখানে। অন্যায় অবিচার উৎপীড়ন বিশৃঙ্খলা ব্যভিচার পাপ গ্রামে দেখা দিলে চণ্ডীমণ্ডপেই বসিত পঞ্চায়েত. এই আসরে বসিয়া বিচার চলিত শাসন করিয়া সে-সমস্ত দৃঢ় করা হইত। গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত এই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে ডাক দিলে সে-ডাক উপেক্ষা করার কাহারও সামর্থ্য ছিল না।"

এই যে বিচারের কথা তারাশঙ্কর এত ভক্তি ও দরদের সঙ্গে বলেছেন, সে বিচার কিরকম? যেমন ধরুন— ধরতে আপত্তি কি?— প্রফুল্ল পোড়ামুখীর মাযেব ক্ষেত্রে হযেছিল। "সর্বস্ব ব্যয় করিয়াও বিধবা স্ত্রীলোক কুলীন করিতে পারিল না। বরযাত্রীদিগকে উত্তম ফলাহার করিয়েছিল কন্যাযাত্রীদিগকে কেবল চিঁড়া দই। ইহাতে প্রতিবেশী কন্যাযাত্রীরা অপমান বোধ করিলেন" (দেবী চৌধুরাণী, বঙ্কিমচন্দ্র) শাস্তি হিসাবে গ্রামের মোড়লরা কিভাবে প্রফুল্লর মায়েব চরিত্রের মিথ্যা দোষারোপ করে সর্বনাশ করে এবং প্রফুল্ল পরিত্যক্ত হয় তার বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন।

—কিংবা এই ধরনের বিচারের নিদর্শক "ক্ষান্ত মাসি গোবিন্দকে দেখিয়াই কহিল, ঐ উনি মুখুজ্যে বাড়ির গাছ প্রতিষ্ঠাব সময় জরিমানা বলে ইস্কুলের নামে দশ টাকা আদায় করেন নি? গাঁয়ের ষোল আনা শেতলা পূজার জন্য দুজোড়া পাঁঠা ধরে নেন নি? তবে? কতবার ঐ এক কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চান শুনি? (গোবিন্দ গাঙ্গুলী) ···গম্ভীর গলায় কহিলেন···তোমার মেয়ের প্রায়শ্চিত্তও হয়েছে, সামাজিক জরিমানাও আমরা করেছি সব জানি। কিন্তু তাতে যজ্ঞিতে কাঠি দিতে তো আমরা হুকুম দিইনি। মরলে ওকে পোড়াতে আমরা কাঁধ দিব কিন্তু—। ক্ষান্তমণি চীৎকার করিয়া উঠিল।···বলিল, হাঁ গোবিন্দ নিজের গায়ে হাত দিয়ে

কি কথা কওনা ? তোমার ছোটভাজ যে ঐ ভঁাড়ার ঘরে বসে পান সাজছে সে তো আর বছর মাস দেড়েক ধরে কাশীবাস করে অমন হলদে রোগা শলতেটির মতো হয়ে এসেছিল শুনি ?" (পল্লী সমাজ শরৎচন্দ্র)। "যা জানি, তাতে তুমি কাশী ছেড়ে পালাতে পথ পাবেনা যাতে সমস্ত দেশের লোক শুনবে তুমি জাতি-চ্যুত ব্রাহ্মণ"—(চন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র)।

শরৎচন্দ্রের লেখা থেকে সমাজের এই ধরনের দণ্ডদান বা দণ্ডদানের ভিত্তিতে মানুষকে নিপীড়িত করার ভুরি ভুরি নিদর্শন দেওয়া যায়। তারাশঙ্করের এই সমাজ, এর বিচার, ও দণ্ডদান সম্বন্ধে শ্লাঘার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কষাঘাত তুলনা করলেই শরৎচন্দ্রের অবদান স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জমিজমার ব্যাপারটা দেখা যাক। "...এই পথ ধরিয়া গ্রামের গরু বাছুর নদীর ধারে চরিতে যায়। ধান খাইবে বলিয়া তখন তাহাদের মুখে একটি করিয়া দড়ির জাল বাঁধিয়া দেওয়া হয়। প্রৌঢ় চৌধুরী একটু হতাশার হাসি হাসিলেন—গরুগুলির মুখের জাল খুলিবার মতো গোচরও রহিল না। মাঠের ওপারে নদীর চর ভাঙ্গিয়া রবি ফসলের চাষের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। চাষীদের অবশ্য আর উপায় ছিল না। অমরকুণ্ডার মাঠের অর্দ্ধেকের উপর জমি কঙ্কনার বিভিন্ন ভদ্রলোকের অধীন চলিয়া গিয়াছে। অনেকের চাষের জমি আর একেবারেই নাই। তাহারাই প্রথমে নদীর ধারে গোচর ভাঙ্গিয়া রবি ফসলের চাষ আরম্ভ করিয়াছিল। এখন দেখাদেখি সবাই আরম্ভ করিয়াছে..." (গণদেবতা)।

গোচর হচ্ছে গ্রামের সাধারণ ও বারোয়ারী জমি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে এই স্বত্ব জমিদার ব্যক্তিগত স্বত্বে রূপান্তরিত করে নেয়। শেষ পর্যন্ত হিসেব করলে এই গোচর শুধু দুধ, ঘি, ছানার উৎস নয়, এর থেকে গরীবের চাষের হেলে বলদেরও আংশিক খোরাক হয়। দুধ ঘি-এর কারণে একসময় গ্রামের ভাল ও বিস্তৃত গোচর থাকলে পশুপালনের দ্বারা গরীব চাষীর চাষ ছাড়া অধিকন্তু আংশিক অন্য উপায়েরও রাস্তা ছিল। কিন্তু এগুলিও চাষের জমিতে রূপান্তরিত হলো।

তারাশঙ্কর পরিষ্কার না ভেঙ্গে পরোক্ষভাবে বলছেন, চাষীরাই দায়ী। 'তাদের উপায় ছিল না' বলায় দু'কাজই হচ্ছে। তারাই দায়ী একথাও জানানো হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কৈফিয়তও দেওয়া হচ্ছে। "অমরকুণ্ডার মাঠে অর্দ্ধেকেরও বেশী জমি কঙ্কনার বাবুদের হাতে চলে গিয়েছে।" অর্থাৎ তাদের অর্থাৎ ঐ চাষীদেরই জমি বাবুদের কাছে চলে গেছে। এই

বাবুরা কয়লায় পয়সা করে "জমি কিনিতেছেন মোটা দামে।" "জমির দামও ডবল হইয়া গিয়াছে।" চাষীরা "দর পাইয়া হতভাগা মূর্খের দল জমিগুলো কঙ্কনার বাবুদের হাতে দিয়া পেট ভরিয়া ছিল।" তারাশঙ্করে যা ত্রুটি তা একনজরেই ধরা পড়ে। জমিদারের কথা একদম নেই। অথচ জমি বন্দোবস্ত দিবার অধিকারও তাঁরই এবং তিনি বা তাঁরাই উল্লিখিত গোচর বন্দোবস্ত দিয়েছেন। রূপান্তর করার অধিকারও তাঁদের। (গোচরে সে অধিকার জমিদারের আছে কিনা বিতর্কের বিষয় হতে পারে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নয়।) জমিদার স্বীকৃতি না দিলে প্রজার রূপান্তরেও অধিকার ছিল না। চাসের জমি, পুকুর, বসতবাটী প্রভৃতির স্বত্ব রূপান্তরের অধিকার ছিল একমাত্র জমিদারের এবং চাসের জমিতে বা বসতবাটীতে পুকুর করতে গেলে জমিদারকে সেলামী না দিয়ে তা করা যেতো না। এও লক্ষ্য করার বিষয় চাষীরা যে নানারূপ দুর্বিপাকে পড়ে পেটের দায়ে জমি বেচতে বাধ্য হয়েছে, এই কথাটাই উহ্য। বরং অভিযোগ করা হচ্ছে "যাহার আয় পাঁচ টাকা—সে দশ টাকা খরচ করিয়া বাবু সাজিয়া বসিয়াছে, ঋণের দায়ে জমি বিকাইয়া খাইতেছে।" (তুলনা: দেনা পাওনা'য় মন্দিরের জমি চুরির চেষ্টা জমিদার কর্তৃক।)

শ্যামল বনবীথি

তারাশঙ্করের গ্রামের মোহনমূর্তি এক। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই মূর্তি আর এক। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা 'শ্যাম বহ্নিশিখা' তিনি এঁকে চলেছেন। অথচ বাস্তব অবস্থায় শরৎচন্দ্রের হরিপালের সেই গ্রাম এ দুই-এর মধ্যে তফাৎ নেই। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পথের পাঁচালী" "অপরাজিত" যে অঞ্চল নিয়ে লিখিত সেও ম্যালেরিয়াজীর্ণ বাংলারই একাংশ। উপরে প্রারম্ভে উদ্ধৃত শরৎচন্দ্রের বর্ণিত গ্রাম হরিপাল যে বিস্তৃত এলাকায় তার সম্বন্ধে ডক্টর ফ্রেঞ্চের রিপোর্ট হচ্ছে ১৮৬২ থেকে ১৮৭২ এর মধ্যে জনসংখ্যা তিন ভাগের এক ভাগ কমে গিয়েছিল। শুধু হুগলী জেলার সীমিত এলাকা সম্বন্ধে লেঃ কর্নেল ক্যাম্পবেলের ধারণা বিশ বৎসরে অর্দ্ধেক জনসংখ্যা কমে গিয়েছিল। আমরা দেখছি শরৎচন্দ্রের লেখনীতে সেই বাস্তব অবস্থার ছবিই ফুটে উঠেছে। বিভূতিবাবুর বর্ণিত এলাকার চরিত্র এর পৃথক নয়। বরং আরও বেশী। কারণ, এর ধ্বংস শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতেই। (সপ্তদশ শতাব্দীতে বার্ণিয়ার মধ্য-বাংলার এই অঞ্চলের সমৃদ্ধি সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গিয়েছিলেন।) তারপর

রেল লাইনের সঙ্গে এল ম্যালেরিয়া। ১৮৬০ সালে রেল লাইন তৈরী হয়। এর আগে "কলকাতা থেকে চাকদা পর্য্যন্ত কোনও ম্যালেরিয়া ছিল না।" লোকে আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য বেড়াতে যেতো। স্বাভাবিক জল নিষ্কাসন রুদ্ধ হওয়ার ফলে ১৮৬১ সালেই ম্যালেরিয়া মহামারী এসে পড়ে।*

পথের পাঁচালীর ঘটনাবলীর মধ্যে সেট্‌ল্‌মেণ্টের কথা আছে। যশোরে সেট্‌ল্‌মেণ্ট হয়েছিল ১৯২০—২৪ সালে। সেই সেট্‌ল্‌মেণ্ট রিপোর্টেই ম্যালেরিয়ায় জনসংখ্যার নিম্নগতির বিভীষিকা তুলে ধরা হয়েছে। সেনসাসের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯১১ থেকে ১৯২১ এই দশ বৎসরে সমগ্র যশোরে জনসংখ্যা কমেছিল ৫৬ হাজার ৩৮৬। এর মধ্যে শুধু বনগ্রাম মহকুমায় কমেছিল ২৭ হাজার ৯৩৩। সেট্‌ল্‌মেণ্ট রিপোর্টে বলা হচ্ছে—সেট্‌ল্‌মেণ্ট কর্মচারীরা গ্রামাঞ্চলে কাজে ঘোরার সময় যা দেখেছিলেন তাতে মনে হয় প্রকৃত কমার হার হবে আরও অনেক বেশী। তাঁরা চতুর্দিকে কেবল উচ্ছিন্ন জনশূন্য পড়া পাতিত ঘর ও গ্রাম দেখতেন।** জনসংখ্যার নিম্নগতির কারণ যে ম্যালেরিয়া তাও উক্ত পুস্তকে লেখা হয়েছে।

সেট্‌ল্‌মেণ্ট রিপোর্টে আরও আছে এই জনসংখ্যাপড়তির কারণে জমি অনাবাদী থাকছে। জমিদাররা পড়া পতিত জমি কম সেলামীতে বন্দোবস্ত দিচ্ছেন অর্থাৎ যশোরে বিশেষ করে বনগাঁয়ে জমির দাম কমার কারণও সেই ম্যালেরিয়া মহামারী এবং তার ফলে ব্যাপক প্রাণহানি এবং চাষ করার লোকের অভাব। ঠিক এই চেহারা কি নিম্ন উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায়? "বারো তেরো বছর আগে কাপালীরা উঠে এসে নদীতীরে এই অনাবাদী পতিত জমি সস্তায় বন্দোবস্ত করে নিয়ে গ্রামখানা বানিয়েছে।" (অশনি সঙ্কেত)। ইহাই কি যথেষ্ট? কি কারণে জমি সস্তায় প্রাপ্য হলো ম্যালেরিয়া জীর্ণ গ্রামের সে ছবিটা এলনা কেন?

এ-ও এক গ্রাম ভেঙ্গে পড়ার চেহারা। অথচ বিভূতিবাবুর পুস্তকে পথের পাঁচালীতে দুর্গার মৃত্যু ও আর এক ক্ষেত্রে একটি সামান্য উল্লেখ ছাড়া ম্যালেরিয়ার বিশেষ কোনও ইঙ্গিত নেই। (বলা বাহুল্য, এটি পুস্তকটির শুধুমাত্র একটি বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে সমালোচনা।)

---

* ২১শে ডিসেম্বর, ১৯০৭ এর ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকা। উইলকক্সের পুস্তকে উদ্ধৃত। পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭।

** যশোহর জেলার সেট্‌ল্‌মেণ্ট রিপোর্ট—১৯২০-২৪—এম এ. মোমিন, সেট্‌ল্‌মেণ্ট অফিসার।

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন তিনি গ্রামে দেখলেন পদ্মফুলের বদলে শালুকফুল আর কচুরিপানা। বিভূতিবাবু সেই কচুরিপানাকেই মাথায় তুলে সব দুঃখ ভুলতে চাইলেন আর তাঁর পাঠকদেরও ভুলতে বললেন।

জমিদারী প্রথা ও শরৎচন্দ্র

গ্রাম জীবনের প্রধান অভিশাপ ছিল জমিদারী প্রথা। জোতদারীরূপে আর এক ধরনের জমিদারী এখনও বিরাজ করছে। এই জোতদারের সৃষ্টির অন্যতম কারণ হচ্ছে জমিদারী প্রথা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের অভিমত সুপরিচিত।

গ্রামের জীবন সম্বন্ধে যেমন এ বিষয়েও তেমনই। শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য-এক একটি এমন ঘটনা বা উক্তিকে উপস্থিত করেন যে ঐ ঘটনা বা উক্তিতেই তার চরিত্র নগ্ন করে খুলে প্রকাশ করে দেওয়া হয়। উপরে উদ্ধৃত 'পল্লী সমাজে' বর্ণিত নিজের মাছের কারণে বেণী ঘোষাল কর্তৃক বাঁধ কাটতে না দিয়ে চাষীদের ফসল ডোবানোর ঘটনায় রমেশের বাদ প্রতিবাদের উত্তরে, রমেশ যখন বলছেন, "এরা সারাবছর খাবে কী? বেণী: (হাসিয়া মাথা নাড়িয়া থুথু ফেলিয়া অবশেষে স্থির হইয়া) খাবে কি? দেখবে ব্যাটারা যে যার জমি বন্ধক রেখে আমাদের কাছেই টাকা ধার নিতে ছুটে আসবে। ভায়া মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করে চল। কর্তারা এমনি করেই বাড়িয়ে গুছিয়ে এই-যে এক আধ টুকরো উচ্ছিষ্ট ফেলে রেখে গেছেন, এই আমাদের নেড়েচেড়ে, গুছিয়ে গাছিয়ে, খেয়ে দেয়ে আবার ছেলেদের জন্য রেখে যেতে হবে। ওরা খাবে কী? ধার কর্জ্জ করে খাবে। নইলে ব্যাটাদের ছোটলোক বলেচে কেন?" (পল্লী সমাজের নাট্যরূপ রমা)। জমিদারী, জোতদারী কিভাবে স্ফীত হয়েছে একটি ঘটনাতেই তা বিবৃত হয়ে গেল।

কৃষক আন্দোলনে যাঁরাই থেকেছেন বরাবরই এই ধরনের চরিত্রকে দেখে আসছেন এবং এখনও দেখছেন। জমিদার জোতদাররা এই কারণে উন্নয়নের কাজেও কিরকম বাধা হয়েছে তাও আমরা আমাদের জীবনে দেখেছি। বন্যা প্রতিরোধে বাঁধ আন্দোলনে আমরা দেখেছি এদের বিরোধিতা; অথচ সাধারণ ধারণায় মনে হবে যাদের জমি বেশী তারাই তো উপকৃত হবে। কিন্তু তারা দেখে দুর্দ্দশার বৎসরে তাদের ফসল কিছু নষ্ট হলেও জমি ঢুকবে ঘরে। একুনে তাদের লাভ। এইভাবে উন্নয়নের কাজেও বাধা হয়েছে জমিদারী প্রথা।

'অভাগীর স্বর্গে' প্রজার গাছ কাটার অধিকারের অভাব এবং এই বঞ্চনার

ব্যথাকে লেখক তীক্ষ্নভাবে তুলে ধরেছেন। মাত্র ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইনে প্রজার এই বাধা দূর হয় এবং প্রজার জমিতে উৎপন্ন বৃক্ষে প্রজার অধিকার স্বীকৃত হয়। বাংলার 'শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণী' জমিদাররা নিজেদের শোষণস্বার্থ সম্বন্ধে কতো নীচ হতে পারেন এতেই বোঝা যায় যে জমিদাররা এমনকি কংগ্রেসের জমিদাররাও একযোগে গরীব প্রজার উঠানের একটা গাছ তার উপর অধিকার তাও ছাড়তে রাজী ছিল না এবং দীর্ঘকাল ধরে বিরোধিতা করেছে। ১৯২৮ সালে জনমতের তীব্রতায় তাদের অভিসন্ধি ব্যর্থ হয়।

কিন্তু তাই বলে একথা মনে করা সঠিক হবে না যে শরৎচন্দ্র বিনা খেশারতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের দাবি সমর্থন করতেন। ঐ শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তিদের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ পথের দাবীতে তিনি ছত্রে ছত্রে প্রকাশ করে গেছেন। ডাক্তার বলছেন "কারও (চাষীদের) ভাল করতে হবে আর কারও গায়ে কালি চড়াতে হবে তার মানে নেই অপূর্ব্ববাবু। এদের দুঃখের মূলে শিক্ষিত ভদ্রজাতি নয়"। এই অংশ লেখা ১৯২৬ সালে যখন কিনা কৃষক আন্দোলন ও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের দাবী সজোরেই উচ্চারিত হতে শুরু হয়েছে। শরৎচন্দ্রের আক্রমণের লক্ষ্য কারা তাও তিনি প্রচ্ছন্ন রাখেননি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বিপ্লবের সময়ে সেখানে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হয়। এর কথা বাদ দিলে ১৯২০ দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল একমাত্র "পরদেশ" যেখানে জমিদারী উচ্ছেদ হয়েছে। এই বিপ্লবোত্তর আলোড়ন এবং কমিউনিস্ট পার্টি, ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজেন্টস পার্টি, মুজফ্‌ফর আহমদ, নজরুল ইসলাম, হেমন্ত সরকার, অতুল গুপ্ত প্রমুখের আন্দোলনের প্রভাবেই প্রজাসত্বের দাবী জোরদার হয়ে ওঠে। ডাক্তার বলছেন "পরদেশের সকল যুক্তিই কি নিজ দেশে খাটে ভেবেছ ?" জমিদারদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকে তিনি বলছেন "অন্তর্বিদ্রোহ।" কারণ জমিদার এবং বেকার শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তি সবাই এক সম্প্রদায়। একই কারণে শ্রমিকশ্রেণীকে তুলনামূলক ভাবে দেখছেন 'তুচ্ছ'। "মঞ্চের পরে আসীন ছিল চেহারা দেখিয়া মনে হয় তাহারা সামান্য এবং তুচ্ছ ব্যক্তি। হয়ত কারিগর কিংবা এমন কিছু হইবে। অপূর্ব্ব নূতন হইলেও শিক্ষিত এবং বিশিষ্ট সভ্য।" শ্রমিকশ্রেণীর অর্থাৎ ঐ তুচ্ছ'দের দলে যারা নাম লিখিয়েছে কেমন করে আনন্দের সঙ্গে তারা ইহা গ্রহণ করবে ? তারপর ডাক্তারের মুখ দিয়ে কৃষকের অপবাদ "আইডিয়ার জন্য প্রাণ দিতে পারার মতো প্রাণ, শান্তিপ্রিয় নির্ব্বিরোধী কৃষকের কাছে আশা করা বৃথা।" অথচ এই কৃষকই ইংরেজ আমলের গোড়া থেকে ইংরেজের সঙ্গে লড়ে আসছিল এবং শেষ

পর্যন্ত লড়েছে। শিক্ষিত ভদ্রলোক যত জন প্রাণ দিয়েছে তার চেয়ে অনেকবেশী কৃষক প্রাণ দিয়েছেন। বিস্তৃত মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এই পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৬ সালের ১৫ই মের আগে। তার মাস দুই আগে অধ্যাপক জে. এল. ব্যানার্জির প্রজাস্বত্বের আইনের দাবীতে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে সেই প্রসিদ্ধ প্রস্তাব গৃহীত হয়। যার পরিণতি ১৯২৮ সালের আইন। সমগ্র পরিচ্ছেদটা কি সেই সময়কার জমিদারদের প্রচারের ছাপ বহন করে? *

ব্যক্তিগত অধিকার সমাজ ও সংস্কার

গ্রাম সমাজের নিপীড়নের বিরুদ্ধে ন্যায্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে শরৎচন্দ্র তুলে ধরেছেন। অথচ অন্তঃপুরের বেষ্টনীর মধ্যে, মানুষে মানুষের সম্পর্ক ও ভালবাসার সম্পর্ক এসব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে শরৎচন্দ্র সঙ্কুচিত করে নিচ্ছেন। আশা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা এবং বিক্ষোভের তুফান তুলছেন, কিন্তু শেষে সব কিছুকে নিস্তরঙ্গ করে নিয়ে ধীরে ধীরে প্রথা নির্দেশিত জীবনের মরুভূমিতে শুখিয়ে নিচ্ছেন। এই অসঙ্গতি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত নজরে পড়ে।

ওঠা, বলা, খাওয়া দৈনন্দিন আচার পালনের নিষ্ঠাচারের খুঁটিনাটিকে এমন করেই লেখক সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠকের কাছে পরিবেশন করেছেন যাতে নিষ্ঠাচারের প্রতি তাঁর নিজের একান্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় এবং পাঠকদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। পাঠক মাত্রেই এ সম্বন্ধে অবহিত। শরৎচন্দ্রের পুস্তকের উদ্ধৃতি তুলে এই বিষয়ে নিদর্শন দিতে গেলে তা নিজেই একটা পুস্তক হয়ে দাঁড়াবে। ব্যাপারটি যদি এতেই সীমিত হতো তাহলে কথা ছিল না। কিন্তু নিষ্ঠাচারের সঙ্গে আন্তরিকতা আত্মত্যাগ ও মহত্ত্ব এমনভাবে জুড়ে দিয়েছেন যেন ঐ নিষ্ঠাচারের গুণটিরই এরা অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সমাজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে শেষ পর্যন্ত পথটা কি? আল্‌সে পর্য্যন্ত নিয়ে এসে মুক্ত জগতের চেহারা দেখিয়ে শেষে যেমন ছিল তেমনই সমাজের কয়েদখানায় বন্দী, শরৎচন্দ্রের লেখায় শেষগতি আর এই সীমাকে অতিক্রম করছে না। রমেশ বলিল "আমি দলাদলির কোন বিচারই করব না, সমস্ত ব্রাহ্মণ শূদ্রই নিমন্ত্রণ করে আসব।...জ্যেঠাইমা বললেন, সমাজ যাকে শাস্তি দিয়ে আলাদা করে রেখেছে, তাকে জবরদস্তি ডেকে আনা যায় না। সমাজ যাই হোক তাকে মান্য করতেই হবে। নইলে তার ভাল করবার মন্দ করবার কোন শক্তিই

*যুগান্তর নেতা শ্রীহেম ঘোষ যা দাবী করেছেন তাতে মনে হয় শরৎচন্দ্রের এই ধরনের অভিমত গঠন করানোতে তাঁর নিজের এবং ঐ ধরনের 'দেশভক্ত'দের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। স্বরাজ দল ১৯২৮ সালে প্রজাস্বত্বের বিরোধী ছিল।

থাকে না—এরকম হলে ত কোনমতে চলতে পারে না রমেশ।" (পল্লী-সমাজ) এই এক সুর শরৎচন্দ্রের লেখায় সর্বত্র।

অবশ্য মূল লক্ষ্য সামনে রেখে অনেক সময় কমপ্রোমাইজ করে আগুটা কাটিয়ে দিতে হয়। আজকে হয়তো এতো প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ধরুন, ৩০।৪০ বৎসর আগে গ্রামে নতুন এলাকায় আমরা গেলে প্রথমেই আচারের কেল্লাকে আঘাত দিতে উদ্যত হতাম না। কিন্তু সর্বদাই এটা নজরে থাকতো এবং সমাজের পশ্চাৎপদতা নির্দিষ্টভাবেই আক্রমণের একটা লক্ষ্য থাকতো। এঙ্গেল্‌স্ বলেছিলেন, সমাজজীবনে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার কারণেই প্রাচ্য প্রাতীচ্যের দ্বারা বিজিত হয়েছে। "দি ঈষ্ট ফেল্ টু দি ওয়েষ্ট বিকজ অব সিগ্রিগেশান অব ম্যান ফ্রম ম্যান"। এই সিগ্রিগেশান এই বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমটা কি? এঙ্গেল্‌স্ বলেছিলেন রিচুয়াল্‌স্ অর্থাৎ আচার। সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই তাঁদের সে নৈতিক কর্তব্য পালন করেছেন, আচারের দেওয়ালকে উপযোগী আচরণ ও ব্যবহারে ধ্বসিয়েছেন; হিন্দুর অন্তঃপুরের গণ্ডী আর মুসলমানের অন্তঃপুরের অবরোধ দুই ভাঙ্গতে সমর্থ হয়েছিলেন যখন আধুনিকতার আবহাওয়া এতটা এগোয়নি। অবশ্য বাস্তব জগতে অনুকূল পরিবর্তন বহু পূর্ব থেকেই হয়ে আসছিল। যন্ত্রশিল্প যানবাহনের উন্নতি (রেল বাস প্রভৃতি) মানুষের বিচ্ছিন্নতাকে বাধ্যতামূলকভাবে সরিয়ে দিয়েছিল এবং দিচ্ছিল। ফলে জনগণের মানসিকতাও প্রস্তুত হচ্ছিল। রামমোহনের সময় লক্ষ্যণীয়ভাবে অগ্রগতি হতে পারেনি। তার পরের কালে দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় সুরাপান শিক্ষিতদের মধ্যে ছড়িয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ বলেছেন জাতবিচার এড়াতে তাঁরা এটা ধরেছিলেন; রূপজীবিনীর ওখানে আড্ডার সম্বন্ধেও ঐ ধরনের কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। অর্থাৎ সামাজিক অগ্রগতির পদক্ষেপে এক নোংরা বিকৃতির আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কিন্তু তখন রেললাইন কারখানা এসব হয়নি এবং যোগাযোগ ও আদান প্রদানে চিন্তার যে প্রসার তাও হয়নি; শ্রমিকশ্রেণী যে এই সামাজিক-অগ্রগতির নেতা তার বৃদ্ধি ও স্ফীতি হয় নি। কিন্তু শরৎচন্দ্র যখন লিখছেন তখন অনুকূল বাস্তব অবস্থা শুধু সৃষ্টি হয় নি অনেকদূর এগিয়ে গেছে এবং কাঠামোতে একাংশে (সমকালের বুর্জোয়া কাঠামোতে) যতটা অগ্রগতি সম্ভব সংগঠিতভাবে ব্রাহ্মদের মধ্যে এবং অসংগঠিতভাবে হলেও হিন্দু সমাজেরও এক গুরুত্বপূর্ণ অংশে দৈনন্দিন জীবনে তা আয়ত্ত হয়ে গেছে। গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যন্ত্রশিল্প ও কারখানা অঞ্চলে বিভিন্ন জাতি ও মানুষ সমবেত হলে কেমন করে আচারের দেওয়াল স্বতঃই আপনা হতে ভেঙ্গে যায় শরৎচন্দ্র

নিজেই তার পরিচয় দিয়েছেন (ব্রহ্মদেশে কারখানা অঞ্চলের বিবরণ দ্রষ্টব্য)। তা ছাড়া বাংলাদেশে আচারবিরোধী ঐতিহ্য তো আজকের নয়। বৈষ্ণবধর্মের অন্ততঃ একশাখা ওঠা বসা চলা ফেরা এমন কি খাওয়া পরার আচারের দেওয়ালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল। তা ছাড়া ধর্মীয় চিন্তাধারায় প্রবুদ্ধ "কর্তাভজা" প্রভৃতি সম্প্রদায় ছিলেন যাঁরা এসব আচারের বন্ধন মানতেন না (অক্ষয় কুমার দত্তের "ভারতের উপাসক সম্প্রদায়")। এইসব ঐতিহ্য ও অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে শরৎচন্দ্রের উপরোক্ত প্রবণতা এমন কি তাঁর শক্তিশালী লেখনীর সর্বশক্তি নিয়োগ করে রক্ষণশীলতাকে তুলে ধরা শুধু আড়ষ্টতা নয় পশ্চাদপদতা ছাড়া অন্য কিছু মনে হওয়ার অবকাশ নেই। (গোঁড়া হিন্দুরা কতকগুলি বিষয়ে রুষ্ট হলেও এই রক্ষণশীলতার জন্য তাঁদের মধ্যেও শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা বিঘ্নিত হয় নি)। জাতিভেদের পক্ষে শরৎচন্দ্রের ওকালতি (দৃষ্টান্ত স্বরূপ সমগ্র ১২শ পরিচ্ছেদ, পল্লীসমাজ) সর্বাপেক্ষা পীড়াদায়ক। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের চিন্তাধারার পশ্চাদপদতা কতদূর পর্য্যন্ত যেতে পারে তার একটা নমুনা, "বিজয়া বলিল আপনি শিক্ষিত হয়ে জাতিভেদকে মানেন কি করে? নরেন হাসিতে লাগিল। কহিল, ডাক্তারের বুদ্ধিটা সাধারণতঃ একটু ঘোলাটে ধরনের হয়। বিশেষ করে, আমার মতো যারা মাইক্রোস্‌কপের মধ্য দিয়ে জীবাণুর মতো তুচ্ছ জিনিস নিয়েই কাল কাটায়।" (দত্তা)। অর্থাৎ মাইক্রোসকপের ব্যবহারে ইউরোপ ফেরৎ ডাক্তারের নাকি এই জ্ঞান অনিবার্য্য যে রক্তের ডাক্তারী শাস্ত্রে যে গ্রুপিং আছে যার নির্দেশে আজ ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া হয়তো শূদ্রের রক্তে নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের জীবন বাঁচছে সেই গ্রুপিং অস্বীকার করে অন্ততঃ হিন্দুর ক্ষেত্রে আলাদা করে বর্ণাশ্রমের নির্দেশ মেনে গ্রুপিং করতে হবে। সাধে কি দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায় বিচ্ছিন্নতা প্রচারকরা বলার সুযোগ পায় তাদের বিরুদ্ধে অন্যদের যা কিছু বলার থাকুক অন্ততঃ ভারতবাসীর বলার কিছু নেই।

এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তাঁর ব্রাহ্মসমাজ এই আধুনিক আচার বিরোধী হিন্দুদের প্রতি বিরূপতা (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 'নববিধান', 'বিপ্রদাস' প্রভৃতি)। বিদ্রোহে মঙ্গল নেই, যেমন রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে মঙ্গল নেই, বলক্ষয় করা হয়, একটা ভালর জন্য সব লণ্ডভণ্ড বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়—একথা ব্যাখ্যা করার পর তিনি ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ খাড়া করলেন যে তারা বিদ্রোহী। সংস্কার মানেই প্রতিষ্ঠিতের সহিত বিরোধ; এবং অন্যায় সংস্কারের চেষ্টায় চরম বিরোধ বা বিদ্রোহ। ব্রাহ্মসমাজ একথা বিস্মৃত হইয়া অত্যল্পকালের মধ্যেই সংস্কার, রীতি নীতি আচার বিচার সম্বন্ধে নিজেদের এতটাই স্বতন্ত্র এবং উন্নত করিয়া ফেলিলেন

যে, হিন্দু সমাজ হঠাৎ তীব্র ক্রোধ ভুলিয়া হাসিয়া ফেলিল এবং নিজেদের অবসরকালে ইহাদের লইয়া এখানে ওখানে বেশ একটু আমোদ করিতেও লাগিল।" ('সমাজধর্মের মূল্য' ১৯১৬)।* এই কারণেই বোধহয় দুই বৎসরের মধ্যে তিনিও 'দত্তা' লিখিয়া 'রাসবিহারী'কে লইয়া মস্করা করিতে ছাড়িলেন না। (প্রসঙ্গতঃ তাঁর তামাশাটা রাসবিহারীর সঙ্গে নয়, ব্রাহ্মধর্মকে নিয়েও নয়। তামাশাটা বিদ্রোহকে নিয়ে।) তাঁর দৃঢ় মত ঘোষণা করেছেন : সমাজ যদি তাহার শাস্ত্র বা অন্যায় দেশাচারে কাহাকেও ক্লেশ দিতেই বাধ্য হয় ("বাধ্য হয়" কথাটা লক্ষণীয়—লেখক), তাহার সংশোধন না করা পর্যন্ত এই অন্যায়ের পদতলে নিজের ন্যায্য দাবি বা স্বার্থ বলি দেওয়ায় যে কোন পৌরুষ নেই, তাহাতে যে কোন মঙ্গল হয় না, এমন কথা জোর করে বলা যায় না।" অর্থাৎ গোঁড়ামির মধ্যেও বীরত্ব আছে আত্মদান আছে। (যেমন সতীদাহে?)

তিনি বলতে চান যাঁরা গোঁড়ামি করে আত্মনিগ্রহ করছেন তাঁরাও কম বীর নয়। মুস্কিল হচ্ছে গোঁড়ামির পরিপূরক দিকটা তিনি লক্ষ্য করছেন না। এরই একটা দিক হচ্ছে হরিজনদের ঘর যাতে পোড়ে বা প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের জীবন্ত অবস্থায় দাহ করা হয়। এটা হচ্ছে পশ্চিমভারত বা দক্ষিণভারতে লক্ষিত চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু সাধারণভাবে যা ঘটে তাও কম নয়। যেখানে সামন্তবাদের প্রাবল্য বেশী এবং তার অনুকূলে বর্ণভেদের কড়াকড়ি, সেখানে খোলাবাজারের শ্রমশক্তির মূল্যকেও দমিত করে ক্ষেতমজুরের মজুরির হার কম করে দিতে সাহায্য করে। যা প্রগতিশীল আদর্শ তার জন্য যত ব্যাপক ও যত তীব্রভাবে মানুষকে আলোড়ন করে প্রগতির দিকে নিয়ে আসে আত্মদানে উদ্বুদ্ধ করে, প্রতিক্রিয়া তা করে না। তা ছাড়া শুধু বীরত্ব ও ত্যাগ দিয়ে সত্যাসত্য এবং জয় পরাজয় নির্ধারিত হয় না। ভিয়েৎনামের যুদ্ধে আমেরিকানদেরও প্রাণ দিতে হয়েছে। অত্যাচারী শত্রুকে এবং তাদের সাথী অনুচর নিজ দেশের প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীকে পরাজিত করে তাদের মধ্যে বহু সৈন্যকে নিহত করে তবেই ভিয়েৎনামের স্বাধীনতাকামী মানুষ জয়ী হয়েছেন। আমেরিকানদের

* লক্ষ্য করার বিষয়, শরৎচন্দ্রের বক্তব্য ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে নয় প্রধানতঃ তাদের আচার বিরোধিতার বিরুদ্ধে। ধর্ম ও সমাজকে তিনি আলাদা দেখতেন "সমাজের বিরুদ্ধে যাওয়া আর ধর্মের বিরুদ্ধে যাওয়া যে একবস্তু নয়—কথাটাই লোকে ভুলিয়া যায়।" (২৮. ৩. ২৫ তারিখে শ্রীহরিদাস শাস্ত্রীকে লেখা পত্র)। "আচার জিনিসটা বুদ্ধি দিয়ে প্রবর্তিত হয় নি তাই যুক্তি দিয়েও এর পরিবর্তন হয় না।" (অপ্রকাশিত রচনাবলী)

'আত্মত্যাগ' (!) সিদ্ধান্ত করল না। প্রগতিশীলতাই সিদ্ধান্ত করল। প্রগতিশীলতার আদর্শই ভিয়েৎনামের অগণিত মানুষের আত্মত্যাগ ও আত্মদান আকর্ষণ করতে পারল। আর আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শ সারা বিশ্বে তো বটেই এমনকি তার নিজ দেশেও প্রবল যুদ্ধ বিরোধী জনমতের সম্মুখীন হলো। প্রগতি ক্রমোত্তর শক্তি যোগায়। প্রতিক্রিয়া বিচ্ছিন্নতায় পর্যবসিত হয়ে দুর্বল হয়।

হার্বার্ট স্পেনসার ও শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্র একাধিকবার বিভিন্ন রচনায় হার্বার্ট স্পেনসারের নাম করেছেন। তাঁর লেখায় এই দার্শনিক বা তত্ত্ববিদের ছাপ বেশ আছে এটা বোঝা যায়। সেটা এর জন্য নাও হতে পারে যে তিনি তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সেটা হয়তো এর জন্যও হতে পারে যে এতেই তাঁর দ্বিধাচিত্ততা এবং রক্ষণশীলতার সমর্থন পেয়েছিলেন।

হার্বার্ট স্পেনসারের তত্ত্ব দুচারটে কথায় চুকিয়ে দেওয়া মুস্কিল। কারণ ঐ তত্ত্ব অনেক জিনিসের সংমিশ্রণ। একদিকে ডিটারমিনিস্ট অন্যদিকে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও শিল্পবিপ্লবের পক্ষপাতী। যা হবার হতেই হবে এই হলো তাঁর ডিটারমিনিজম্। ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে তিনি এই বলে সমর্থন করেছেন যে দেশকালের বিচারে হবার ছিল বলে হয়েছে এবং এর বৃদ্ধি ও প্রসার পূর্বনির্ধারিত। যাঁরা রক্ষণশীল বিরোধী, তাঁদের তিনি বোঝাচ্ছেন, এটা সমাজতত্ত্বের অমোঘ নির্দেশ, সুতরাং মেনে নিতে হবে। শরৎচন্দ্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যটা বর্জন করেছেন। "কিন্তু যা হবার হবে"—এটাকেই মেনে চলেছেন। অথচ তিনি সমাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার বিরোধী কারণ এটা হবার ছিল না। ব্রহ্মদেশে দাঠাকুরের হোটেলে (শ্রীকান্ত, ২য় পর্ব) হিন্দুর যা হবার হবে আর বাংলা দেশের গ্রামে তার যা হবার হবে। শরৎচন্দ্রের মনে অদ্ভুতভাবে দুটোর মিল ঘটিয়ে দিচ্ছেন হার্বার্ট স্পেনসার।

স্পেনসার হচ্ছেন, র‍্যাডিক্যাল অথচ উদীয়মান বৃটিশ বুর্জোয়ার মুখপাত্র। মরার আগে আমেরিকার লুঠেরা বোকনিয়ার কোটিপতি শিল্পপতি এন্ড্রু কারনেগী 'মাস্টার টিচার' বলে প্রণাম ও অভিবাদন করে গেলেন। যাই হোক তাঁর যা দর্শন তা নানান মানুষের নানান দৃষ্টিভঙ্গীকে আশ্বস্ত করে। ফলে শরৎচন্দ্রের পক্ষে, এখানকার থিতিয়ে যাওয়া বুর্জোয়ার পক্ষে, হার্বার্ট স্পেনসার যুৎসই দার্শনিক। তাড়াহুড়া কেন ? যা হবার তাই হবে। পরিবর্তন

চাই? কিছু .তা হবেই, যা হবার তা হবে। হার্বার্ট স্পেনসার সমাজতন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী। এটাও বুর্জোয়াদের পক্ষে সন্তোষজনক। দেশ কাল পাত্রের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে সত্য নির্ণয়ের কথা এক ধরনের সম্বন্ধবাদ স্পেনসারের তত্ত্বে আছে। দেশ কাল পাত্র ভেদে যেখানে যা আছে যা হচ্ছে সবই যা হবার তাই হচ্ছে। ফ্রান্সে বিপ্লব হলো। হবার ছিল হলো। ইংলণ্ডে বুর্জোয়ারা কমপ্রোমাইজ করে সংস্কারের আন্দোলন করছে (যেমন, অ্যান্টি কর্ণ ল' আন্দোলন কিংবা ১৮৩২ এর রিফর্মস্ অ্যাক্টের আন্দোলন) এ সবই যেদেশে যেমন সাজে তাই হচ্ছে। তা ছাড়া, যা হচ্ছে সবেরই মূলে আছে, যে-শক্তি কনস্টাণ্ট ও ইতিবাচক থাকছে সে একটা 'ডিভাইনলি ইমপ্লানটেড মোরাল সেন্স'। বলা বাহুল্য, এর সঙ্গে জড়বাদের কোনও সম্পর্ক নেই। এ তত্ত্ব ডায়ালেকটিকসের সরাসরি বিরোধী। স্পেনসার সাইকোলজি এথিক্স্ সোশিওলজি ইত্যাদি বিষয়েও পুস্তক রচনা করে গেছেন—কিন্তু সবই উপরোক্ত মূল তত্ত্বে অনুপ্রাণিত।*

ত্রুটি সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংলণ্ডের প্রগতিশীল বুর্জোয়াজীর মধ্যেই হার্বার্ট স্পেনসারকে ধরতে হবে। কারণ, পুরোনো সামন্তবাদ এবং জমিদারী ব্যবস্থার তিনি বিরুদ্ধে ছিলেন, উদীয়মান বুর্জোয়া ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অবাধ বিকাশ কামনা করতেন—যদিও তাঁর যুক্তিতে এসব যা হবার তাই হবে, এই লাইনেই তাকে মানতে হবে।

ইংলণ্ডের উদীয়মান বুর্জোয়ারা তৎকালীন ইংলণ্ডের শ্রমিক আন্দোলনের নেতা চার্টিস্টদের সহযোগিতা চাইতেন জমিদার ও অভিজাতদের বিরুদ্ধে তাঁদের আন্দোলনে। তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পর্কে একটা বিশেষ সময় সম্বন্ধে এঙ্গেল্স বলেছেন: "এই সময়ে রক্ষণশীলরা ক্ষমতায় আসীন থাকায় উদারনীতিক বুর্জোয়ারা তাঁদের আইনানুবর্তিতার অভ্যাস আধাআধি ছেড়ে বসলেন। তাঁরা শ্রমিকদের সাহায্যে একটা বিপ্লবে আসতে চাইলেন। শ্রমিকরা তাঁদের জন্য আগুনে সেঁকতে দেওয়া বাদাম নিজেদের আঙুল পুড়িয়ে টেনে দিবে আর

* Cf "Perry Anderson in a most elegant essay, argues that sociology, which considers society in totality, arises as a bourgeois response in societies challenged by Marxist analysis." (Herbert Spencer, the Evolution of a Sociologist by J. D. Y. Peel). "Spencer's writings particularly in America seemed to yield consistent ideological support for untransmelled capitalism of buccaneering type.")—(Ibid Page 214)

তাঁরা খাবেন, এই ছিল বুর্জোয়াদের ধারণা" (কনডিশান অব দি ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যাণ্ড)। কমিউনিস্ট ইস্তাহারেও শ্রমিক শ্রেণীকে বুর্জোয়াদের নিজেদের দাবীর আন্দোলনে টেনে আনার উল্লেখ আছে। চার্টিস্টদের অন্যতম প্রধান দাবী ছিল "ইউনিভারস্যাল সাফরেজ"। সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোট। এ ছাড়া শ্রমিকদের নিজস্ব দাবী ছিল। উদারনীতিক বুর্জোয়ারা প্রথম সংগঠিত ভাবে চার্টিস্টদের নিজেদের আওতায় আনার চেষ্টা করে। ব্যর্থ হয়ে চার্টিস্টদের সংঘের পাল্টা প্রতিষ্ঠান 'কমপ্লিট সাফরেজ ইউনিয়ন' ('সি-এস-ইউ') গড়ে বিভ্রান্তি আনার চেষ্টা করে। হার্বার্ট স্পেনসার এই সি-এস-ইউ সংস্থার ডারবি শাখার সম্পাদক ছিলেন। এর থেকে হার্বার্ট স্পেনসারের শ্রমিক আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে কিছু ধারণা হতে পারে।

উপসংহার

"নিগৃহীত নরনারীর মনের যাতনাকে রূপ দিয়ে তিনি মানুষের মনে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন, যে উদ্দীপনা এনে দিয়েছেন, সমাধানের অগৌরবে তা স্তিমিত হয়নি। বাস্তবের পরিবর্তনশীল অবস্থা অনেক বেশী অগ্রসরমান এবং সে পরিবর্তনের গতিও খুব দ্রুত। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশ ব্যক্তির অধিকার বোধ। তাঁর অতুলনীয় শিল্পনৈপুণ্যে তা এমনই জাগরিত হয়েছে, তাতে এমনই গতি সঞ্চারিত হয়েছে যে অগ্রসরমাণ অনুকূল পরিস্থিতির আবহাওয়ায় তাঁর নিজের স্থাপিত আগলও তাকে রোধ করতে পারেনি।"

শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের মানদণ্ডে তাঁকে বিচারের কোনও প্রশ্নই আসে না। ভারতীয় বুর্জোয়া এবং পেতি-বুর্জোয়ার, বিশেষতঃ শেষোক্তের, সে যুগে যা অতি সাধারণ চরিত্র, তাঁর মধ্যেই পাওয়া যাবে। প্রগতিশীলতার নানান সুস্পষ্ট সূচক থাকলেও কিছু কিছু সংস্কারের পশ্চাৎপদতায় গণতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিমাপেও ঘাটতি পাওয়া যাবে—যদিও এসব সত্ত্বেও একথা দৃঢ়ভাবে বলতে দ্বিধা নেই যে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য গণতান্ত্রিক চেতনার তীব্র প্ররোচক। একথা সত্য যে তিনি সমস্যা উঠিয়ে কাহিনীর স্বাভাবিক গতি যেদিকে নিয়ে যেতে পারতেন তা নিয়ে যাননি। কিন্তু সমাধান দেননি এটা ঠিক নয়। না দিলে আরও ভাল হতো, যেমন কিছু কাহিনীতে আছে। তিনি মোচড় দিয়ে এমন সমাধান দিয়েছেন যা স্বাভাবিক গতিতে নির্ধারিত হয় না। যাই হোক, সমাধান যাইহোক, বাঙ্গালীর মনকে সেটা নাড়া দেয়নি।

শেষ জীবনে ১৯২৪ সালের পর থেকে তিনি রাজনীতির কর্মক্ষেত্রে কোনও

কোনও মৌলিক বিষয়ে প্রতিক্রিয়ার দিকে ঝুঁকতে থাকেন—যদিও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী অক্ষুন্নই ছিল। কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক সম্মেলনে দেশবন্ধুর সাথীদের অনেকের দ্বারা দেশবন্ধুর একটা বড় আদর্শ বর্জিত হলো। মত ও পথে দেখা গেল তিনিও তাঁদের সঙ্গী। বরং তিনি চললেন আরও বেশী। এসময়ে তাঁর যে সাহচর্য অর্জিত হলো তার বহুলাংশই তাঁর জীবনের পক্ষে এবং দেশের পক্ষে মঙ্গলময় ছিল না। ফলে রাজনীতিতেও এর প্রভাবে তাঁর মত ও পথ এমনভাবে বিচলিত হয়েছে যা-মঙ্গলময় নয়। এই প্রবন্ধের আলোচ্য তা নয় বলে নিরস্ত থাকছি। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতেও পড়েছে একথা যাঁরা বিনা বায়াসে (bias-এ) দেখবেন তাঁরাই লক্ষ্য করবেন।

কিন্তু পুনরাবৃত্তি করে আবার বলবো সব সত্ত্বেও একটা জিনিসে শেষ পর্যন্ত তিনি দৃঢ় ছিলেন। সেটা তাঁর অনমনীয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা। এ বিষয়ে তিনি অটল ছিলেন।

সবমিলিয়ে সহজেই বলা যায় তাঁর অমর সৃষ্টির জন্য বাংলার গণমানস ও বাংলা সাহিত্যে তাঁর শ্রদ্ধার আসন চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে। অতীতে সেই সাহিত্য মৌলিক চরিত্রের গুণে যে গতি সঞ্চার করেছিল, সেই গতি সঞ্চারের ক্ষমতা বর্তমানেও আছে ভবিষ্যতেও থাকবে। এই গুণই তাঁর সাহিত্যকে দেশের চিরায়ত সম্পদ করে রাখবে।

তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করে শেষ করছি।

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম

এক নিদারুণ স্পন্দিত-প্রাণ নিস্তব্ধতার অবসান ঘটলো। একদিন দেশের বুকে আকস্মিক বজ্রাঘাতের মতো লেগেছিল তাঁর এই আচম্বিত স্তব্ধতা। তাঁর গান তাঁর কবিতায় মানুষ সে ব্যথা ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করে যেতেন। বুঝলেও মন বুঝতে চায় না। তাই মানুষের মন যতি টানতে অস্বীকার করে। দুই বাংলা ধরে আজকের এই শোক প্রকাশ বুঝিয়ে দিচ্ছে কি ব্যাকুল ব্যথা ও বেদনা নীরব হয়ে ছিল ঐ নিদারুণ নিস্তব্ধতার সামনে। ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশের মানুষ এবং সারা পৃথিবীর প্রগতিশীল মানুষের সঙ্গে আমরাও আন্তরিক শোক প্রকাশ করছি এবং শ্রদ্ধাবনত মস্তকে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব এক যুগান্তকারী ঘটনা। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ক্ষোভে আলোড়িত জাতি যখন তার মর্মবেদনা প্রকাশে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সেই সময় উপস্থিত হলেন কবি। তাঁরই ভাষায়, দেশের মানুষ দেখল এক কবি, যাঁর এক হাতে বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য।

আজকের মানুষও বুঝতে পারছেন কেন তখনকার কালের মানুষ এ-কবির আবির্ভাবে এত চমৎকৃত হয়েছিলেন। কারণ, বাংলা সাহিত্যের পরম্পরায় ক্রমোত্তর পট-পরিবর্তনে একটি বড় অংশে হঠাৎ প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার মত দেখা যায় এই আবির্ভাবকে। কিন্তু তবু একালের মানুষের পক্ষে সেকালের মানুষের সেই শিহরিত বিস্ময় এবং উদ্বেলিত আবেগের পরিমাপ করা কঠিন। কারণ, দেশের এই অর্ধশতাব্দীর পরিবর্তিত অবস্থায় এবং এই সময়ের মধ্যে সারা বিশ্বে বিপ্লবের অগ্রগতি ও তার সঙ্গে দেশেরও চিন্তাজগতে অগ্রগতির পটভূমিকায় আজ পিছন দিকে তাকিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ও পরের ভারতের পার্থক্য সহজে উপলব্ধি করা কঠিন। অথচ শেষোক্ত যে পার্থক্য, যার ফলে তখনকার সেই উচ্ছল জলতরঙ্গ, তা হতে বিচ্ছিন্ন নয় কবির এই আবির্ভাব। আবার তারও পিছন দিকে তাকালে মনে হয় এ পরিণতির আয়োজন যেন ইতিহাস করে' চলেছিল। দেশের ভিতরে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুলচিত্ত বার বার অন্ধ গলিতে ব্যর্থ হচ্ছিল আর পথ খুঁজছিল এবং সেই খোঁজার মধ্যেই আয়োজনও এগিয়ে চলেছিল তাঁদের অগোচরে। শুধু প্রতীক্ষা ছিল একটা কিছু বিস্ফোরণের যার কম্পন দেশে দেশে সঞ্চারিত হয়ে আলোড়িত করে, আবর্তিত করে, এবং মিলিত করে, প্রবল করে তুলবে রুদ্ধ সমস্ত প্রবাহকে এক বিরাটতর প্রবাহে।

দেড়শত বৎসরাধিক ইংরাজ রাজত্বে দেশের অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণের সঙ্গে সঙ্গে ও সেই শোষণেরই স্বার্থে প্রবর্তিত হয়েছিল রেলপথ, যন্ত্রশিল্প. পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার। ফলে গোকুলে বাড়ছিল রাখাল। পদে পদে ঠোক্কর খেয়েও সে বাড়ছিল। মার্কস্ বলেছিলেন, আধুনিক শিক্ষার প্রভাব দেখা দিবে। দেখা দিয়েও ছিল এনলাইটেনমেণ্টের প্রভাব—কিন্তু বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ তার সহায়পুষ্ট সামন্ততন্ত্র এবং আরও কত বড় ছোট নিগড়—দেশের বাস্তব পরিবর্তনে সূচিত অগ্রগতির অবাধ বিস্তার ব্যাহত করছিল, বিশেষ করে মানসিক জগতে। কি উত্তম, কঠিন অধ্যবসায় ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে অজ্ঞতার অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে নিজের ভিতরের হাজার হাজার বৎসরের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে ভেদ-বিভেদ, ব্যবধানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীকে অতিক্রম করে, তবে মুক্তিকামী শক্তি এক পা এক পা করে, এগোতে পারছিল। এই অগ্রগতিতে নবোদ্ভূত শ্রেণী বুর্জোয়া শ্রেণীর চিন্তানায়কদের বিরাট দান অনস্বীকার্য। কিন্তু এদের শ্রেণীসুলভ সীমাবদ্ধতা, সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীলতা, সামন্ত শ্রেণীর সঙ্গে বন্ধন শোষক-শ্রেণীর ঈর্ষা-দ্বেষ-মাৎসর্য প্রভাবিত ভেদ বিভেদ, অগ্রগতিকে কিরূপ আড়ষ্ট করেছে, সংগ্রামের মুখে কিরূপ প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছে তাও ভোলার নয়। সংস্কৃতিতে শেষোক্তের প্রতিফলন হয়েছে ধর্মের মোহসৃষ্টি রিভাইভেলিজ্‌ম, সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা, এমন কি সাম্প্রদায়িক বৈরিতার পরিচর্যায়। এবং তার সঙ্গে থেকেছে ইংরাজের রোষ সম্বন্ধে খেয়াল রেখে বিচক্ষণ সাবধানী পদক্ষেপ।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিশীল হিন্দুর মধ্যে বর্ণাশ্রম ধর্মের সূক্ষ্ম তাৎপর্য করার ব্যাকুলতা শুধু বোঝাচ্ছিল প্রগতির স্রোত বর্ণভেদের আসল আশ্রয়টিকে ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে কি বেগ পাচ্ছিল। মুসলমানের মধ্যে অগ্রগামী জনমত স্যর সৈয়দের প্রবর্তিত রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণে বিরূপতাকে কাটিয়ে উঠলেও, প্যান ইসলামিজ্‌ম তথা বিশ্ব মুসলিম নেতৃত্বের বন্ধনের প্রতি আকর্ষণ বিচ্ছিন্নতাকে কাটাতে সাহায্য করছিল না। তবু এই আকর্ষণ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার সহায়ক বলে বুঝিয়ে দিচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কি বিরাট শক্তি দেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাকে কাটিয়ে উঠতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। এইসব প্রতিরুদ্ধ শক্তির উন্মোচনের প্রয়োজন ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঘাতের সঙ্গে রুশ বিপ্লবের বিস্ফোরণ সারা প্রাচ্যকে আলোড়িত করে তুলল। এশিয়ার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের ঢেউ সঞ্চারিত হল। শুধু তাই নয়। শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব সাম্যবাদের জয় মেহনতী মানুষের কাছে তার আসল পরিচয়,

আসল মর্যাদা স্মরণ করিয়ে দিল। আর প্রকৃত আন্তরিক প্রগতিশীল চিন্তাধারার কাছে ভেদাচারের মহিমা এক আঘাতে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এর বিকাশের প্রধান হোতা কাজী নজরুল ইসলাম।

১৮৯৯ সালে বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে কাজী পরিবারে নজরুল ইসলামের জন্ম। তাঁদের পূর্বপুরুষরা বাদশাহী আমলে বিচারকের কাজ করতেন। ইংরাজ আমলেও গোড়ার দিকে বিচারালয় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নয়। বিচারালয়ের (মুসলমান) মুফতিদের যোগ্যতা সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায় বিলেতে পার্লামেন্টে দেওয়া তাঁর সাক্ষ্যে খুবই প্রশংসা করেছিলেন। পরে যখন কোর্ট কাছারী ঢেলে সাজা হয় তখন পুরোনো দিনের শুধু ফার্সী জানা কর্মচারীদের ছাঁটাই করা হয়। ইংরেজের ভেদনীতির ব্যাপারও ছিল। তাছাড়া মুসলমানদের নিজেদেরও ইংরাজী শিক্ষার প্রতি ছিল তীব্র বিমুখতা। যাই হোক এই সব নানান কারণে ইংরেজ আমলে এই ধরনের পুরাতন মুসলমান শিক্ষিত পরিবারদের দুঃস্থ অবস্থা হয়। সংস্কৃতি বা ধর্মের নানান দিকে একসময় যুক্ত ছিলেন এমন অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার নতুনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে অত্যন্ত দুঃস্থ হয়ে যান। উল্লিখিত ধরনের মুসলমান পরিবারদের ব্যাপারও তাই। অবস্থা বিপাকে রাজাবাদশাদের দেওয়া অনেক ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর সম্পত্তিও, সময়ে যেমন করজ বিক্রীর কারণে বেহাত হয়ে যায় উক্ত ধরনের আয়মা সম্পত্তিও তেমনই হয়। সংস্কৃতির ঐতিহ্য ছিল, গ্রামাঞ্চলে পুরাতন ঐতিহ্যের কারণে মান সম্মানও ছিল অথচ আর্থিক সম্বল ছিল না, এই ছিল এই ধরনের পরিবারের মানুষদের অবস্থা। অনেক পরিবার ধ্বংস হয়ে বংশধারা লুপ্ত হয়ে যায়। একটি বিষয়ে সৌভাগ্য ছিল। ইংরেজ পরিকল্পিতভাবে শহরাঞ্চলে যে বিদ্বেষবীজ রোপণ করতে পেরেছিল গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। নজরুলের শৈশব ও বাল্যকাল অন্ততঃ এইটুকু সুস্থ পরিবেশে কাটতে পায়।

বর্ধমান জেলায় রাজাবাদশার আয়মাপ্রাপ্ত পরিবার বেশ একটা বড় সংখ্যায় ছিল। সম্ভবতঃ পাঠান আমলেই এর শুরু। কবিকঙ্কণ বোধহয় এরকম পরিবারের কথাই বলেছেন, যখন বলছেন : "মখদম পড়ায় পঠনা"।

বর্ধমান জেলার সেট্‌ল্‌মেন্ট রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় আসানসোল মহকুমায় ছোট ছোট আয়মার সংখ্যা ছিল অনেকগুলি। বেশীর ভাগই হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। বর্ধমানে আমাদের কালেও এমন একাধিক গ্রাম ছিল যেখানে আয়মা ছিল অথচ একঘর মুসলমানও ছিল না।

অর্থাৎ বিধ্বস্ত হওয়ার কারণে বংশধারা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আয়মা তৌজী অন্যদের নিকট হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছিল বহু পূর্ব হ'তেই।

বলা বাহুল্য মুষ্টিমেয় মহাজন জমিদার শ্রেণী বাদে গ্রামের তখনকার সমস্ত অধিবাসীই দারিদ্র্যক্লিষ্ট। কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী শ্রেণীদের অবস্থাও শোচনীয়।

স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ লিখেছেন ১৮০৩ এ মোগল বাদশাহ যখন নামটুকু এবং সামান্য তনখা ছাড়া ইংরেজের কাছে সব হারান তখন বাদশাহী পরিবারের শাখা প্রশাখার সন্তান ও আশ্রিতরা অন্নাভাবে অভুক্ত মারা যাচ্ছিল। তিনি বলেছেন ফাঁকা মর্যাদার কারণে তারা কাজের সন্ধানে বের হ'তো না অথচ দিল্লী কেল্লার প্রাচীরের ওধারে ভিতর থেকে "মারা যাচ্ছে খেতে দাও খেতে দাও" করে চীৎকার করতো। তিনি হয়তো নির্দয়ও হচ্ছেন। কারণ, কাজ খুঁজলেই যে ইংরেজের শোষিত দেশে কাজ পাওয়া যেতো এরই বা কি নিশ্চয়তা। তিনি নিজে বা সমশ্রেণীর অনেকে হয়তো ইংরেজের শাসন ব্যবস্থায় চাকরি পেয়ে রক্ষা পেয়েছিলেন। এমন হ'তে পারে অনেকে হয়তো অসম্মান জ্ঞানে সেটাও করতে পারেনি।

গ্রামস্থ এইসব পরিবারদের সঙ্গে মোগল বাদশার সন্তানদের তুলনা করা অবাস্তব। তবে মান মর্যাদার ব্যাপারে গ্রামের ক্ষেত্রে গ্রামের অভ্যন্তরে সকলের সমস্যাই এক। 'স্ট্যাটাস'ই সেখানে বড় কথা। প্রত্যেকেরই একটা কিছু স্ট্যাটাস আছে। ছোট বা বড় কেউই এর থেকে বাদ নয়। 'মর্যাদা'কে আঁকড়ে বসে থাকবো অথচ রুজির সন্ধানে বের হব না—এরকম শোচনীয় অবস্থার নিদর্শন গ্রামাঞ্চলে বেশ ছিল এখনও কিছু আছে। কিন্তু ইংরেজ আমলের কথা ভাবলে প্রশ্ন ওঠে, "পথের পাঁচালী"র হরিহর কি পথে বের হয়ে রুজি পেয়েছিলেন? সুতরাং এইসব সমস্যার সামনে সমাধানও খুঁজে বার করা কঠিন ছিল। দৈহিক শ্রমের অবস্থাকে মেনে নিলে তবু কিছুটা পথের সন্ধান থাকে —যদিচ তাতেও অর্ধাশন অনশন সম্পূর্ণ ঠেকানো যায় এমন নয়।

আত্মনির্ভর হওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে এই আবেষ্টনী ভেঙ্গে বেরিয়ে আসায় নজরুল গ্রামের ও দেশের প্রচলিত সামাজিক রীতির বিচারে এক অসাধারণ বলিষ্ঠতার পরিচয় বাল্যকাল ও কৈশোরেই দিয়েছিলেন। দারিদ্র্যে মুষড়ে পড়ে থাকার পরিবর্তে যে কোনও মেহনত এবং কায়ক্লেশে রোজগারের সুযোগ তিনি পেয়েছেন তাকেই বরণ করে নিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই নিদারুণ কষ্টের মধ্যেও একদিকে লেখাপড়া ও অন্যদিকে সঙ্গীতের সাধনা এই দুই লক্ষ্যকে অবিচলিত দৃঢ়তায় ধরে রেখেছিলেন। গ্রামের মানুষের কূপমণ্ডুকতায় পোষিত শিকল ও নিম্নমধ্যবিত্তের

জড়তাকে দৃঢ় হস্তে ছিন্ন করে তিনি প্রলেতারিয়েতের লাইনে দাঁড়াতে দ্বিধা করেননি। তাঁর স্বভাবসুলভ আজাদ মানসিকতা অবাধ অগ্রগতি ও বিস্তারের পথ খুঁজে পেয়েছিল। তিনি রুটির দোকানে কাজ করেছেন, গার্ড সাহেবের ঘরে খিদমত্‌গারের কাজ করেছেন, তবু আত্মীয়-পর কারও কাছে অন্নভিক্ষার জন্য হাত পাতেননি।

এঙ্গেল্‌স্‌ দেখিয়েছেন সামান্য একটা ঘর কি দু'ছটাক তরিতরকারীর খেত-এর মধ্যে মাথাগুঁজে না পড়ে থেকে সামান্য সম্পত্তির মোহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সহরে ও শিল্পাঞ্চলে এসে প্রলেতারিয়েত আত্মসম্মানের বলিষ্ঠ সত্তা অর্জন করে। কৈশোরের অর্জিত এই বাস্তব মুক্তি তাঁর সারা জীবনের নিদর্শিত অপূর্ব দৃঢ়তার ভিত্তি তৈরী করতে সাহায্য করেছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। রুজির উপায়ের সন্ধানে তিনি লেটোর দলে যোগদান করেছিলেন এবং পরে লেটোর দলও গড়েছিলেন। দেশের পক্ষে এও এক সৌভাগ্য। কারণ লেটোর মাধ্যমে কাব্য ও সঙ্গীত উভয়ের চর্চা ও তা লোকপ্রিয় করে পরিবেশন করার কৌশল এ দুটিরই অনুশীলনের সুযোগ ঘটেছিল ও ভবিষ্যতে তাঁর সাধনার পথ প্রসারিত হয়েছিল।

শৈশবের ও পরবর্তীকালের পড়াশুনার কথা কিছু আলোচনা করব। এই ধরনের পরিবারে যেমন চলিত ছিল, নজরুলের ক্ষেত্রেও দেখা যায় তা ঘটেছিল। তিনি ঘরেই ফার্সী পড়া শুরু করেছিলেন এবং প্রাথমিক যা শিক্ষা তা অর্জন করেছিলেন। এর লিপিজ্ঞানটাই হলো প্রথম 'হার্ডল্‌'। এটা টপকাতে পারলে, বাকীটা অনেক এগিয়ে যায়। এই সূত্রে পাঠকের ধৈর্য ভিক্ষা করে একটা কথা বলে নিতে চাই। ফারসী ইন্দো-ভারতীয় ভাষার অন্যতম। ভারতীয় ভাষাদের জ্ঞাতি ভগিনী বলা যেতে পারে। তাছাড়া নজরুলের পারিবারিক সমাজের আবহাওয়াতে তখনও ফার্সী চালু ছিল, যেমন তাঁর সমবর্তী পরিবারে অন্যত্র তখনও ছিল। বর্ধমানে তো ক্ষেত্রী হিন্দু পরিবারের মধ্যেও ছিল। পরে সেনাবাহিনীতে সুপণ্ডিত মৌলভীর কাছে নজরুল হাফেজ পড়েন। এসব বলতে হলো শুধু একটি কারণে। একজন সুপরিচিত লেখক অযথা নজরুলের ফার্সী জ্ঞানটা হেয় করতে চেয়েছেন। (তাঁর সিদ্ধান্তের কারণ দিয়েছেন এই যে নজরুলের জন্ম এমন এলাকায় যেখানে মুসলমানের সংখ্যা কম। যেন দিল্লী বা উত্তরপ্রদেশে ফারসী জানা লোক কম, যেহেতু মুসলমানের সংখ্যা কম।) হিন্দু মুসলমান প্রশ্নও এক্ষেত্রে অবান্তর। এই সেদিন পর্যন্ত (এখন অবসর প্রাপ্ত) ডক্টর হীরালাল চোপরা ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী বিভাগের প্রধান।

এবিষয়ে কথা বাড়াতে চাই না। শুধু প্রতিবাদটা ধ্বনিত করাটাই প্রয়োজন ছিল বলে এবিষয় উত্থাপন করলাম।

যাই হোক, লেখাপড়ার ক্ষেত্রে তাঁর নিজের উদ্যম ও অধ্যবসায়-ই ছিল প্রধান। তা না হলে বয়সানুপাতে তাঁর শিক্ষার দ্যুতি এমন করে শিক্ষিত মানুষদের চমৎকৃত করতো না। দারোগা তাঁর গুণে আকর্ষিত হয়ে এবং পড়াশুনায় তাঁর আগ্রহ দেখে ময়মনসিংহে তাঁর দেশের স্কুলে ভর্তি করলেন। বর্ধমানের মাথরুণ গ্রামে কিংবা রানীগঞ্জ স্কুলে যেখানেই ভর্তি হবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন নিজ গুণেই সার্থক হয়েছেন। রানীগঞ্জ স্কুলে ডবল প্রমোশান পেয়েছিলেন। সেও কম নয়। ক্লাসে স্ট্যাণ্ড করতেন। এমন অবস্থায় প্রবেশিকা পরীক্ষার মুখে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করলেন। একটি কথা উল্লেখ করা ভাল। সে সময় মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা কম ছিল, ভাল ছাত্র আরও কম। সুতরাং নজরুলের পক্ষে প্রবেশিকা পরীক্ষায় হাজি মুহম্মদ মহসীন ফাণ্ড থেকে স্কলারশিপ পাওয়া কঠিন ছিল না। তাছাড়া প্রেসিডেন্সী কলেজে বেতন দিতে অসমর্থ মুসলমান ছাত্রদের বেতন মহসিন ফাণ্ড থেকে দেওয়া হতো। ফলানুযায়ী ঐ কলেজে ভর্তি হওয়া তাঁর পক্ষে কোনও অসুবিধাই ছিল না। সুতরাং নজরুল যদি কলেজে পড়াশুনা শেষ করার সঙ্কল্পে স্থির থাকতেন তাঁর আর কোন বাধাই ছিল না। গোড়ার জীবনের সব 'হার্ড্‌ল' পার হয়ে যখন পরিণতি সুনিশ্চিত সেই সময়েই তিনি পড়া ছেড়ে যুদ্ধে রওয়ানা হলেন।

কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর লিখিত স্মৃতিকথায় আকস্মিক এই সিদ্ধান্তের কারণ বর্ণনা করেছেন। দেশের স্বাধীনতার প্রেরণা নজরুলের বুকে ছিল। তাছাড়া তাঁর অন্যতম শিক্ষক বিপ্লবী নিবারণ ঘটক দ্বারাও অনুপ্রাণিত হন। যুদ্ধে সেনাবাহিনীতে যোগদানে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধবিদ্যা অর্জন। বলাবাহুল্য, এই অনুপ্রেরণায় তিনি স্কুল-কলেজে বিদ্যার্জনও তুচ্ছ মনে করেছিলেন।

১৮৫৩ সালে মার্কস্ আশা করেছিলেন, ভারতীয়দের সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ এবং আধুনিক সমরবিদ্যা শিক্ষাদান একসময় ভারতের মুক্তিসংগ্রামের কাজে লেগে যাবে। ক্রাইমিয়ার-যুদ্ধ প্রত্যাগত সৈন্য ১৮৫৭-র বিদ্রোহে তাঁর আশার কিছু প্রতিফলন দেখিয়েছিলেন। ১৯১৮-১৯এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অন্তে যাঁরা ফিরলেন তাঁরা শুধু যুদ্ধের কৌশল এবং স্বক্ষমতায় আত্মবিশ্বাস নিয়ে ফিরলেন তা নয়। পশ্চিমে ইউরোপ এবং পূর্বে পশ্চিম-এশিয়া পর্যন্ত ছড়ানো সৈন্যবাহিনী রুশ বিপ্লবের

সংবাদ নিয়ে এলেন। তাছাড়া ভারতীয় সৈন্য যাঁরা সাক্ষাৎ বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত হলেন এবং তার জন্য আত্মদান করলেন, তাঁদের কাহিনীও সৈন্যদের শিবিরে শিবিরে পৌঁছে গেল। স্টেটসম্যান সম্পাদক আরথার মুর রোটারি ক্লাবে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন: "In the days of the Czars the sole object of Russia was to swallow India and in the 19th century she was pushing out to enlarge her dominions···All this seemed changed in the twinkling of an eye at the end of the war Russia suddenly posed as the last thing in advanced ideas prepared to cancel all concessions to waive capitulation and to release Persians, Turks, Chinese from all onerous conditions and treaties ; this happened at the very moment when we had thoroughly frightened the East ··At the end of the war the British were in occupation of Constantinople, Damascus, Bagdad, Kermanshah, Hamadan, Kazvin···"

শ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহমদ লিখছেন, "দেশের অবস্থা তখন খুবই গরম। তাপের ওপরে চড়লে জল যেমন টগবগ ফোটে দেশের বিক্ষুব্ধ মানুষও সেই রকম টগবগ করে ফুটছিল। পাঞ্জাবে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার হয়েছিল সেই কথা দেশের জনসাধারণ তখনও ভোলেন নি। ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার আইন দেশের লোকেরা মেনে নিতে চাইছেন না কিছুতেই। আবার বড় বড় নেতারা এই শাসন সংস্কার কাজে লাগাতে চাইতেন। পর্বত ও সমুদ্রের বাধা কাটিয়ে রুশ দেশের মজুর শ্রেণীর বিপ্লবের খানিকটা ঢেউ এদেশেও পৌঁছেছে। মজুর শ্রেণী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ধর্মঘটের পর ধর্মঘট দেশের নানান জায়গায়। প্রথম মহাযুদ্ধের যেসব ভারতীয়েরা বিরাট মুনাফা লুটেছেন তাঁরা নূতন নূতন কারখানা ইত্যাদি করতে চাইছেন।"

সারাভারতে সংগৃহীত সৈন্যবাহিনীর অর্ধেকের বেশী (৩ লক্ষ ৬০ হাজার) গিয়েছিলেন পাঞ্জাব থেকে। এই প্রত্যাগত মুক্তিকামনায় অনুপ্রাণিত নবচেতনালব্ধ পাঞ্জাবী সৈনিক এবং উদ্দীপিত পাঞ্জাবের অধিবাসীদের সায়েস্তা করার জন্যই চলল সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেষণ। আর যাঁরা মুক্তি কামনা নিয়ে রণকৌশল শেখার অভিপ্রায়ে পরিকল্পিত উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন তাঁদের কি অবস্থা? হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম এইরকম একজন। শ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহমদ লিখছেন: "আমি নজরুল ইসলামের কাছে জানতে চাইলাম সে রাজনীতিতে

যোগ দিবে কিনা। জওয়াবে নজরুল বলল 'তাই যদি না দেব তবে ফৌজে গিয়েছিলাম কিসের জন্যে ?'

বিপ্লবের দুই সহযোগীর যাত্রা হল শুরু।

দেশের লোক দেখল : "আসছে এবার প্রলয় নেশার নৃত্য পাগল"। তাঁর অবাধ শক্তির উৎস এবার খুলে গেল। কারণ? "সিন্ধু পারের সিংহদ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল।" রুশ বিপ্লবের ধ্বনি জেগে উঠল তাঁর কণ্ঠে!

রামকৃষ্ণপুরের রেলের শ্রমিক স্বদেশী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখকে আমন্ত্রণ করে বৃষ্টির মধ্যে স্থানাভাবে ওয়াগনের নীচে বসে সভা করে তাঁদের হাতে নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থ তুলে দিয়েছিলেন। পথে অবনীন্দ্রনাথকে দেখে এক মোটবওয়া শ্রমিক মাথার মোট নামিয়ে সারাদিনের রোজগার তাঁর হাতে চাঁদা দিয়েছিলেন। (তবু অবনীন্দ্রনাথ এর স্বীকৃতিটুকু রেখে গেছেন।) নতুন ভারতের এই শক্তি যা' বুর্জোয়া নেতাদের শক্তি যোগাচ্ছিল তার আসল স্বীকৃতি অপেক্ষা করছিল।

"আসিতেছে শুভদিন, দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা
শুধিতে হইবে ঋণ—
সিক্ত যাদের সারা দেহমন মাটির মমতা রসে
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে।"

নজরুলকে যাঁরা শুধু প্রেমেরই কবি বানাবার তালে ছিলেন, বহুদিন আগে তিনি তাদের শুনিয়ে দিয়েছিলেন,

"প্রেমও আছে গুরু, যুদ্ধও আছে, বিশ্ব এমনি ঠাঁই,
ভালো নাহি লাগে, ভালো ছেলে হয়ে ছেড়ে যাও
মানা নাই।"

সুতরাং এই ধরণীর তরণীর হাল যাদের বশে রইবে তাদের আদর্শকে সামনে রেখে কবি যুদ্ধে নামলেন। দুই দশক ধরে মাঠে ময়দানে মঞ্চে কয়েদখানায় রণধ্বনি ও বীণার ঝঙ্কারে দেশের মানুষ, দেশের শ্রমিক কৃষক বুদ্ধিজীবীকে জীবনের গান শুনিয়ে ও মাতিয়ে একদিন নিদারুণভাবেই কবির কণ্ঠ নীরব হল।

আজ প্রাণের স্পন্দনও শেষ হল।

কিন্তু তবু সে সুর সে স্বর উভয় বাংলার মানুষের কাছে কখনই নীরব হবে না।

"গাইতে বসে' কণ্ঠ ছিঁড়ে আসবে যখন কান্না
বলবে সবাই—"সেই যে পথিক, তার শেখানো গান না ?"

কিন্তু কান্না আমাদের স্তব্ধ, কান্না আর আসবে না, আসবে অভিশাপ। মনে পড়বে পোড়া বার্তাকুর কথা, যারা কেড়ে নিল কোটি কোটি মানুষের মুখের গ্রাস তাদের কথা আর প্রয়াত মহান কবি ও বিদ্রোহীর সেই সঙ্কল্প তাঁর লেখায় যেন হয় ঐ সব শোষকদের সর্বনাশ। তাঁর স্মৃতি আমাদের অনুপ্রাণিত করবে সেই লক্ষ্য সাধনে যা আমাদের লক্ষ্য—যা ছিল তাঁরও লক্ষ্য—যার জন্য ছিল তাঁর অমর জীবন ও অমর লেখনী উৎসর্গীকৃত।

নজরুল ও আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার

একটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "জাতিকুলের মর্য্যাদা দেওয়া ধনের মর্য্যাদা দেওয়া সহজ। সেই বিচারেই ব্যক্তির প্রতি সর্বদাই সমাজে অবিচার ঘটে, শ্রেণীর বেড়ার বাইরে যোগ্য ব্যক্তির স্থান অযোগ্য ব্যক্তির পংক্তির নিচে পড়ে। কিন্তু, সাহিত্য জগন্নাথের ক্ষেত্র ; এখানে জাতির খাতিরে ব্যক্তির অপমান চলবে না। এমন কি এখানে বর্ণ সঙ্কর দোষও দোষ নয় ; মহাভারতের মতই উদারতা।...অথচ আমাদের দেশে দেবমন্দিরে প্রবেশেও যেমন জাতি বিচারকে কেউ নাস্তিকতা মনে করে না, তেমনি সাহিত্যের সরস্বতীর মন্দিরে পাণ্ডারা দ্বারের কাছে কুলের বিচার করতে দ্বিধা করে না। হয়তো বলে বসে, এ লেখাটার চাল কিংবা স্বভাব বিশুদ্ধ ভারতীয় নয়, এর কুলে যবন স্পর্শ দোষ আছে। দেবী ভারতী স্বয়ং এরকম মেল-বন্ধন মানেন না কিন্তু পাণ্ডারা এই নিয়ে তুমুল তর্ক তোলে।..."

এই প্রসঙ্গে দেশে দেশে সংস্কৃতির আদান প্রদান ও প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করে কবি বলেছেন : "অনুকরণই চুরি, স্বীকরণ চুরি নয়।...সাহিত্য বিচারকালে বিদেশী প্রভাব বা বিদেশী প্রকৃতির খোঁটা দিয়ে বর্ণ-সঙ্করতা বা ব্রাত্যতার তর্ক যেন তোলা না হয়।" (সাহিত্য বিচার, ১৩৩৬)

এ হলো ১৩৩৬ সালের লেখা। আগে ও পরে তাঁর সারা জীবনের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এ বক্তব্য। দেশকে যিনি 'মহামানবের সাগরতীর' বলে কল্পনা করেছিলেন তাঁর পক্ষে এই ধরনের উক্তিই সঙ্গত।

কিন্তু মাঝে হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতো একটা কথা এসে কিছু ধুলো উড়িয়ে বেশ বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করলো। ১৩৩৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদের অধিবেশনে তিনি এক ভাষণ দেন। সেই ভাষণের মধ্যে ছিল এই ধরনের কথা : "কোনো একজন বাঙ্গালী হিন্দু কবির কাব্যে দেখলুম, তিনি রক্ত শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেছেন 'খুন'। পুরাতন রক্ত শব্দে তাঁর কাব্যে রাঙা রঙ যদি না ধরে বুঝব তাহলে সেটাতে তাঁরই অকৃতিত্ব।" এছাড়া 'তরুণ সাহিত্যিক' বলে যাঁদের বর্ণিত হওয়ার কথা তিনি শুনছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে তিনি কিছু উল্লেখ করেন। বলেন "সাহিত্যে এইরকম নতুন হয়ে উঠবার যাঁদের প্রাণপণ চেষ্টা তাঁরাই নিজেদের তরুণ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু আমি তরুণ বলব তাঁদেরই যাঁদের কল্পনার আকাশ চিরপুরাতন রক্তরাগে অরুণবর্ণে সহজে নবীন। চরণ

রাঙাবার জন্যে যাঁদের উষাকে নিউমার্কেটে 'খুন' ফরমাশ করতে হয় না।" মেনে নিতেই হয় তীব্র ব্যঙ্গের সুর এই বক্তব্যে আছে।

কিন্তু পুরো রচনায় যেরূপে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে সেটুকুর দিকে না তাকালে, অব্যবহিত পরেই তারুণ্য সম্বন্ধে তিনি যা বললেন তাতে সমালোচনা করার কিছু থাকে না বরং তা অনুমোদনেরই কথা। তিনি বলছেন :

"আমি সেই তরুণদের বন্ধু, তাঁদের বয়স যতই প্রাচীন হোক। আর যে বৃদ্ধদের মরচে ধরা চিত্তবীণায় পুরাতনের স্পর্শে নবীন রাগিণী বেজে উঠে না তাঁদের সঙ্গে আমার মিল হবে না, তাঁদের বয়স নিতান্ত কাঁচা হলেও !"

কাজেই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বুঝতে অসুবিধা হয় না। আজ কত বৃদ্ধ মহৎ আদর্শ, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শ, শোষণহীন সমাজের সংগ্রামে সারা বিশ্বের শোষিত মানুষের মিলনের আদর্শ বুকে বহন করছেন, অথচ অনেক তরুণ জাতিদম্ভ, জাতিবৈরিতা ও শোষক শ্রেণীর আদর্শের অনুগামী হয়ে প্রগতির বিপক্ষে দাঁড়াচ্ছেন। অভিজ্ঞতার যাচাই-এ মানুষের এসব পরীক্ষিত।

আসলে তত্ত্বের বাইরে অনেক কিছু রয়ে গেছে সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। 'শনিবারের চিঠি'-র তখনকার যে চক্র 'প্রবাসী' চক্রকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ধাওয়া করতো তারা যে জলঘোলা করতে ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে নিয়তই তৎপর ছিল তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই। প্রবাসীর পাতায় আরবী ফারসী শব্দের বিরুদ্ধে সংকীর্ণদৃষ্টিতে লেখা আমি পড়েছি। এসব প্রবন্ধ নিছক সাহিত্য বিচার নয়। নিতান্ত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতেই লেখা। অন্য দিকে এও ধরে নিতে পারা যায় নজরুলকে রবীন্দ্রনাথ থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টারত ব্যক্তি তরুণদের মধ্যে হয়তো সম্পূর্ণ অভাব ছিল না। যাই হোক এসব নিয়ে আলোচনা এ-প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়। প্রয়োজনও নেই। বিশেষ করে প্রগতিশীলতার সাধারণ বিচারে দুই কবিই যখন বেড়ার একই ধারে—অন দি সেম সাইড অব দি ফেন্স্।

তবু একথা মানতেই হয়, যে সময় যেমনভাবে রবীন্দ্রনাথের উক্ত ভাষণটি উপস্থাপিত হয়েছিল সে-সময় নজরুলের প্রতিবাদও স্বাভাবিক আর তার প্রয়োজনও ছিল। রবীন্দ্রনাথ যে পরে (বিশেষ করে প্রবন্ধের প্রথমে উদ্ধৃত ১৩৩৬ সালের প্রবন্ধে) তাঁর বরাবরকার বক্তব্য পুনরায় দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করার প্রয়োজন বোধ করলেন তার কারণও হয়ে থাকতে পারে। শুধু তারুণ্যের গরিমাকে পুঁজি করে যাঁরা গুরুত্ব দাবী করেন, তাঁদের সতর্ক করার প্রয়োজন হয়তো ছিল। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছাড়িয়ে গেলেও সে

মূল্য অস্বীকার করা যায় না। আবার সেই অতিরিক্তের প্রতিবাদ এবং 'খুন' শব্দটিকে উপলক্ষ্য করে যা তিনি বলেছিলেন তার প্রতিবাদও যে ন্যায্য ছিল সেই বা কে অস্বীকার করবে? নজরুলের লেখা যথার্থ লক্ষ্য স্থান ভেদ করেছিল বীরবলের লেখায় তা বোঝা যায়। নজরুল রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের লক্ষ্য নয়— বীরবল কর্তৃক 'এ-ঘোষণার' প্রয়োজনীয়তা বোধ করা এবং সেই মর্মে ঘোষণা করাও নিরর্থক নয়।

আমি যা বললাম তা শুধু অবজেকটিভের সীমার মধ্যে থেকেই বললাম। আগেই বলেছি, তার বেশী আমার বর্তমান আলোচনায় প্রয়োজন নেই।

নজরুলের আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার বা বাংলা ভাষায় ঐরূপ শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। বর্তমানে আমার সীমিত উদ্দেশ্য তাই।

বীরবল বলেছেন: "বাংলা সাহিত্য থেকে আরবী ও ফারসী শব্দ বহিষ্কৃত করতে সেই জাতীয় সাহিত্যিকরাই উৎসুক যাঁরা বাংলা ভাষা জানেন না।" কথাটা সুন্দরভাবেই বলা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নটা এখানেই শেষ হয় না। বাংলা ভাষায় ফারসী ও আরবী শব্দ ইতিপূর্বে যে-সংখ্যায় প্রচলিত ছিল এখন তা নেই এও সত্য কথা। 'কবিকঙ্কণের' কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন। ভারতচন্দ্রের কথা বলেছেন, নজরুল। আরও অনেকে এঁদের কথা উল্লেখ করেছেন। আমি পিছন দিকে অতদূর যাচ্ছি না। একেবারে খাস ইংরেজের যুগে উনবিংশ শতাব্দীতেই আসা যাক। মাইকেলের "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁা" থেকে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। প্রথম ক্ষুদ্র দৃশ্যটিতেই অন্ততঃ ২০টি ফারসী শব্দ আছে। অনুরূপ-ভাবে গোটা নাটকটিতেই ছড়িয়ে আছে। দৃষ্টান্তের প্রয়োজনে নাটকের একটি কথোপকথন এখানে উদ্ধৃত করছি। কলকাতা হতে ছুটিতে আগত গ্রামের একটি ইংরেজী শিক্ষিত ছেলেকে (কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষার জন্য প্রেরিত) নিজের ছেলের সম্বন্ধে গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার ভক্তপ্রসাদবাবু জিজ্ঞাসাবাদ করছেন:

"আনন্দ: জ্যেঠামশায়; এমন ক্লেবর ছোকরা তো আর জুটি নাই।"

ভক্ত: এমন কি ছোকরা বললে বাপু?

আনন্দ: আজ্ঞে, অর্থাৎ ক্লেবর, অর্থাৎ সুচতুর, মেধাবী।

ভক্ত: হাঁ, হাঁ, ও তোমাদের ইংরেজী কথা বটে? ওসকল বাপু, আমাদের কানে ভাল লাগে না। জহীন কিম্বা চালাক বললে আমি বুঝতে পারি।" (মাইকেল, "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁা", দ্বিতীয়াঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক)।

শেষ দুইটি বাক্য বিশেষ করে দ্রষ্টব্য। নাটকের চরিত্র ভক্তর নিকট "জহীন" এবং "চালাক" শব্দ দুটি "ক্লেবর" শব্দ অপেক্ষা শুধু সহজবোধ্য নয় ভাল লাগে। "চালাক" শব্দটি মূলেই ফারসী—এখনও বাংলা ভাষায় চালু। "জহীন" শব্দটি মূলে আরবী কিন্তু ফারসী, উর্দু, হিন্দী এবং ভারতের অন্যান্য কিছু কিছু ভাষায় এখনও আছে। বাংলাদেশে আমাদের যৌবনকাল পর্যন্ত বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের বড় অংশের কথোপকথনে বেশ চালু ছিল। এখন হয়তো শব্দটি আরবী, ফারসী, উর্দু, হিন্দীর সঙ্গে পরিচিত নয় এমন বাঙ্গালী মুসলমানের কাছেও অপরিচিত। অর্থাৎ বাংলা ভাষায় আর নাই। দ্বিতীয় দৃশ্যে হানিফ ভক্তপ্রসাদের উদ্দেশে বলছে: "বেটার এত বড় মকদুর।" অর্থাৎ এত বড় ক্ষমতা। মকদুর শব্দটিও আর বাংলা ভাষায় চালু নেই। বোঝা গেল কিছু শব্দ 'বহিষ্কৃত' হয়েছে। তাতে ভাষার সম্পদে বা শ্রীর হানি ঘটেছে কিনা বা কিভাবে এসব গেল সে ভাষা-তত্ত্বেও এখানে যাচ্ছি না। এক ভাষা থেকে আর এক ভাষার শব্দ যেমন নানান কারণে আসে তেমনই নানান কারণে সরে যেতে পারে আবার পরিকল্পিতভাবে বিদায় করা হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। জারের আমলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার পিটার্সবার্গ শহরটার নামে জার্মান শব্দটির বদলে রুশ শব্দ পরিবর্তিত করে নতুন নামকরণ হলো পেট্রোগ্র্যাড। (পরে অবশ্য তা লেনিনগ্র্যাড হয়েছে।) বাংলা ভাষায় পণ্ডিত মশায়রা যে পরিকল্পিতভাবেই এই পরিবর্তন প্রচেষ্টায় রত হয়েছিলেন তাও সুবিদিত। সে চেষ্টা নিরন্তর চলেছে। এখন ইংরাজী শব্দ বাদ দেওয়ার প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গে সে চেষ্টা বেড়েছে বই কমে নাই। একটা অন্ধ জাতিদম্ভ ভাষার সরল সহজ প্রবহমান ও স্ফীতিমান গতিকে ব্যাহত করছে।

নজরুল সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতার বিরোধী। "পিনাকপাণির ডমরু" এবং "ইস্রাফিলের শিঙ্গা" দুই-ই তিনি ব্যবহার করছেন নির্দ্বিধায় এবং নিঃসঙ্কোচে। এমন কি শাক্তের শক্তি আবাহনেও নির্বিকার চিত্তে সহজ ও সরলভাবেই তিনি ফারসী ব্যবহার করেছেন।

যথা:

"মেখলা ছিঁড়িয়া চাবুক কর মা,
সে চাবুক কর নভ তড়িৎ,
জালিমের বুক বেয়ে খুন ঝরে'
লালে লাল হোক শ্বেত হরিৎ।" (রক্তাম্বরধারিণী মা)

এখানেও 'খুন' 'জালিম' এসে গেল—কিন্তু এত সহজভাবেই এল এবং উপমার সঙ্গে মিলে এমন আবেগ সৃষ্টি করল যে কেউ শব্দ দুটি ফারসী কিংবা সংস্কৃত

তা ভাবার অবকাশও পেল না। আবার এখানে 'চাবুক' শব্দটিও ফারসী। আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে নজরুল তাঁর কৈফিয়তে বলেছেন: আমি শুধু খুন নয়—বাংলায় চলতি আরও অনেক আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে। আমি মনে করি, বিশ্ব কাব্যলক্ষ্মীর একটা মুসলমানী ঢং আছে। ও সাজে তার শ্রীর হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নাই। স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্তীও ঐ ঢং-এর ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। "বাংলার কাব্যলক্ষ্মীকে দুটো ইরানী জেওর (গহনা) পরালে তার জাত যায় না, বরং তাঁকে আরও খুবসুরতই দেখায়।" নতুন শব্দও তিনি কবিতার মধ্যে আনছেন তাও তিনি স্বীকার করছেন, কারণ তিনি রবীন্দ্রনাথের "নতুন শব্দভীতি" দেখে বিস্মিত হচ্ছেন।

শেলীর একজন সমালোচক বলেছিলেন, প্রমিথিউস্ আনবাউণ্ড কিংবা এপিসাইকিডোন পড়ার সময় খেয়ালও থাকে না, পাঠান্তে পরে খেয়াল হয়, কি অপূর্ব শব্দ সম্পদ পার হয়ে এলাম। বহুলাংশে নজরুলের লেখা সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। 'বিদ্রোহী' এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। নানা ভাষা হতে শব্দ সঙ্কলনে অপূর্ব সৃষ্টির অন্যতম উত্তম দৃষ্টান্ত 'কামালপাশা', যাতে আরবী, ফারসী, মিলিটারির ব্যবহৃত ইংরাজী শব্দ এবং হিন্দী রয়েছে। "বুজদিল ঐ দুষমন সব বিলকুল সাফ হোগিয়া" —এই একটি ছত্রে আরবী, ফারসী, হিন্দীর সমাবেশে জয়োল্লাসের অদ্ভুত প্রকাশ হয়েছে। "কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই।"—এতেও তাই। শুধু তাই নয়। উর্দু বা হিন্দুস্তানি ভাষার প্রচ্ছন্ন চটুলতার সদ্ব্যবহারেরও উত্তম দৃষ্টান্ত। আসলে বর্ণিত বিষয় অপেক্ষা সেই বিষয়ে ভাব ও রস সৃষ্টির যে প্রয়োজনীয়তা তার জন্যই আরবী, ফারসী, হিন্দী বা উর্দু—নানান ভাষার শব্দের ব্যবহার হয়েছে, এটাই লক্ষ্য করা যায়। "ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া!" 'হাবিয়া দোজখ' যার চিরপ্রজ্জ্বলিত আগুনের মধ্যে জঘন্যতম পাপের অপরাধীরা নিক্ষিপ্ত হবে, ছোটবেলায় মা-দাদীর ও মৌলভীদের কাছে তার কথা শুনে আতঙ্কে শিহরিত হয়নি এমন ছেলেমেয়ে কম আছে। সুতরাং যে-বিদ্রোহীকে দেখলে এই হাবিয়া দোজখও "ভয়ে নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া" সে বিদ্রোহীর ভয়ানক রূপ মুসলমান শ্রোতা ও পাঠকের কাছে এর চেয়ে ভাল কি হতে পারে? "মোহররম" কবিতায় আর এক সুর—বিষাদ, ব্যথা, বেদনার সুর। তার উপর আছে বাংলার গ্রামে গ্রামে ফকিরদের মহররমের 'মার্সিয়া' গান বা শোক গাথা। "রণে যায় কাসিম ঐ দু'ঘড়ির নওশা / মেহদীর রংটুকু মুছে গেল সহসা! / হায়, হায় কাঁদে বায় পূরবী ও দখিনা,/কঙ্কণ পঁইচি খুলে ফেল সকীনা।" সদ্য বিবাহিত

বিধবা সকিনার এইভাবে বেশবাসে পরিবর্তন ও শোকব্যঞ্জক বর্ণনা এসব নিছক ভারতের ও বাংলার। বৈধব্যের এসব চিহ্ন এ দেশের বাইরে নেই। কিন্তু ভারত ও বাংলার ফকিররা ও উর্দুতে মার্সিয়ার কবিরা একে দেশে সম্পূর্ণ বৈধব্যের যে করুণ দৃশ্য হয় তাকে রূপায়িত করেছেন। নজরুলের লেখাতেও তার ছায়া ও ধ্বনি এসে পড়েছে। মহররমের রণধ্বনিও এর সঙ্গে এসেছে,

"ড্রিম্ ড্রিম্ বাজে ঘন দুন্দুভি দামামা।
হাঁকে বীর শির দেগা, নেহি দেগা আমামা"।

নজরুলের সমস্ত লেখায় আরবী-ফারসী শব্দের লাগসই ব্যবহারের দৃষ্টান্ত তুলতে গেলে এক পুস্তক হয়ে যাবে। গান ও গজলে এর যা প্রকাশ, কেমন করে সঙ্গীতের সঙ্গে তাল রেখে অনুরূপ ভাষা ও শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার বিশ্লেষণ বিশেষজ্ঞের কাজ হলেও আমাদের কানেও তার স্বাদ খোওয়া যায় না। যাই হোক, এখন সাধারণ আলোচনাই করা যাক।

॥ দুই ॥

সাধারণভাবে আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু লেখা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না "...বখতিয়ার খিলজি ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ জয় করেন বটে। কিন্তু ফারসী মিসালে বঙ্গভাষার যে কিছু পরিবর্তন হইয়াছে তাহার অধিকাংশ আকবর শাহের সময়ে হয়। এই রূপ বেগগতিতে পরিবর্তন অস্বাভাবিক নহে। `সকল ভাষাতেই ইহা মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। ইহাকেই বিবাহের জল পেয়ে মেয়েরা যেরূপ বাড়ে তাহার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকের বাল্য হইতে কৈশোরে পরিবর্তন, বড় কম পরিবর্তন নহে।...

"কুমুদিনী দশ বৎসর বয়সে ঘর করিতে গেল, তিন বৎসর পরে পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিল। কুমুদিনীকে কি এখন চিনিতে পারা যায়? সেইরূপ মোগল সম্রাটগণের রাজত্বকালের প্রথম অবস্থার ভাষা ও আকবরের শেষ সময়ে চণ্ডীর ভাষা যে সেই একই কুমুদিনী, তাহা এক দৃষ্টি মাত্রেই উপলব্ধি না হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা একই ভাষা। নারী শরীরের প্রবাহিণী পুঞ্জের ন্যায় ভাষার প্রবাহিণীগুলিও একসময়ে পুষ্টিলাভের জন্য উন্মুখিনী হইয়া থাকে, কোন বিশেষ কারণে সেই ব্যস্ততার নিবারণ হয়, সেই অভাবের মোচন হয় ও অচিরাৎ ভাষার পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে।

"আকবর শাহের সময় যেমন বৈষ্ণব স্রোতে পারসী স্রোত আসিয়া ভাষাকে

এক নূতন পথে লইয়া যায়, এরূপ স্রোতে স্রোতোপাতও হইয়া থাকে। আকবর শাহের মৃত্যুর পর হইতে ভাষা এক গতিতে চলিতেছিল; রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় সংস্কৃতচর্চার প্রাবল্য নিবন্ধন কবিরঞ্জন ও তাঁহার হস্ত হইতে রায়গুণাকর যেমন গ্রহণ করিলেন ও কৃষ্ণনগরের পণ্ডিতগণে মিলিত হইয়া ভাষাকে এক নূতন স্রোতে ছাড়িয়া দিলেন কোথা হইতে এক ভয়ানক রাজ্য বিপ্লবরূপ স্রোতঃ আসিয়া, এমন কি, পঞ্চাশৎ বৎসরের মতো সকল স্রোত বন্ধ করিয়া রাখিল। ১৭৫২ অব্দে অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ শেষ হয়; ১৭৫৭ অব্দে পলাশীর বিপর্যয়। তাহার পর পঞ্চাশ বৎসর ভাষার উন্নতি অবনতি কিছুই হয় নাই। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতসকল বিরাজ করিয়াছেন, কিন্তু ভাষা মুখবন্ধ জলাশয়ের ন্যায় স্থির ভাব ছিল। উপপ্লব কর্তা রামমোহন রায় আসিয়া তাহার মুখ খুলিয়া দিলেন।·····" এরপর বঙ্কিম বর্তমানের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলেন যেসব কারণে একসময় ভাষার পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল সেরকম কারণের সূত্রপাত হয়েছে। পুনরায় আকবর শাহের পর অবস্থা আলোচনা করেন:

"আকবর শাহের সময়ে এইরূপ কারণে চণ্ডীর ভাষার ন্যায় ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। আকবর শাহের পরও ক্রমে ক্রমে নূতন নূতন কায়দা বাঙ্গালা অবয়বে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। একটি নামে দেখুন:

শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ও অলি জানবে শ্রীমত্যা রাইকিশোরী দেব্যা নাবালিগা জওজে ৺ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায় সাকিন তকিপপুর জেলা হুগলী পরগণা আরশা। বকলম শ্রীভৈরবচন্দ্র তরফদার, আমমোক্তার, সাং বেলডিহী, জেলা ২৪ গরগণা।

"ইহার সংস্কৃত অনুযায়ী বাঙ্গালা করিতে হইলে এইরূপ কিছু করিতে হইবে:—

'আরশা পরগণার অন্তর্গত ও হুগলী জেলার মধ্যে তকিপপুর গ্রামবাসী শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় যে মৃত ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের অপ্রাপ্ত ব্যবহার বিধবা বণিতা শ্রীমতী রাইকিশোরী দেবীর রক্ষক ও কার্যকারক আছেন, তাঁহার সেই কার্যকারস্বরূপে ও স্বকীয় সাধারণ প্রতিনিধি কর্মচারী জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বেলডিহি গ্রামবাসী আমি শ্রীভৈরবচন্দ্র তরফদার ঐ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের নাম তাঁহার স্বীয়পক্ষে ও কার্যকারত্বপক্ষে লিখিয়া দিলাম।' এরূপ করিলেও কেবল সংস্কৃতে বাঙ্গালী পণ্ডিতের বোধগম্য হইবে না। অন্য উদাহরণের প্রয়োজন নাই। পারসী ভাষায় বাংলার যে বিশেষ রূপান্তর হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

"আমরা গুটিকত পরির্তনের নির্দোষ করিয়া বাঙ্গলা ভাষা প্রবন্ধের এই ভাগের উপসংহার করিব।

(১) বিশেষণ পদ অনেক সময় বিশেষ্যের পদে বসিতেছে। যথা: শ্রীমতি রাইকিশোরী দেবী নাবালিগা। কানুন চাহারম।

(২) সম্বন্ধপদ সম্বন্ধের পরে বসিতেছে; যথা অলি জানবে অমুক—অমুকের পক্ষে কার্যকারক।

(৩) নূতন পদ্ধতির বহুবচন; যথা, নদীয়া জেলায় বলে মাগীন, ছোঁড়ান।

(৪) সাকিন, মোকাম, বকলম, বনাম, মারফত, দরুন, বাবতে প্রভৃতি বহুবিধ ও বহুসংখ্যক যোজক অব্যয় ভাষায় প্রবেশ করিয়া একটি বিস্তীর্ণ-ভাব ক্ষুদ্র একটি কথায় প্রকাশ করিতেছে।

(৫) তাহাতে ভাষা কিছু দৃঢ়বন্ধ হইয়াছে।

(৬) আক্কেল সেলামী, বেগারের দৌলৎ, হাকিম ফেরে হুকুম ফেরে না, প্রভৃতি ছোট ছোট বাক্য প্রবিষ্ট হইয়া ভাষার পুষ্টি সাধন করিয়াছে।

(৭) আধুনিক রাজকর্ম সম্পর্কীয় নানা পারসী শব্দ ভাষায় সংযুক্ত হইয়া বঙ্গভাষাকে অর্থকরী মূর্তি ধারণ করিবার উপযুক্ত করিয়াছে।

(৮) রূপাদি বর্ণনে ধারাবাহিক অত্যুক্তি কথন প্রথা প্রচারিত হইয়াছে; ঈশপ জেলেখা আদি গ্রন্থের রূপ বর্ণনের সহিত বিদ্যার রূপবর্ণন তুলনা করিবেন। আর কত পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা পারসীর পাঠক বিলক্ষণ জানেন।" (বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ, ১২৭৯)

বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন বলে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিলাম।

কিন্তু এখন তো শুধু আরবী ফারসীর প্রশ্ন নয়। আজ সারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ। তাছাড়া আজকের বিপুল জ্ঞান বিজ্ঞানের দাবীও আছে। সুতরাং আজকের অবস্থা যা তাগিদ দিচ্ছে, বঙ্কিমের ভাষায়, ভাষা এখন যে "পুষ্টি-লাভের জন্য উন্মুখিনী হইয়া" আছে, সে-পুষ্টিলাভের জন্য যা হওয়া উচিত তা কি হচ্ছে? সারা বিশ্বের ভাষা ও সংস্কৃতি সারা বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞান আমার মাতৃ-ভাষাকে শক্তিশালী করবে, এমন রূপে কি তাকে আমরা দেখতে পাব যাতে বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে অন্য ভাষা শিক্ষায় বঞ্চিত বাঙ্গালীও ম্যাকসিম গোর্কীর মতো কিংবা ফ্যারাডে, এডিসানের মতো শুধু মাতৃভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতির শীর্ষে উঠতে পারে? গত ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা কিসের সাক্ষ্য দিচ্ছে? আজকের সমাজের ধারা উপরের তলায় তাঁরা একদিকে নিজেদের সন্তানদের ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে

ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষা দিচ্ছেন এবং অন্যদিকে এক সঙ্কীর্ণ অনুদারতায় মাতৃভাষার প্রসার ও সমৃদ্ধিকে রুদ্ধ করে রেখে দিচ্ছেন। আরবী ফারসী শব্দের প্রতি বিরাগ এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীরই একটি দিক। সুতরাং এই প্রশ্নকেও আজ সেই বৃহত্তর পটভূমিকাতেই দেখতে হবে। সুতরাং এই প্রবন্ধের সূচনায় প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের উক্তির প্রতি পুনরায় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রবন্ধ শেষ করবো। "সাহিত্য বিচারকালে বিদেশী প্রভাব বা বিদেশী প্রকৃতির খোঁটা দিয়ে বর্ণ-সংকরতা বা ব্রাত্যতার তর্ক যেন তোলা না হয়।" নজরুল তো সারা জীবন ধরেই ঐরূপ সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর মহান সৃষ্টি বাঙ্গালীকে সেই আদর্শেই উদ্বুদ্ধ করে রাখবে।

কয়টা দিনের ফসল—কবি সুকান্ত

হঠাৎ ছলকে ওঠা প্রাণ। মনে এমনিই হয়েছিল—যখন জীবনটা শেষ হলো। পরিচয় হয়েছিল মাত্র কয়টা দিন—ছেলেটির সঙ্গে নয়, তার কবিতার সঙ্গে। কয়টা দিনই। না হয় হিসেব করে দেখা যাবে কয়টা বৎসর, কয়টা মাস—তবু কয়েকটা দিনই বলবো। বিশেষ করে তাদের কাছে যারা সে সময় দিনের পর দিন, মফঃস্বলের গ্রামে গ্রামে কখনও বা শহরের অলিতে গলিতে ঘুরি। সংস্কৃতির সংবাদ তখন ছিল মন্থর গতি। কলকাতায় যা ছলকে উঠতো তার খবর সেই তখনকার মফঃস্বলের বিরতিহীন কর্মচক্রে ঘূর্ণায়মান কর্মীদের কাছে পৌছাতে কমবেশী বিলম্ব ঘটতোই। সোভিয়েত-মৈত্রী সংঘ ও প্রগতি লেখক সংঘ মাধ্যমেই ছড়াতো। মফঃস্বলে 'পরিচয়' অপেক্ষা 'অরণির' প্রচার ছিল বেশী। তবু, স্বীকার করতে হবে ছাত্ররাই তখন ছিলেন এসবের প্রধান বাহক। তাঁদের মাধ্যমেই আমাদের অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠদের কানে পৌছাতো। এখন মেহনতী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। সৌভাগ্যবশতঃ শ্রমিক শ্রেণীর নিজ থাক থেকে ওঠা বুদ্ধিজীবী একটা অংশও সামনে এসেছেন। গঙ্গার দুই ধার ও রাজ্যের অন্যান্য শিল্পাঞ্চলগুলিতে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক জনমতের সমর্থক বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদীর) পত্রপত্রিকাগুলির প্রচার সংখ্যা দেখলেই বোঝা যায়। তখনকার দিনে, তাঁদের নানান কাজের মধ্যে এসব কাজে ছাত্ররাই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী। এই ভাবেই কখন যেন হঠাৎ শুনলাম এক সুতীব্র চীৎকার…মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলিত…উদ্ভাসিত…কিন্তু দুর্বোধ্য নয়। বয়স বাড়লেও তারুণ্যের সীমা তখনও আমরা অতিক্রম করিনি। সুতরাং "এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে" এ-বলার অধিকার লুপ্ত হয়নি। তবু এমন যদি হতো কয়টা বৎসর আগে আমরা যেমন ছিলাম তখনও আমরা তেমনই রয়ে গেছি তা হলে 'কালো অক্ষরের পরিচ্ছদে শোকযাত্রা' কেন, "ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা" এ সবও কল্পনা থেকে সুস্পষ্ট বাস্তবে এসে পৌছেছে, এমন মনে হতো না। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মানুষে মানুষে সম্পর্কের ওলট পালট, মাত্র দুচারটে বৎসরে আমাদের মানসিক জীবনে এমন একটা পরিবর্তন আনলো যা' তরুণ বয়সের প্রারম্ভেও ঘটেনি। অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে কবিচিত্ত থাকে যা কবি না হলেও কবির সৃষ্টির প্রতি আকৃষ্ট তা এই কয় বৎসরে এক ধরনের সাবালকত্বে

পৌঁছালো। বাস্তব অভিজ্ঞতার কঠোর আঘাতের অভাবে সেই পরিণতি যেন রুদ্ধ হয়েছিল। পুচ্ছটি তুলে নাচা, এদিন বহুদিন আগেই গিয়েছিল। ১৯২৬ সালের বিভেদের আঘাত অনেক কিছু স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছিল। দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার তখন সামনে। এ সব সত্ত্বেও জাতির প্রাণ জাগিয়ে রেখেছিল শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন, রাশিয়ার বিপ্লবের টুকরো টুকরো সংবাদ আর কিছু তরুণ কিশোরের অকাতর আত্মদান। কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার ব্যাপকতা না পেলেও আন্দোলন মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ জনগণের কাছে পৌঁছাচ্ছিল। যাই হোক, ত্রিশ সালের আন্দোলনের (যাতে উপরতলার বিভেদের অভিশাপ ভুলে জনগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং অগ্রগামী কর্মীরাও আরও উদ্দীপিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন) সব ভুলিয়ে দিল।

১৯৩০-৩২ সালের জাতীয় আন্দোলন, সেই আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকার ব্যর্থতার কারণের প্রতি আঙুল দেখিয়ে মার্কস্‌বাদের ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জনে সাহায্য করে। জনপ্রিয়তা অর্জন বলতে সহজবোধ্যতা বোঝায় না। তবু যা ভাসা ভাসা ছিল তা কেমন যেন জ্যামিতিক রেখার আভাষ দিচ্ছিল—যে-রেখার প্রতিটি বিন্দু স্থিতিশীল নয়, চঞ্চল। অর্থাৎ দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে যে পরিবর্তন-শীলতা তার একটা পরিচয় জেগে উঠছিল যদিও এ জাগারও ভাসাভাসা রূপ তখনও অতিক্রম করতে পারেনি। বাস্তবের ঠোকরে অর্জিত অভিজ্ঞতার সম্পদ দরকার ছিল। সেই সম্পদই ক্রমোত্তর পথের বাঁক দেখিয়ে দিল।

সাহিত্যে দ্বন্দ্বের পরিচয় রবীন্দ্রনাথের লেখাতেই ছিল—যদিচ তিনি তাকে দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখেন নি (উদাহরণ স্বরূপ, "দুঃখ", ১৯০৭ ; "তপোভঙ্গ", ১৯২৩)। তিনি দেখেছেন শুধু অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতায় অগ্রগতি, বৈপরীত্যের কোনও ভূমিকা দেখেননি। কিন্তু দুঃখ যখন "মানুষের জিজ্ঞাসাকে দুর্গম পথে ধাবিত করিতেছে, মানুষের ইচ্ছাকে দুর্ভেদ্য বাধার ভিতর দিয়া উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতেছে" তখন "দুর্গমতাই" বা কি আর "দুর্ভেদ্যতাই" বা কি? আর যে "উদ্ভিন্ন" হচ্ছে সেই বা কে? "দুঃখ" যাকে চালিকা শক্তি হিসেবে তিনি দেখছেন তাই বা কি? "বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসননাশন বারে বারে বাহিরিবে" (তপোভঙ্গ)—এর মধ্যেও কি তিনি ঠোকাঠুকির আভাষ এড়াতে পেরেছেন? "মোর ডাইনে শিশু সদ্যজাত, জরার মরা বামপাশে।" ("সৃষ্টি সুখের উল্লাসে", দোলনচাঁপা, নজরুল, ১৯২৩—বলা বাহুল্য, এ ডান-বাম রাজনৈতিক সঙ্কেত নয়, লোক প্রবাদের শুভযাত্রার লক্ষণ)। এইভাবে দ্বন্দ্বের বিকাশ সাহিত্যেও অগ্রসর হতে লাগলো। কমিউনিস্ট প্রভাব ও শ্রমিক-কৃষক

আন্দোলন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ধারা স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর রূপ পরিগ্রহ করতে লাগলো। যা "জরায় মরা" তার স্বরূপও কবিতায় এলো সুস্পষ্টভাবে—সাম্রাজ্যবাদ, জমিদার, মহাজন, পুঁজিপতি। বিশ দশকেই রূপটা পরিষ্কার হয়ে আসছিল। কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাব, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন ও সংগ্রামের রাজনীতির সঙ্গে তাল রেখে সাহিত্যেও দেখা দিচ্ছিল তার অভিব্যক্তি। নজরুলে তার বলিষ্ঠ প্রকাশ। অবশ্য রাজনীতিতেও তখন ধ্যান-ধারণা পরিষ্কার হয়ে উঠতে পারেনি। মার্কস্‌বাদের আভাষ পেলেও, রুশ বিপ্লবের আসল যে খবর শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখল তার খবর পেলেও পুরোপুরি তার বিকাশ ও পরিণতির কোনও পরিচয় আসেনি। স্বভাবতই কল্পনা ও আবেগকে তার অনেকখানি স্থান পূরণ করতে হয়েছিল। ফলে সাহিত্যেও তার চেয়ে বেশী অগ্রগতি সম্ভব হয়নি—যদিচ সেই অগ্রগতি কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ অগ্রগতি। নজরুলের রণধ্বনির কি প্রচণ্ড নাড়া দেওয়ার শক্তি। একথা ভোলার নয় যে একদিকে তাঁর লেখার যেমন অভাবনীয় ত্বরিতগতিতে জন-প্রিয়তা, অন্যদিকে উপরতলার বনেদী আসরের একাংশে তেমনই বুকের জ্বালা আর প্রতিরোধ। শ্রেণীস্বার্থ তার গোকুলের রাখালের বংশীধ্বনিতে উদীয়মান শত্রুকে চিনে নিতে ভুল করেনি। অথচ এও অস্বীকার করলে চলবে না, তাঁর লেখা যেহেতু প্রধানতঃ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদও তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারেনি।

ত্রিশ আর চল্লিশ দশকে রাজনীতির সচেতনতা বাড়লো, চৌহদ্দীও বাড়লো অনেকখানি। সে অগ্রগতির ছাপও পড়লো সাহিত্যে। সুকান্ত এই যুগের অর্থাৎ চল্লিশ দশকের শেষ স্বাক্ষর। কিন্তু সর্বশেষ হলেও জনমনে নিছক নিজগুণে ও গুরুত্বে তার স্থান হলো সর্বাগ্রে। যাঁরা এর মধ্যে দেখলেন 'কাঁচা লেখা,' তাঁরাও লক্ষ্য করলেন সেই লেখাই অনেক পাকা লেখাকে সরিয়ে সামনে এসে তার ন্যায্য ও স্বাভাবিক স্থান দখল করলো। সুকান্তর লেখার বিভিন্ন দিক নিয়ে অন্য লেখকরা লিখেছেন। সুতরাং আমি শুধু সুকান্তর বিষয়ে উত্থিত কিছু বিষয় সম্বন্ধে লিখব। সেটুকুতেই সীমিত থাকার চেষ্টা করবো।

নাগরিক উচ্চশিক্ষার অভিমানে যাঁরা উচ্চকিত—ভাষাটা কবি বিষ্ণু দের—তাঁদের উন্নাসিকতার শূন্য কলস তিনি তাঁদের একজনের সমালোচনার মাধ্যমে খুলে দেখিয়ে দিয়েছেন। জনসাধারণ নিজেদের সহজ বুদ্ধিতেই তাঁদের অবজ্ঞা করেছেন। অবশ্য জনসাধারণের নিকট সুখ্যাতি অপেক্ষা রাজার দরবারে সমাবিষ্ট 'হিং টিং ছট' বোঝা পণ্ডিতদের মাথা নাড়া সায় পেলে আর সে-দরবারের

অনুগ্রহ পেলেই তাঁরা সন্তুষ্ট। তারই কদর তাঁদের কাছে বেশী। ইংরাজীতে লেখা বুদ্ধদেব বসুর বাংলা সাহিত্য পরিক্রমায় সুকান্তর নাম উল্লেখ নেই। অথচ যেদেশের শিক্ষিতদের জন্য তাঁর বাংলা সাহিত্যের বিকৃত ইতিহাস নিবেদন সেই আমেরিকায় হয়তো দেখা যাবে কংগ্রেসের লাইব্রেরীতে তো নিশ্চয়ই যেখানেই বাংলা সাহিত্যের চর্চা আছে সেখানেই সুকান্তের স্থান।

"সুকান্তর আগের যুগের লোক ব'লে আমি পার্টিতে এসেছিলাম কবিতা ছেড়ে দিয়ে; আর সুকান্ত এসেছিল কবিতা নিয়ে। ফলে, কবিতাকে সে সহজেই রাজনীতির সঙ্গে মেলাতে পেরেছিল।"—লিখেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'সুকান্ত সমগ্রে'র ভূমিকায়। দেশের লোকের তো কথাই নেই, অন্যত্রও বাংলা সাহিত্য এবং রাজনীতি যাঁদের পরিচিত তাঁদের কাছে এটা আশ্চর্য কথা মনে হবে। এর মধ্যে ব্যক্ত অথচ অনুক্ত আছে আগের যুগে পার্টিতে আসতে হলে কবিতা ছেড়ে আসতে হতো। পরিবর্তনটা ঘটলো সুভাষদের সময়েই। আর তার সুযোগটা পেল সুকান্ত। আমাদের এক বড় গৌরব, বাংলাদেশে শ্রমিক কৃষক আন্দোলন ও কমিউনিস্ট আন্দোলন গোড়াতেই অন্যতম অগ্রগামী শক্তিশালী কবিকে পেয়েছিল তার উদ্যোক্তা ও সহায়কদের মধ্যে। নজরুল তো একাধারে কবি ও রাজনৈতিক কর্মী। তাছাড়া সমখ্যাতিসম্পন্ন না হলেও অন্যান্য লেখক ও সাহিত্যিকও ছিলেন, যাঁদের আনুকূল্য শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন পেয়েছে। গুণের বিচারের তর্ক এখানে ওঠে না। যশের কথাও উঠছে না। কবিকে কবিতা ছেড়ে আসতে হয়েছিল কিনা এটাই প্রশ্ন। আমরাও তো সুভাষের আগে এসেছিলাম। আমাদের কালের দয়ালকুমারকে কি কবিতা ছেড়ে পার্টিতে আসতে হয়েছিল? বরং আমাদের সে যুগের পরিবেশে, বিশেষ করে বর্ধমান ও হুগলীতে তাঁর কবিতা তো আমাদের কম সহায়ক হয়নি। খ্যাত অখ্যাত আরও অনেকের নাম হয়তো আরও অনেক এলাকায় আছে। আমরা ভুলবো কি করে? আর সেকালের পার্টির সীমিত ক্ষমতায় যা সাধ্য ছিল তা বিচার করে পার্টির বিরুদ্ধেই বা অভিযোগ গ্রহণ করব কি করে? সাম্রাজ্যবাদ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ধারকদের নিপেষণে পার্টির বা জনসাধারণের অনেক কিছু উদ্যোগই তো সময়ে সময়ে স্তব্ধ হয়েছে। 'আমার থেকেই শুরু' একথা বলার লোভ অনেকেই সামলাতে পারেন না। এ কি তারই দৃষ্টান্ত? সুভাষকে কবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করার অপরাধে রাজনীতিকে অপরাধী করেছিলেন বুদ্ধদেব আর তার উচিতমতো জবাব দিয়েছিলেন বিষ্ণু দে। সুভাষের উক্তি কি সেই জবাবের ওজনকে হাল্কা করে না? সুকান্তের

আবির্ভাবের সময় জনসাধারণ যা বুঝেছিলেন, আমরা যা বুঝেছিলাম, এখনও তাই বুঝি। সুকান্ত বাংলার এক গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী। সে শুধু শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন বা কমিউনিস্ট আন্দোলনের কথা নয়, সমগ্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসেই সে-ঐতিহ্যের স্বাক্ষর রয়ে গেছে। প্রতিভাকে যাঁরা প্রথম পরিচয়ে চিনতে পারেন এবং স্বীকৃতি দেন, তাঁদের এই কাজের মূল্য মানুষ নিশ্চয়ই দিবেন। কিন্তু সে-মূল্য শুধু সেইটুকুর জন্যই। প্রতিভার ধারক বা পূর্বসূরীদের ছাড়িয়ে যেতে চাইলে, যাঁরা পাঠক বা শ্রোতা তাঁদের মানসিক প্রতিরোধ সহজ ও স্বাভাবিক।

সাধারণ মানুষের ব্যাপক স্বীকৃতি যখন অপ্রতিরোধ্য হয় তখন শাসকশ্রেণীও স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে ধোলাইএর চেষ্টা। রবীন্দ্রনাথ নিঙড়ে শুধু ব্রহ্মতত্ত্বই বেরুতে থাকে, নজরুলের দেশের মাটির ধাতে আর কবিয়ালী ভঙ্গিমায় যখন যেমন ভূমিকা ও উপমা ধরে লেখাকে মূল বিপ্লবী সুর থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা, সুকান্তর লেখাকে কিশোরের চাপল্যের অভিব্যক্তিমতো দেখিয়ে 'থাকলে' ভবিষ্যতে কিরূপ পরিবর্তন হতো এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা। এসব কসরত অতীতে বহুবার হয়েছে; বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে হয়েছে। কিন্তু শেষে এই সব প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্য যাঁরা স্বেচ্ছায় ধোলাই হচ্ছেন এবং নিজের সুরও পাল্টাচ্ছেন তাঁদের কথা ভিন্ন। তাঁদেরও মানুষ চিনছে। পূর্বের সোনার ধান আনন্দে তুলে নিলেও তাঁদের বর্তমান লাগেজ ও তার মালিককে ফেলে দিয়ে তরী এগিয়ে যাচ্ছে।

"কেজো ক্রমে হচ্ছে অকেজো পলিটিক্সের পাঁশ ঠেলে"—এ অভিযোগ শুধু নজরুলের বিরুদ্ধে নয়। দেশে বিদেশে সব সময় এ অভিযোগ বর্ষিত হয়েছে প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে স্থিতাবস্থার সমর্থকদের। অনেক সুখ্যাত লেখকদের লেখায় এর সমুচিত উত্তরও সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। সুকান্তর ক্ষেত্রে যদি এ-অভিযোগ না উঠতো তাহলে তো বুঝতে হতো তিনি ক্ষমতাবান কবিই নন। তাঁর প্রতিভা ও সাফল্যের দ্যুতি সহজেই এরূপ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। একে এক ধরনের অভিনন্দন বলেই গ্রহণ করতে হবে।

"প্রকৃতিতে মুগ্ধ হওয়া কারণ প্রকৃতি মনোলোভা

* * * * *

বাঘের আগুনে ক্ষিপ্র খুশি লাগে,

আবার তাকাও অন্যদিকে

হরিণের নাচ দেখ, অথচ হরিণ বাঘের শিকার।

মানুষ হরিণ নয়, বাঘও নয়, ভাবাটাই
কবিত্বের চূড়ান্ত বিকার" (বিষ্ণু দে)

অথচ এই বিকারই পেয়ে বসে। হরিণ শুধু বাঘের শিকার নয়। শিকারীরও শিকার। শুনেছিলাম নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক কাহিনী বিপ্লবের লালনকারী এক পাঠাগারের সভায়, প্রায় ত্রিশ বছর আগে। রামের অভিষেকে অযোধ্যাবাসীর আনন্দ ধুমধাম। তপোবনেও সেই অবস্থা ঋষিপুত্র ও ঋষিকন্যাদের মাঝে। এই দেখে হরিণ শিশুরাও নাচতে লাগলো। বৃদ্ধ হরিণ তাদের স্মরণ করিয়ে দিল ক্ষত্রিয় রাজা হলেও মৃগয়া ছাড়ে না।

কবিত্বের এই চূড়ান্ত বিকার সুকান্তর ছিল না। ঐ কম বয়সেই বুঝেছিলেন তিনি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, মহারণ্যের প্রতিনিধি। "শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা।" সেই মহীরুহ শেষে "শিকড়ে শিকড়ে আনে অবাধ্য ফাটল উদ্ধত প্রাচীন সেই বনিয়াদী প্রাসাদের দেহে।"

যুদ্ধ, মহামারী, দাঙ্গা, মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে ওলট পালট করে দিচ্ছিল। সেইকালেই সুকান্তের কৈশোর থেকে যৌবনে পদক্ষেপ। এই প্রচুর ওলট পালটেও মানুষ অচলায়তন ভেঙ্গে পড়ার চিহ্ন ধরতে পারছেন না। অথচ এ যে ভেঙ্গে পড়বেই এবং তাঁদের চেষ্টাতেই ভাঙ্গবে এই দৃঢ় বিশ্বাস সুকান্তর কবিতা প্রতিটি মানুষের মনে সঞ্চারিত করেছে। আজও তাই প্রতিটি ছত্র পড়ি আর অবাক হয়ে ভাবি মাত্র একুশ বৎসরে সেই ছলকে ওঠা প্রাণ কি সম্পদই আমাদের দিয়ে গেল।

'বীণাপাণির বীণার তার'

"বীণাপাণির বীণার তার অনেক—কোনোটা সোনার কোনোটা তামার কোনোটা ইস্পাতের। সংসারের কণ্ঠে হালকা ও ভারী আনন্দের ও প্রমোদের সবরকমই সুর আছে। সবই তার বীণায় বাজে।" (রবীন্দ্রনাথ)[১] এই বৈচিত্র্যে আবার যোগ সাধকের হাত, তাঁদের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য। আমরা যারা নিতান্তই পাঠক বা শ্রোতা যদি এই সুরের ভিড়ে তাল হারিয়ে ফেলি, এমন কিছু আশ্চর্যের কথা নয়। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে হোক, অপ্রত্যক্ষভাবে হোক, মনে ছাপ একটা কিছু পড়ে। ধরুন, শোকে দুঃখে আমাদের মন বিষণ্ণ হোল। কবি ও সাহিত্যিকের মতো প্রকাশের ভাষা নেই। কবিদেরই কি আছে? শোকাহত এক কবিই তো দুঃখ করে বলেছিলেন: "ওয়ার্ড্‌স্ বাট্ হাফ কনসীল ইভীল"—শব্দ তো শুধু অর্ধেক প্রকাশ করে ও অর্ধেক গোপন করে।[২] যাহোক মনের এই বিষাদের অবস্থায় (বা অবস্থা নির্বিশেষে বিষাদের অভিজ্ঞতার যাচাইএ) শিল্পী ও সাহিত্যিকের সৃষ্টিতে যখন বিষণ্ণ সুর পাই, মন আচ্ছন্ন হয়। আবার আনন্দের সুর শুনলে আনন্দে অভিভূত হই। এ হলো আমাদের স্বভাব: শিল্প উপভোগের ক্ষেত্রে (মনের অগোচরে হলেও) যুগ যুগ ধরে চর্চার ফলে সংস্কৃতিও অর্জিত ও মার্জিত।

বিশ্লেষণের সুযোগ হয়তো আমাদের সকলের হয় না। ব্যবহারিক জীবনে ক্ষেত্রান্তরে বা পেশান্তরে মনোযোগ নিয়োজিত থাকার বাধ্যবাধকতা অনেকের ক্ষেত্রেই; ফলে, 'লোমহর্ষক' পাণ্ডিত্যের অধিকারী সমালোচক যেমন বিশ্লেষণ করেন, কমা, যতিচিহ্ন ইত্যাদি খুঁটিয়ে দেখে তাঁর নিজস্ব মতানুযায়ী অর্থ আমাদের সামনে বিস্তার করেন, সে-ক্ষমতা আমাদের হয়তো হয়ে ওঠে না। আবার সংবেদনশীল রচয়িতাগণ যেমনভাবে সহজ অর্থ সহজভাবে রাখার প্রয়াস করেন তাও হয়তো আমাদের নিজস্ব প্রয়াসে হয় না।

কিন্তু দুটো মোটা সুর আমাদের সকলের—অর্থাৎ পাঠক ও শ্রোতা মাত্রেরই—কানে ঠেকে। বুঝতে পারি, ধরতে পারি। দার্শনিক আকারে প্রশ্নের মতো সেটা রাখা যায়। ফুল ফোটার জন্যই মরে? কিংবা মরার জন্যই ফোটে? যুগ যুগ ধরে কাব্য সাহিত্যের ধারা নানান সুরের মধ্যে এই দুটি সুরকে বয়ে এনেছে। যেসব রচয়িতার চিন্তাধারা যথেষ্ট শৃঙ্খলিত হয়নি তাঁদের মধ্যে হয়তো একজনের মধ্যেই এই দুই পরস্পর বিরোধী প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক, একই ক্ষেত্রে না হলেও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে। কিন্তু যাঁরা নিজের

চিন্তাধারা শৃঙ্খলিত করে নিয়েছেন তাঁরা একটি ধারাকেই ধরে থাকেন। কেউ বলেন, ফুল ফোটার জন্যই মরে। ফোটার অবিচ্ছিন্ন ধারাটাই সত্যি। আবার কেউ বলেন, মরাটাই অবিচ্ছিন্ন, মরাটাই চিরন্তন। "ইয়ারাঁ কে বুদা-আন্দ্ নদানম্ কুজা শুদান্দ······আয় বাদে সবা গো কে আঁ হামা গুলহা গিয়া শুদান্দ্"। (বন্ধু যাঁরা ছিলেন জানি না তাঁরা কোথা, হে ভোরের বাতাস বলে দাও, সে-সব ফুল শুকিয়ে শুখনো ঘাস হয়ে গেছে।) কিন্তু ভোরের বাতাস এই বিষাদপূর্ণ বার্তার বাহক হবে কেন? সে তো সদা প্রস্ফুটনমুখী ফুলকেও দেখে যাচ্ছে। হাফিজ তো বলবেন—নসীমে সুবহগাহী শবনশীনানরা দাওয়া কর্দ্—ব্যথা বেদনায় যারা রাত জেগে আছে ভোরের হাওয়া তো তাদের ওষুধের কাজ করবে। সাদী বলবেন, দেখ, আনন্দে নাচতে গিয়ে আকাশেরও কোমর বেঁকেছে, তুমি বিষণ্ণ কেন? আফসুর্দা দিল আফসুর্দা কুনদ আঞ্জুমানেরা (বিষণ্ণ মন সমাবেশকেই বিষণ্ণ করে)।[৩] উঠে পড়, মানুষের মনে ভরসা দাও। কারও কাছে তাপদগ্ধ বৈশাখের ধ্বংসের রূপই আসল। কিন্তু অন্য কেউ সেই বিধ্বংসী রূপ বিস্মৃত না হয়েও, তাকে ছাড়িয়ে দেখেন—"জীর্ণ পুষ্প দল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে বাহিরায় ফল, পুরাতন পর্ণ পুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া, অপূর্ব আকারে, সদ্যস্নাত ঋজু শুভ্র মুক্ত জীবনের জয়ধ্বনিময়।" ··"শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊর্দ্ধে লয়ে যাও পঙ্ককুণ্ড হতে, মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি করে দাও মোরে বজ্রের আলোকে" তবু আমি আনন্দিত কারণ, দেখি "নবাঙ্কুর ইক্ষু-ক্ষেতে ঝরে বৃষ্টিধারা বিরাম বিহীন···সবলে তুমি হয়েছ প্রকাশ হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল, অক্লান্ত অম্লান।"[৪]

দুই কবি

ইংরাজী সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীতে দুই কবি এই দুই বিপরীত সুরের তীক্ষ্ণ সূচক হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। এঁদের নিদর্শন হিসেবে ধরার সুবিধে আছে। একজন ফিট্জ্‌জেরাল্ড (১৮৩৯-৮৩) আর একজন ব্রাউনিং (১৮১২-৮৯)। মৌলিক কাব্যখ্যাতিতে অবশ্য দুইজন সমান নয়। ব্রাউনিং উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন। কিন্তু যে-প্রসঙ্গে তাঁদের উল্লেখ করছি তাতে এই পরিমাপের প্রয়োজন নেই। উমর খৈয়ামের অনুবাদক হিসেবে ফিট্জ্-জেরাল্ডের পরিচয়ের ব্যাপ্তিও কম নয়। লক্ষ্য করা যাবে বৎসরকাল হিসেবে দুজনে সমসাময়িক। ইংলণ্ডে তখন বুর্জোয়া অগ্রগতির রবরবা। বাষ্পযন্ত্রের

উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগ, যানবাহনে রেল পথের আবির্ভাব ও বিস্তার, জাহাজেও বাষ্পশক্তির প্রয়োগ, নতুন নতুন শিল্প ও উৎপাদন প্রকরণের উদ্ভব বুর্জোয়া চিন্তাজগৎকে আশা উদ্দীপনায় উৎসাহিত করে রেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ও পুঁজি খাটানোর সুযোগ যেন অফুরন্ত —এ মনোভাব এসেছে। অভিজাত শ্রেণী বুর্জোয়া দলে মিশে পড়লেও তাঁদের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাঁদের বিলাপের সঙ্গে পুরাতনের প্রতি মোহগ্রস্ত বুদ্ধিজীবীরও বিলাপের সুর মিশেছে। ধনতন্ত্রে নির্মম ধ্বংসলীলা এই বিলাপের উপযোগী বাস্তব ক্ষেত্র হয়েছে। দুই কবির কাব্য কথা বিবেচনায় এই পশ্চাৎপটটা মনে রাখা ভাল।

দুজনেই আবার সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের। রুজির জন্য লেখার উপর নির্ভর করতে হয়নি। ব্রাউনিংকে আয়ের স্বল্পতার কষ্ট কিছুদিন ভোগ করতে হয়েছিল। তবু মোটামুটি সারা জীবন সুবিধার মধ্যেই কেটেছে। আর ফিট্‌জ্‌জেরাল্ডের জীবন নিস্তরঙ্গ সুখেরই। তাঁর নিজের ভাষাই উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "সাচ্ অ্যাজ লাইফ ইজ আই বিলীভ আই গট এ গুড এন্‌ড্ অব ইট।"[৫] অবিবাহিত থাকায় তাঁর প্রয়োজনও ছিল কম। জীবিকানির্বাহে একটা নিশ্চিত প্রাপ্তির ভরসা উভয়েরই ছিল।

ফিট্‌জ্‌জেরাল্ডের কবিতা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত ইরানের কবি উমরের রুবাইয়াতের অনুবাদ। তবু এই অনুবাদেও এক অপূর্ব মৌলিকত্ব এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে একথা সর্বজনস্বীকৃত।

উভয়ের অর্থাৎ ফিট্‌জ্‌জেরাল্ড ও ব্রাউনিং-এর জীবন উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত। ব্রাউনিং-এর পিতার আমদানী ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজে খাটানো পুঁজি থেকে। আর ফিট্‌জ্‌জেরাল্ডের বাবার পুঁজি খাটতো দেশের অভ্যন্তরেই খনি ইত্যাদিতে। ইংলণ্ডের তখনকার বুর্জোয়ার মানসিকতা পুত্রের চেয়ে পিতার মধ্যেই লক্ষিত। যন্ত্রশিল্প ও বিজ্ঞানের নতুন নতুন উদ্ভাবন ও তার নিয়োগ সে বুর্জোয়ার দিবারাত্রির স্বপ্নে। শুধু পুঁজি খাটানোর নেশাই প্রধান নয়, যদিচ উদ্যোগের উৎস সেটাই। ফিট্‌জ্‌জেরাল্ডের বাবাকে মরার সময় ভগবানের নাম করতে শোনা যায়নি। শোনা গেল শুধু একটা অস্পষ্ট বাক্য—"দ্যাট ইঞ্জিন উইল ওয়ার্ক্"। কয়লা বওয়ার জন্য নতুন প্রচলিত একটা স্টীম ইঞ্জিন তিনি তাঁর খনিতে লাগিয়েছিলেন আর তার পরীক্ষাতেই সে সময় নিয়োজিত ছিলেন। সেই ইঞ্জিনটা কাজ করবে এ বিশ্বাস তাঁর মনে এসেছে।

অথচ পুত্রের চরিত্র ঠিক এ রকম নয়। ইঞ্জিন বস্তুটাই আবার তাঁর কাছে ছিল অবাঞ্ছনীয়।

এক চিঠিতে এক সুন্দর পল্লীচিত্রের বর্ণনা করে তিনি বলছেন "এখানে আবার রেল রোড নিয়ে যাওয়ার কথা হচ্ছে, খুবই দুঃখের কথা। কিন্তু ধনের দেবতা ম্যামন তো অন্ধ"।[৬] শ্রেণী দৃষ্টিতে তাঁর আকর্ষণ পুরানো ইংলণ্ড, তার অভিজর্ত, তার "ভিলেজ জেন্ট্রি" ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতোই ইংলণ্ডের পুরানো সমাজের উপর একটা মোহ রয়ে গেছে। "নেভার ওয়াজ দেয়ার সাচ্ এ জেন্ট্রি অ্যাজ দি ইংলিশ জেন্ট্রি। দে উইল বি দি ডিসটিংগুইসিং মার্ক অব ইংল্যাণ্ড ইন হিসট্রি"।[৭] আবার এ ভয়ও আছে যে ম্যানুফ্যাকচার আর ইণ্ডাষ্ট্রির অবাধ প্রসার সঙ্কট আমন্ত্রণ করবে। পণ্য বিক্রী হবে না। উপনিবেশগুলো চাঁট মারতে শুরু করবে। তখন যাবো কোথায়? তাঁর মনোভাব সব চেয়ে পরিষ্কার হয়ে যায় ফ্রান্সের ১৮৪৮ সালের এবং ১৮৭০-৭১ সালের বিপ্লবে। তিনি ফ্রান্সের অধিবাসীদের উপর বিরক্ত; তারা রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনা করতে অক্ষম। সুতরাং অন্য সব শক্তিশালী দেশ ফ্রান্সটাকে ভাগাভাগি করে নিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে তাই ভাল।[৮] অথচ আভ্যন্তরীণ কোনও রাজনীতির কথা উঠলেই তিনি বলছেন, পাবলিক ম্যাটারসে আমি নাক গলাই না।[৯]

সাধারণভাবে তাঁর (ফিট্জ্জেরাল্ডের) লেখার চরিত্র সম্বন্ধে ব্রাউনিং-এর কোনও বক্তব্য ছিল কিনা আমার জানা নেই যদিচ তাঁর রচিত কাব্যে—বিশেষ করে র‍্যাব্বি বেন্ এজরা কবিতায় (ফিট্জ্জেরাল্ড কর্তৃক) উমরের অনুবাদে প্রতিফলিত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর জবাব দিয়েছেন কিন্তু ব্রাউনিং-এর লেখা সম্বন্ধে ফিট্জ্জেরাল্ডের মন্তব্য —"ইট ইজ ওয়ান অব দি অ্যাবসার্ডেস্ট থিংস রিটন্ বাই এ গিফটেড ম্যান।" ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ কোয়ার্টারে লণ্ডন শহরে শ্রমিকশ্রেণী ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কবি শেলীর জনপ্রিয়তা বাড়ে। ফিট্জ্জেরাল্ড এতে উষ্মা প্রকাশ করে তাঁর মতানুযায়ী শেলীর তুচ্ছতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[১০]

উমরের সম্বন্ধে বা ফিট্জ্জেরাল্ডের প্রতিভায় উমর যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছেন সে-সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন—

"তাঁর চোখে এই সত্য ধরা পড়েছিল যে এ বিশ্বের হৃদয়ে অন্তর নেই, মন নেই। এ জগৎ অন্ধ নিয়তির অধীন, সুতরাং তার ভিতর বাহির দুই সমান অর্থহীন, সমান মিছা। তিনি আবিষ্কার করেছেন যে 'ঊর্ধ্বে অধে ভিতর বাহির, দেখছে যেসব মিথ্যা ফাঁক / ক্ষণিক এসব ছায়াবাজী পুতুল নাচের ব্যর্থ জাঁক।"[১১]

অবশ্য ফিট্‌জ্‌জেরাল্ডের অনুবাদ সর্বতোভাবে চ্যালেঞ্জ না করলেও, উমরের ফার্সীটা পড়লে, কোথায় যেন ফাঁক রয়েছে, কোথায় যেন বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য থেকে গেছে এ রকম একটা অস্বস্তি থাকে। তার কারণ কিছুটা পাওয়া যাবে জনশ্রুতির ইতিহাসে এবং সমকালীন বা কাছাকাছি কালের লেখকদের লেখায়। তাঁদের ধারণা উমর সংশয়বাদী নয়, পুরোপুরি নাস্তিক, সুফীবাদের ভাষায় নিজেকে আড়াল করতে চেয়েছেন।[১২] তিনি ছিলেন প্রধানতঃ গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী। জ্যোতিষ জানলেও এবং দু এক ক্ষেত্রে আমীর ওমরাহ্ বা রাজা বাদশাদের অনুরোধের পীড়নে জ্যোতিষের কাজ দু একটা করে দিলেও, এ-সবে বিশ্বাস করতেন না। জ্যোতির্বিদ্যার তখনকার জ্ঞাত আকাশরহস্য, সৌরমণ্ডলীর পরিচিত জ্যোতিষ্কগুলির নিয়ম শৃঙ্খলায় আবদ্ধ গতি ও আচরণ তাঁকে নিয়মে আবদ্ধ জগতে বিশ্বাসী করেছিল। অবশ্য ফার্সী কাব্যে ও সুফীদের অনেকের মধ্যে সংশয়বাদ একটা বড় স্থান দখল করে থেকেছে। হাফেজের ভাষায় :

"কস্ নগ্‌শায়দ ও নগশায়দ
বহিকমত ঈ মুআম্মারা" [১৩]

এ বিশ্বরহস্য বুদ্ধি দিয়ে কেউ উন্মোচন করতে পারবে না। তার চেয়ে "হৃদীস আজ্ মতরব ও ময় গো।" শরাব সঙ্গীতেই মশগুল থাক। বৈজ্ঞানিক ও গণিতজ্ঞ উমরের ক্ষেত্রে কিন্তু জনশ্রুতিতে প্রচলিত ধারণা সঠিকতর একথা ভাবার কারণ আছে। ধরুন, এই রুবাইটার বক্তব্য :—

"Ah Love ! Could thou and I conspire
To grasp this sorry scheme of things entire
Would we not shatter it to bits
And then remould it nearer
to our heart's desire !"

যার, কান্তি ঘোষ বাংলা করেছেন "নিয়ৎ দেবীর চরকাসুতোর ধরতে পারি খেইটা আজ,/ভাগ্য সাথে ষড়্ করে তার ঢুকতে পারি দুয়ার মাঝ/নিঠুর পায়ে চূর্ণ করি বিশ্ব-সৃজন-কল্পনায়, নূতন সৃষ্টি গ'ড়তে প্রিয়া পারব নাকি দুই জনায়।" এর মধ্যে সৃষ্টিটা যে ভুলে ভরা এ-রায়টাও যেমন আছে, একটা আকুল কামনা আছে সেটা নতুন করে গড়ার। 'অজ্ঞানতার' স্বীকৃতি যেমন আছে, যদি 'জ্ঞেয়' করা যেতো এ প্রশ্নে, "অজ্ঞাত অজ্ঞেয় নাও হতে পারে" এ আশাও যেন মনের মধ্যে দুলছে।

তবু উমরের এ সুর রয়ে গেছে "সুজন বোঁটায় আর ফোটেনা ঝরলে পরে আয়ুর ফুল"।

কিন্তু প্রতিদিনের নূতনের আবির্ভাবে উৎসাহিত, মৃত্যুমুখে মানুষ নূতন ইঞ্জিনটার কথা ভাবে, সেই দুনিয়ায় ফিট্জ্‌জেরাল্ডের এই বিমর্ষ বাণী কেন?

আমার মনে হয় এইখানে তাঁর ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের সঙ্গে ফারাক। ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের কবিতায় যে-সমাজ ভেঙ্গে যাচ্ছে তার জন্যে ব্যথা বেদনা যথেষ্ট। গরীবের জন্যেও দুঃখ। কিন্তু দোষটা কার, এই প্রশ্নে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের উত্তর হচ্ছে দোষটা গরীবের। জমি বেচতে হলো কেন? নির্বুদ্ধিতা ও লোভের কারণে ('রিপেনটেনস')। গরীবের ছেলে অসৎ অভ্যাসের দরুনই নিজেকে ধ্বংস করে ('মাইকেল')। ফিট্‌জ্‌জেরাল্ড কিন্তু নূতন ধনীদের দোষারোপ করছেন। ধনলিপ্সার প্রতীক ধনের দেবতা ম্যামনকে দায়ী করছেন। দুজনেই বিপ্লব বিরোধী, ধনতান্ত্রিক সমাজের পরিবর্তে পুরাতন সমাজের প্রতি মোহগ্রস্ত। তবু ফিট্‌জ্‌জেরাল্ডের মনে যেন একটা দ্বন্দ্ব আছে। তিনি গরীবের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বেরিয়ে যেতে চান না—তিনি জানেন লাইফ অ্যাজ ইট ইজ, তার গুড এন্‌ড্‌টাই তাঁর ভাগ্যে পড়েছে। অন্য যাঁদের ভাগ্যে পড়েনি তাঁদের সঙ্গে পার্থক্যে মনে অস্বস্তিটা আছে। তাই নিয়তির ঘাড়ে দোষটা চাপিয়ে এড়িয়ে যেতে চান। সুতরাং মরা ফুল ফোটানোর আশা ও উদ্যম কোনটাই তাঁর নাই।

আশাবাদের কবি

ব্রাউনিং কিন্তু সদাই আশার বাণী রাখছেন সামনে। ইংরাজীতে যাকে বলে ইনকিউরেবল অপটিমিস্ট। ভিক্টোরিয়ান যুগের মানুষরা তাঁকে পছন্দ করতো। কেন? উত্তরে সমালোচক বলছেন:

"What they liked best about him was his admirable optimism and heartiness, his assurance that apparent failure may be success in the eyes of heaven."

তাঁর প্রশংসনীয় আশাবাদ এবং অন্তরের স্ফূর্তি, বিফল হলেও সে-বিফলতা স্বর্গের চোখে ভবিষ্যতের সাফল্যের সূচক—এরকম একটা আশাবাদের ধ্বনি।[১৪]

তাঁর ক্ষেত্রে পত্রাদি উল্লেখের প্রয়োজন হয় না। কারণ, তাঁর কবিতাই তাঁর মর্মকথা প্রকাশ করে।

ইউরোপ তখন রেনেশাঁ হয়ে ফরাসী বিপ্লবে ব্যাপক রূপান্তর ঘটিয়ে এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে শিল্পবিপ্লব সেই রূপান্তরে দ্রুত বিস্তার ও উন্নয়ন ঘটিয়েছে।

উদীয়মান বুর্জোয়ার বুক জুড়ে তখন আশা ও উদ্দীপনা। যন্ত্র-কৌশল এবং বিজ্ঞানের নতুন নতুন সাফল্য এবং চতুর্দিকে ভরসার বাণী "ছাট ইঞ্জিন উইল ওয়ার্ক"।

শ্রমিক শ্রেণী এসেছেন। তাঁর সঙ্গে এসেছেন তাঁর বুদ্ধিজীবী যাঁরা নতুন নতুন সংগ্রামে অর্জিত আইনের অধিকারে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ তখনও বুর্জোয়া সমাজের অগ্রগামী ভূমিকার জোর জোয়ার না থাকলেও আজকের মতো সম্পূর্ণ ভাটার টান পড়েনি।

গ্রামারিয়ান্স্ ফিউনারেল কবিতা এই ধারার এক বিশেষ পরিচায়ক। রেনেশাঁর যুগের অধ্যবসায়ী পণ্ডিত, গবেষক, জীবন যৌবন সব ঢেলে দিয়েছেন জ্ঞানের সন্ধানে। "দিস ম্যান ডিসাইডেড নট টু লিভ বাট নো—এ মানুষ বাঁচতে চায়নি, জানতে চেয়েছিল বা জানার জন্যই তার বাঁচা"। অজ্ঞাত অজ্ঞেয় নয় এই দৃঢ় ভরসা নিয়েই সে সেই জ্ঞানের সন্ধানে, নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছে। "হি গ্রাপ্‌লড উইথ দি ওয়ার্লড বেণ্ট্ অন এসকেপিং" বিশ্ব তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু সে ঝাপটে ধরে তাকে ফসকে বেরিয়ে যেতে দেবে না। বিশ্বরহস্য উদ্ঘাটিত করবেই, ছাড়বে না। এই জন্যই তো গ্রাপলিং। এ হচ্ছে সেই যুগের বুর্জোয়া অগ্রগামীদের ডঙ্কা। যা এখন তাদের কুৎসিত অবক্ষয়ের হাত থেকে খসে পড়ে সুস্থ সবল শ্রমিক শ্রেণীর হাতে পড়েছে।

এই আশার বাণী ব্রাউনিং-এর র‍্যাব্বি বেন এজরা কবিতায় :

> "Then welcome each rebuff
> That turns earth's smoothness rough
> Each sting that bids
> Not sit nor stand—but go!"

বিপ্লব বিদ্রোহেও তিনি আতঙ্কিত নন। তাই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বিরুদ্ধে জোর গলায় বলতে পেরেছিলেন : "জাস্ট্ ফর এ হ্যাণ্ডফুল অব সিলভার হি লেফ্‌ট আস"। এই প্রসিদ্ধ কবিতা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-কর্তৃক ফরাসী বিপ্লবের নিন্দার যথার্থ পুরস্কার। আর বিদ্রোহের কবি শেলীর পিছনে শেলীর সারিতে তিনি দাঁড়াচ্ছেন। "ইটালিয়ান ইন ইংলণ্ড" প্রভৃতি কবিতার মতো কবিতায়—অধীন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতি অভিনন্দনও পাওয়া যাবে।

কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় ব্রাউনিং-এর চিত্রিত চরিত্র বলিষ্ঠ হলেও ব্যক্তির একক অগ্রাভিযান, জাগরণের অনুভব হলেও একক জাগরণ, আহ্বান হলেও ব্যক্তিকে আহ্বান। এজগতের সংগ্রাম কি? "মেশিনারি জাস্ট্ মেণ্ট টু গিভ

দাই সোল দাই বেণ্ট্, ট্রাই দি অ্যাণ্ড টার্ন্ দি ফোর্থ সাফিসিয়েণ্টলি ইমপ্রেস্‌ড্।" ১৫

পুরোনো সামন্ত যুগের ধ্বংসের মুখে দিল্লীর এক দিকের অবক্ষয় আর এক দিকের ধ্বংসলীলার মাঝে দাঁড়িয়ে ভারতের কবি মুহ্যমান মানুষের বুকে সেই আশার ধ্বনি আনার চেষ্টা করেছিলেন। "এলাওয়া ঈদ কে মিলতি হয় আওর দিন ভি শারাব" ঈদের দিন খুশীর দিন ছাড়াও শারাব পাওয়া যায়। উদ্দীপনার ভিক্ষাপ্রার্থী যে সে কখনও বঞ্চিত হবে না। বলে গিয়েছিলেন "এখন দেখছ আমি কর্জ করে সুরা পান করেছি, কিন্তু আমি জানি আমার এই উপোস পেটের উন্মত্ততা একদিন না একদিন জীবনে রং নিয়ে আসবে।" ১৬

১৮৫৭র বিদ্রোহের আগের কবি মীর বলে গিয়েছিলেন, "আয়্ শোরে কেয়ামত গর্ ইস রাহসে জানা তো মুঝকোভি জাগা জানা—হে প্রলয়ের শোর যদি এ পথে যাও আমাকেও জাগিয়ে যেও।" যে প্রলয় এসেছিল, ইংরেজের নিয়োজিত ভারতের কৃষকের সন্তান বিদ্রোহী সিপাহী যখন অভ্যুত্থান ঘটালো শহরের বুকে তার ঢেউ এসে পড়লো, যে শ্রেণী তাকে অভিনন্দন করে নিয়ে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার বিপ্লব গঠন করবে সেই শ্রমিকশ্রেণী তখনও ইতিহাসের মঞ্চে এসে হাজির হয়নি। বুর্জোয়ার স্বরও ক্ষীণ।

গণজীবনের শক্তির অনুভূতি

কিন্তু তবু মীরের কামনা সফল হয়েছিল বৈকি। প্রলয়ের সেই শোর জাগরণের সাড়া এনেছিল সমস্ত ভারতে। এ সাড়া বুঝতে পেরেছে বিষাদের ক্ষেত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায়। বিদেশীর শাসনে নিপীড়িত ভারতবাসীর মন তখন দলবদ্ধ সিপাহির স্বাধীনতা সংগ্রামে আশার আলো দেখতে পেয়েছে, "কোটরে বাস" ছেড়ে বৃহত্তর ব্যাপকতর মিলনে শক্তির উৎসের স্বাদ গ্রহণে আগ্রহী হয়েছে। "রোদন, রোদন, কেবলি রোদন কেবলি বিষাদস্বাদ / শুকায়ে, শুকায়ে, শরীর গুটায়ে কেবলি কোটরে বাস।······আজিকে বারেক ভ্রমরের মতো বাহির হইয়া আয় /····· চারিদিকে তোর প্রাণের লহরী উথলি উথলি যায়" (আহ্বান সঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথ।) "এ জগতে কিছুই মরে না"—এই স্থির সিদ্ধান্ত এসেছে (অনন্তজীবন, প্র স. রবীন্দ্রনাথ)। "মরণ বাড়িবে যত······বাড়িবে প্রাণের অধিকার।" (অনন্ত মরণ, প্র. স রবীন্দ্রনাথ) সুতরাং "জগৎ দেখিতে হইব বাহির, আজিকে করেছি মনে, দেখিব না আর নিজেরি স্বপন বসিয়া গুহার

কোণে।……যত দেব প্রাণ, বহে যাবে প্রাণ ফুরাবে না আর প্রাণ" (নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, প্র. স. ঐ)

কবি-জীবনের প্রথমেই যা দেখেছিলাম স্পষ্টতরভাবে দেখলাম মানসীতে। শুধু কি একজন বীরের পাদস্পর্শ—শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শ অহল্যাকে জাগাবে? অহল্যা কি এতই মৃত? কবির মন তা মানতে চায় না।

"লক্ষ কোটি পরাণির-মিলন, কলহ—আনন্দ বিক্ষুব্ধ ক্রন্দন, গর্জন, অযুত পান্থের পদধ্বনি অনুক্ষণ পশিত কি অভিশাপ নিদ্রা ভেদ করে, জাগাইয়া রাখিত কি তোরে নেত্রহীন মূঢ়রূঢ় অর্ধজাগরণে?……জীবন উৎসাহ ছুটিত সহস্র পথে মরুদিগ্বিজয়ে সহস্র আকারে উঠিত সে ক্ষুব্ধ হয়ে তোমার পাষাণ ঘেরি করিতে নিপাত অনুর্বর অভিশাপ তব; সে-আঘাতে জাগাত কি জীবনের কম্পতর দেহে?" ব্যাপকতর সমাবেশের সঙ্গে মিলনের মধ্যে জীবনের সেই কম্প, সেই চাঞ্চল্য অনুভূত। তাই মিলনের ব্যাকুলতা—

"বিদারিয়া, এ
বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণবদ্ধ
সঙ্কীর্ণ প্রাচীর, আপনার
নিরানন্দ অন্ধ কারাগার
—হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া,
বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া
শিহরিয়া, সচকিয়া
আলোকে পুলকে, প্রবাহে
চলে যাই সমস্ত ভূলোকে।"
(বসুন্ধরা, সোনার তরী, রবীন্দ্রনাথ)

সুতরাং "এবার ফিরাও মোরে"-তে যে-আবেদন সে বিচ্ছিন্নও নয়, ব্যতিক্রমও নয়। বলিষ্ঠতর, সুস্পষ্টতর রূপ। জনজীবনও যেমন আরও সচেতন, কবিও তেমনই অগ্রসর। 'কোন হাটে তুই বিকোতে চাস ওরে আমার প্রাণ?……বিশ্ববাসীর ধ্বনির মাঝে যেতে কি সাধ আছে? হঠাৎ উঠে উচ্ছসিয়া কহে আমার গান—সেইখানে মোর স্থান।" (যথাস্থান, ক্ষণিকা, ঐ) 'বলাকায়" এসে "বান ডেকেছে, জোয়ার-জলে উঠছে প্রাণের ঢেউ"। "পলকে পলকে মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।" দেশের মাটির উত্তাপ ক্রমোত্তর তাঁর নিবিড় পরিচয়কে নিবিড়তর করছে, কৈশোরের দৃঢ় আস্থাকে দৃঢ়তর

করছে। "মাটির আঁধার নীচে কে জানে ঠিকানা, মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।" এই লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা, "পূরবীতে" শ্যামবহ্নি শিখা —"জ্বেলে দিল অরণ্য বীথিকা শ্যামবহ্নি শিখা।"

এ-উদ্ধৃতির শেষ করা যায় না। তাই নিপীড়ক শত্রুর বিভীষিকার দাপটের মুখে ছুঁড়ে দেওয়া "মৃত্যুঞ্জয়" কবির 'শেষকথা' দিয়েই এ-প্রসঙ্গে শেষ করি। "যত বড় হও, তুমি তো মৃত্যু চেয়ে বড় নও, আমি মৃত্যু চেয়ে বড়।"

নজরুল সুকান্তর কাব্যেও এই মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনের সুর।

দেশের মানুষ প্রবন্ধের প্রারম্ভে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের বীণাপানির তারের উপমায় মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনের আবাহনের তারকেই আপন একান্ত প্রিয় তার বলে বেছে নিয়েছে।

---

(১) অবতরণিকা, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ড (২) টেনিসান—ইন মেমোরিয়াম (৩) দিওয়ানে হাফিজ (৪) বর্ষশেষ, রবীন্দ্রনাথ (৫) জন এলেনকে লেখা চিঠি ১৮-৪-১৮৩৯ (৬) বারটনকে লেখা চিঠি ১১-৪-১৮৪০ (৭) টেনিসানের ভ্রাতা এফ. টেনিসানকে লেখা চিঠি ৭-৬-১৮৪০ (৮) এলেনকে লেখা ২-৩-১৮৩৮ (৯) কাওয়েলকে লেখা ২২-১-১৮৫৭ (১০) এফ. টেনিসানকে ৮-৩-১৮৭৮ (১১) কান্তি ঘোষের ভূমিকায় (১২) ব্রাউন-লিটারারি হিস্ট্রি অব পার্শিয়া (১৩) দিওয়ান (১৪) ব্রাউনিং-এর 'মেন্-অ্যাণ্ড উইমেন' কাব্যে সম্পাদক পল টার্নারের ভূমিকা (১৫) র‍্যাব্বি বেন এজরা (১৬) গালিবের দিওয়ান।

নারী ঃ অবদমন, প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য ও কুটিল খেলা

"পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ ?"

শব্দ কয়টি খুবই সুপরিচিত। শুনলে বা পড়লে শ্রোতা বা পাঠকের সামনে একটি ছবিই ফুটে ওঠে। নবকুমার "ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব মূর্তি··· সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি। কেশভার আবেণী-সংবদ্ধ সংসর্পিত, রাশিকৃত, আগুল্ফলম্বিত কেশভার—তদগ্রে দেহরত্ন।··· বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ময়। সে-কটাক্ষ এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণ-লেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। নবকুমার এইরূপ দুর্গম মধ্যে দেবীমূর্তি দেখিয়া নিস্পন্দশরীর হইয়া দাঁড়াইলেন।···স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। রমণীও অনিমেষলোচনে বিশাল চক্ষুর স্থির দৃষ্টি নবকুমারের মুখে স্তব্ধ করিয়া রাখিলেন।" কিন্তু নবকুমার এবং কপালকুণ্ডলার দৃষ্টির মধ্যে প্রভেদ কি ? কবি বলছেন—"উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে নবকুমারের দৃষ্টি চমকিত দৃষ্টির ন্যায়। রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ বিন্দুমাত্র নাই···"

এই সামান্য কয়টি লাইনে বঙ্কিমচন্দ্র যেন তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'কপাল-কুণ্ডলার' সমগ্র কাহিনীর পূর্বাভাষ দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—"রমণীর দৃষ্টিতে সে-লক্ষণ কিছুমাত্র নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পর পর উপন্যাসে নারীচরিত্র সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। এক হিসেবে দেখতে গেলে এ যেন পরের পর এক পরীক্ষানিরীক্ষা। কপালকুণ্ডলায় তিনি যেন আশৈশব সমাজ-বিচ্ছিন্ন এক কন্যা কি রূপ গ্রহণ করতে পারে তারই ছবি আঁকার চেষ্টা করেছেন। (সেই জন্যই উল্লেখিত অপলক দৃষ্টি—যা ব্রীড়া-লাঞ্ছিত নয়।)

প্রাণীর বিবর্তন বোঝাবার জন্য এক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। পক্ষিরাজ ঘোড়া ? চেষ্টা করে দেখো, হয় কিনা। মুখটা তো ছুঁচলো হওয়া চাই। তা না হলে বাতাসের বাধা লাগবে। ডানা তো থাকবেই। সামনের পা ডানা হবে, কিন্তু পাগুলো ওরকম নড়বড় করে ঝুলতে থাকলে তো চলবে না গুটিয়ে পেটের নিকট সিঁধিয়ে নিতে হবে! লেজটাতে গতি নির্দেশের জন্য পাখার মতো বিস্তার ঘটাতে হবে। এ রকম করে রূপ দিতে দিতে যা দাঁড়াবে সে আর ঘোড়া নয়। সে হয়ে দাঁড়াবে পাখী, যদিচ বড় ধরনের পাখী। শিল্পীর ক্ষেত্রেও দেখা যায় তাঁকে একটা প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে আর একটা প্রয়োজনীয়তার

সঙ্গতি রাখার চেষ্টা করে যেতে হয়। এই প্রয়াসে অনেক সময় তিনি জ্ঞাতে হোক অজ্ঞাতে হোক বাস্তব অবস্থার দিকে আঙুল দেখিয়ে দেন। তাঁর পরিকল্পনায় যাই থাকুক আরো কিছু করে বসে থাকেন।

অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে বলিলেন,—"এ ব্যক্তি অপরিচিত যুবতী সঙ্গে লইয়া যাইবে, লোকালয়ে লজ্জা পাইবে। তোমাকেও লোকে ঘৃণা করিবে।" (তুলনা করুন, মহাভারত-আদিপর্ব ৭৩তম অধ্যায়, গান্ধর্ব বিবাহান্তে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে "আমি চতুরঙ্গিনী সেনা পাঠাইয়া তোমাকে নগরে লইয়া যাইব।") সুতরাং অধিকারী নবকুমারের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। "কপালকুণ্ডলা বলিতে লাগিলেন : 'বিবাহের নাম ত তোমাদিগের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে?' অধিকারী বুঝালেন, বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম ইত্যাদি। 'অধিকারী মনে করিলেন, সকলই বুঝাইলেন। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন সকলই বুঝিলেন।'…" এ বোঝা বা বোঝানোর বিবরণেই লেখকের চাপা শ্লেষ আছে। এ-বোঝা যে ঠিক মতো বোঝা হয়নি উপন্যাসের বাকী অংশে ঔপন্যাসিকের সেইটে বোঝানোরই একান্ত চেষ্টা। কপালকুণ্ডলার মুক্তসত্তাকে রূপ দিতে গিয়ে ধন-সম্পত্তি, অধিকার, possession, মালিকানা এসব সম্বন্ধে তার সম্পূর্ণ বিকারহীনতার উপর লেখককে জোর দিতে হয়েছে! পথে কপালকুণ্ডলাকে মতিবিবি গহনা দিয়েছিলেন। যাজ্ঞাকারী ভিখারীকে কপর্দকহীন "কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন : 'গহনা পাইলে তুমি সন্তুষ্ট হও?'…কপালকুণ্ডলা অকপট হৃদয়ে কৌটা সমেত সকল গহনাগুলি ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন।…" ফুলের মালায় সজ্জিত শকুন্তলার ক্ষেত্রে ফুলের মালাটা গহনায় রূপান্তরিত হবার অপেক্ষা রাখে যদিও ঘটনায় সে-রূপান্তরে বিলম্ব হয়েছিল। কিন্তু 'নিরাভরণা' কপালকুণ্ডলার শুধু আভরণের সম্বন্ধেই জ্ঞান নেই তা নয়, তার মালিকানা, তার possession, সম্পত্তি বিষয়টা সম্বন্ধেই তার জ্ঞান নেই। দুর্ভাগ্যটা এই যে যে-মানুষের সম্পত্তি সম্বন্ধে জ্ঞানই নেই তাকেই শেষ পর্যন্ত বুঝতে হল সে নিজেই একজনের 'সম্পত্তি'। তাই কপাল-কুণ্ডলার এই উক্তি : "যদি জানিতাম যে স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।"

বঙ্কিমচন্দ্র কতই তো কাটছাঁট করলেন। ঘনঘোর পরিবারের বা নানান চরিত্রের সমাবেশ নেই, কোনও রূপ বিচলিত বা বিড়ম্বিত করার জন্য স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সপ্রশংস বা প্রলুব্ধ দৃষ্টির বিশেষ অবকাশ নেই। লেখকের পক্ষে সবচেয়ে বড় যে-সঙ্কট এবং নারীর পক্ষে বড় যে-সমস্যা মাতৃক্রোড়ে

শিশু তাও নেই। কপালকুণ্ডলার সন্তান নেই। তবু শেষ পর্যন্ত সবশুদ্ধ বিসর্জনেই পরিসমাপ্তি ঘটাতে হল। নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা উভয়কেই সমুদ্রে নিমজ্জিত করতে হল। লেখকের ঈপ্সিত হোক না হোক যা দাঁড়ালো তা এই যে, এইরূপ মুক্ত স্বাধীন নারীকে সঙ্কুলান করার (কনটেন করার) ক্ষমতা সম্পত্তি-বিশিষ্ট এ সমাজের নেই। শিল্পী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের মহত্ত্ব এই বাস্তবতার বৈশিষ্ট্যে সুস্পষ্ট। সম্পূর্ণ পৃথক ক্ষেত্রে, ভিন্ন সমাজে, বুর্জোয়া পরিবারের শাখা-প্রশাখার কাহিনী সম্বলিত গলস্‌ওয়ার্দির প্রসিদ্ধ উপন্যাস ফরসাইথ সাগাতে তার মর্ম হিসাবে ঔপন্যাসিক নিজে বলেছেন 'পজেশান্' আর 'বিউটির' দ্বন্দ্ব। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক দরিদ্র দেশের দরিদ্রতর প্রদেশ পশ্চিমবাংলার নাতিউচ্চ 'পজেশানের' স্তম্ভ 'বাজার' গোষ্ঠির লালিত এবং অনেক সময় মার্কিন ধনপতিদের বদান্যতায় পৃষ্ঠপোষিত ভাড়াটে সাহিত্যিকদের কাছে 'পজেশান্' বা স্বামীত্ব বলে কোন জিনিসের অস্তিত্বও নেই, তার সমস্যাও নেই। দ্বন্দ্বের কথা তো বহুদূর।

উপরের পক্ষীরাজ ঘোড়ার উপমায় যা বলতে চেয়েছিলাম শরৎচন্দ্রের কথাতেও ঐ উপমা কাজে লাগে। কমলের মতো বেপরোয়া নারী চরিত্র তাঁকে গড়তে হয়েছে। এ দায়িত্বই তিনি নিয়েছেন। "স্ত্রীলোকের কোনও স্বাতন্ত্র্য নেই" শকুন্তলার এই কথা (মহাভারত, আদিপর্ব, ৭৩ তম অধ্যায়) তো শুধু মহাভারতের যুগের কথা নয়—যেদিন মেয়েদের দাসত্ব শুরু হয়েছে সেই আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত শোষণ বিশিষ্ট সমাজের সব যুগেরই কথা। কোথাও কম, কোথাও বেশী, কখনও একরকম কখনও আর একরকম—কিন্তু নারীর এই স্বাতন্ত্র্যের অভাব শোষণবিশিষ্ট সমাজে চিরকালই থেকেছে। বরং আজ ধনতন্ত্র ও তার সঙ্গে সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের আবির্ভাবে এবং সেই প্রলেতারিয়েতের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক নারী শ্রমিকের আবির্ভাবে অন্ততঃ শ্রমিকশ্রেণীর নারীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী স্বাতন্ত্র্য দেখা দিয়েছে।

এই স্বাতন্ত্র্যের অভাব মূলতঃ অর্থনীতিক দাসত্বের জন্য। এই সমাজে বেপরোয়া হতে গেলেও স্বাতন্ত্র্য প্রয়োজন। সুতরাং সেই স্বাতন্ত্র্য যদি রাখতেই হয়, তার সঙ্গে খাপ খায় এমন অর্থনীতিক ব্যবস্থা থাকা চাই। কিন্তু সেটা তো চাইলেই পাওয়া যায় না। তাই কমলের জীবন নির্বাহের মানটা সঙ্কোচ করতে হয়েছে। একদিকে দায়দায়িত্ব নেই। সেদিকে ঔপন্যাসিক সচেতন। ডাল-পালা গজাতে দেন নি। অন্যদিকে 'কৃচ্ছ্রসাধন' করিয়ে খরচটা সংক্ষেপ করেছেন। সারা দিন একবেলা খাওয়া আর হবিষ্যি খাওয়া। ভারতীয়

আদর্শের মূল্যবান এই অস্ত্র হাতে থাকাতে লেখকের কাজ সহজ হয়েছে। কিন্তু কমলের স্বীকৃতির মাধ্যমে লেখক এই প্রয়োজনের কথা প্রকাশও করেছেন। অজিতের প্রশ্নের উত্তরে কমল বলেছেন—"এই রকম নানান দুঃখকষ্টে পড়ে একবেলা খাওয়াই অভ্যাস হয়ে গেল। কৃচ্ছ্রসাধন আর কি, বরঞ্চ শরীর মন দুইই ভাল থাকে।" অন্যত্র নিমন্ত্রিত হয়ে আর এক সময় কমল বললো: "…এসব আমি খাই নে। আপনারা যাকে হবিষ্যি বলেন আমি তাই শুধু খাই।" শুনিয়া নীলিমা অবাক হইল, "সে কি কথা! আপনি হবিষ্যি খেতে যাবেন কিসের দুঃখে?" কমল কহিল, "সে ঠিক। দুঃখ নেই তা নয়, কিন্তু এসব খাইনে বলেই অভাবটাও আমার কম।"

কিন্তু সেই কম অভাবটাও পূরণ করতে হয়। সেলাই করে সেই রোজগারটা করতে হয়। সেলাই-এর কলটা এখানে উৎপাদনের একটা উপায়। সামান্য হলেও একটা possession—এই পজেশানটুকুর জন্যও কমলকে বিব্রত হতে হয়েছিল। উৎপাদনের এই উপায়টুকুর বন্ধন ত্যাগ করে, পণ্য উৎপাদন করে বিক্রয় করার মোহ ত্যাগ করে, শ্রমশক্তিকেই পণ্য হিসাবে বিক্রয় করার পথ গ্রহণ করলে হাত পা ঝাড়া হয়ে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া যায়। আধুনিক প্রলেতারিয়েতের পূর্ণরূপ গ্রহণ করে একসঙ্গে অনেকে মিলে যে পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা তার সঙ্গে যুক্ত হলে সহযোগী শ্রমজীবিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বলিষ্ঠতর স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করা যায়।

তবু অর্থনীতিক স্বাতন্ত্র্যটাই যে স্বাতন্ত্র্যের মূল ভিত্তি—এই সোজা সরল আকৃতিটা শোষণবিশিষ্ট সমাজে উপরতলার শিল্পী এমন কি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিল্পীরও পরিষ্কারভাবে স্বীকার করতে বাধো বাধো ঠেকে। কিন্তু উপরের নিদর্শিত দৃষ্টান্তে দেখা গেল ফারসীতে যাকে বলে "আখের পেশে মা শুদি" (শেষে সেই আমাদের সিদ্ধান্তেই আসতে হলো) মার্কস্-এঙ্গেলসের প্রমাণিত সিদ্ধান্তেই পৌছাতে হবে। শিল্পী হিসাবে শরৎচন্দ্রের মহত্বও এখানেই যে তিনি কল্পনার দৌড় ছুটিয়ে দিলেও বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হন না।

জাতক :

প্রসঙ্গতঃ চিরায়ত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শিশুর জন্ম ও লালন পালনের সমস্যা দেখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে শিশুর সমস্যা বলে কোনও জিনিস দেখা যায় না। তাঁর নারী চরিত্রগুলি—বিষবৃক্ষের 'কমলমণি' বা এইরূপ অপ্রধান চরিত্র ছাড়া—সন্তানহীনা। সূর্য্যমুখী বা কুন্দনন্দিনী, ভ্রমর বা রোহিণী, দেবী চৌধুরাণী এবং অন্যান্য বিবাহিতা চরিত্রের মধ্যেও কারও সন্তান নেই। সুতরাং

সন্তানের সমস্যায় তাঁকে বিড়ম্বিত হতে হয় না। কপালকুণ্ডলা বা এঁদের কারও কোলে একটি শিশু দিলে কি জটিলতা সৃষ্টি হতে পারতো এইটুকু ভাবলেই এই সমস্যার অনুপস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। "...আপনিও গৃহত্যাগ করিয়া চলিলাম...তোমার কাছে জন্মের মতো বিদায় লইলাম..." কমলমণিকে সূর্য্যমুখীর শুধু এই পত্র এবং এরূপ সরল গৃহত্যাগ কি সম্ভব হতো।?

প্রফুল্ল (পরে যে দেবী চৌধুরাণী) বলছে: "তুমি আমায় ত্যাগ কর নাই গ্রহণ করিয়াছ। আমাকে একদিনের জন্য শয্যার পাশে ঠাঁই দিয়াছ।..."

অতঃপর এঁর কোলে যদি একটা সন্তান থাকতো? তা হলে দেবী চৌধুরাণীর কি সমস্যা হতো?

অথচ সমস্ত কাহিনীটি একটি মেয়ের তথা প্রফুল্লের জন্মের অবৈধতার মিথ্যা অপপ্রচারের পটভূমিকায়। এই ধরনের ব্যাপার শিশু সমস্যার জটিলতাকে আরও স্মরণ করিয়ে দেয়।

শুধু বঙ্কিমবাবু কেন? শরৎচন্দ্রও অনেকক্ষেত্রে ও সমস্যা এড়িয়েছেন—তবে সেটা হয়েছে "শয্যার পাশে স্থান দানের" জটিলতাকে বর্জন করে। অবশ্য সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক ভাবেই এ প্রশ্ন জাগতে পারে 'শেষপ্রশ্নে' কমলের একটি সন্তান থাকলে বিশেষ করে সেটি যখন বর্ণিত অবস্থায় অবৈধ সন্তান বলে বিবেচিত হতো তখন সমস্যাটা কি দাঁড়াতো। রবীন্দ্রনাথের কলমও এ ধরনের প্রশ্ন এড়িয়ে গেছে।

এই প্রশ্ন বিশেষ করে বিবাহ বহির্ভূত সন্তানের গর্ভধারণ বাংলার আধুনিক যুগের চিরায়ত সাহিত্যে (কেবল দুই একটি নাটক ছাড়া অন্যত্র) নেই। নাটকে যেখানে আছে সেক্ষেত্রেও নিগৃহীতা নারীর উপর সম্পূর্ণ সুবিচার হয় নি। শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার সমস্যা এবং সমাজ কর্তৃক স্বীকৃতির প্রশ্নই শোষণ ভিত্তিক সমাজে নারী পুরুষ সমস্যার বড় প্রশ্ন। আধুনিক কালের বিশ্ব সাহিত্যে এই প্রশ্নে নিগৃহীতা নারীর প্রতি সহানুভূতিতে বেদনাদায়ক কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত উপন্যাসের অভাব নেই। ইংরাজীতে হল কেনের উপন্যাস বা টমাস হার্ডির প্রসিদ্ধ উপন্যাস Tess of the Durbervilles-এর উল্লেখ করা যায়। তলস্তয়ের বিখ্যাত উপন্যাস রিসারেকশানও ঐরূপ ঘটনায় সূচিত বেদনাদায়ক কাহিনীর উপর রচিত। এই উপন্যাস যেন সমগ্র পুরুষ-সমাজের পক্ষ থেকে একজন অপরাধ সচেতন বিবেকবান পুরুষের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ। অথচ বাস্তব জীবনে শহরে ও গ্রামে কতোই না এরূপ বেদনাদায়ক কাহিনীর কথা শোনা যায়। মার্কস ও এঙ্গেলসের ১৮৪৬ সালের একটি অপ্রকাশিত রচনায় তাঁরা

বলেছিলেন : "শ্রমের প্রথম বিভাগ (ডিভিশান অব লেবর) হচ্ছে সন্তান উৎপাদনের জন্য স্ত্রী ও পুরুষের বিভাগ"। এঙ্গেল্‌স্ পরে এও যোগ দিয়েছিলেন "প্রথম শ্রেণীপীড়ন মিলে পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীজাতির উপর পীড়নের সঙ্গে।" বিস্তৃত আলোচনা পরে করবো। এখন সাহিত্যের নিদর্শনেই ফেরা যাক।

আশ্চর্যের কথা এই যে, আধুনিক চিরায়ত সাহিত্যে নারী-নিগ্রহের এই দিকটা এড়িয়ে যাওয়া হলেও আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে এর ঐতিহ্যের অভাব নেই। নারীর প্রতি দোষারোপ এবং ভূমিষ্ঠ শিশুর গর্ভযন্ত্রণা থেকে শুরু করে লালনপালনের সমস্ত বোঝা বর্জিতা বা ত্যক্তা নারী কর্তৃক বহন বা তাকে বহন করতে বাধ্যকরণ আমাদের মহাকাব্য মহাভারত ও রামায়ণের বিশিষ্ট অংশ। রামায়ণ তো এক হিসাবে সীতার বেদনাময় কাহিনীর রূপায়ণ এবং তারই অত্যন্ত বেদনাদায়ক পরিণতি। যুগ যুগ ধরে সীতার করুণ কাহিনী ভারতের কোটি কোটি মানুষকে অশ্রুসিক্ত করেছে। কবির ভাষায় :

শুধু সেদিনের একখানি সুর
চিরদিন ধরে বহু বহু দূর
কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর
মধুর করুণ তানে,
সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে
যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে
আজিও সে গীত মহাসঙ্গীতে
বাজে মানবের কানে।

তারপর সহজেই মনে পড়ে শকুন্তলার কাহিনী—মহাভারতে এবং মহাকবি কালিদাসের রচনায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাভারতে বর্ণিত কাহিনীর সামারী বা সারমর্ম দিয়েছেন নিম্নরূপ :

"মহাভারতে রাজা দুষ্মন্ত বড় ভাল লোক ছিলেন না। তিনি গান্ধর্ব বিধানে শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া গিয়া সে-কথা আর তুলেন নাই। মনে বেশ ছিল, কিন্তু প্রকাশ করেন নাই, পাছে লোকে কিছু বলে। শকুন্তলা যখন চোখের সামনে দাঁড়াইয়া, সঙ্গে বারো বছরের ছেলে, তখন মনে সব ঠিক আছে, তবু রাজা বিবাহটা একেবারে অস্বীকার করিলেন। শুধু তাহাই নয়, শকুন্তলাকে তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা বলিয়া নিন্দা করিলেন। (· নারীগণ মিথ্যাবাদিনী হয়, সুতরাং তোমার কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না …তুমি কোন ব্যভিচারিণী স্ত্রীর ন্যায় কথা বলিতেছ…তোমার জাতি নীচ।

তুমি কুলটা নারীর ন্যায় কথা বলিতেছ…। দুষ্মন্তের উক্তি, মহাভারত আদিপর্ব, ৭৪তম অধ্যায়, ৭৩-৮০—লেখক) আর ছেলেটাকে 'হোৎকা' বলিয়া হাতি বলিয়া গালি দিলেন। শেষে শকুন্তলা যখন রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন তখন দৈববাণী হইল 'তুমি উহাকে সত্যই বিবাহ করিয়াছ'। লোক দৈববাণী শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল ; তখন তিনি সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, শকুন্তলার কাছে মাফ চাহিলেন এবং বলিলেন, মনে থাকিলেও লোকলজ্জার ভয়ে বলিতে সাহস করি নাই।" (দুর্বাসার অভিশাপ, রচনা ১৩২৪)

কালিদাস সম্বন্ধে হরপ্রসাদ বলছেন: "কালিদাস দুর্বাসার শাপ আনিয়া ঐ মহাপুরুষকে রাজার মতন রাজা এমন কি দেবতা করিয়া তুলিয়াছেন। …দুষ্মন্তকে 'কাপুরুষতার' দায় হইতে বাঁচাইবার জন্য কালিদাস শাপের ব্যবস্থা করিয়াছেন।" যাই হোক কালিদাস কিন্তু "রাজার চপল প্রণয়ের পরিচয়" (রবীন্দ্রনাথ) আচ্ছাদন করেননি। অন্যতমা প্রেয়সী হংসপদিকার নেপথ্য-সঙ্গীত: "নবমধুলোভী ওগো মধুকর, চুতমঞ্জরী চুমি/কমল নিবাসে যে-মধু পেয়েছ কেমনে ভুলিলে তুমি"—একে আরও স্পষ্ট করেছে। মহাভারতে রাজার অগুণ স্পষ্টতর, কালিদাসে কিছুটা আবরিত। কিন্তু অপ্রকাশ্য কোথাও নেই। বিশেষ করে নারীর হীন অবস্থা কোথাও গোপন করা হয়নি।

আজকের বুর্জোয়া ভণ্ডামি, নারীর সমানাধিকারের মিথ্যা বুর্জোয়া ভণিতা এবং সসাগরা পৃথিবীর রাজা দুষ্মন্তের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র বুর্জোয়াদের 'কাপুরুষতা' ও কপটতা এবং তাদের সেই কাপুরুষতা ও কপটতা আচ্ছাদনের জন্য নিযুক্ত ভাড়াটে লেখকদের ক্রিয়াকাণ্ড দেখলে, মহান কবি কালিদাসের "শাপের" উদ্ভাবনকে কোনও ত্রুটিই মনে হয় না।

মহাভারতের বর্ণনায় গান্ধর্ব বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্য শকুন্তলা অনুরুদ্ধ হলে তিনি বলেছেন: "পিতাই আমার সর্বদা প্রভু, তিনিই আমার পরম দেবতা। তিনি আমাকে যাহার হাতে দিবেন তিনিই আমার স্বামী হইবেন। কৌমার বয়সে কন্যাকে পিতা রক্ষা করেন, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্র মাতাকে রক্ষা করে, স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য নাই।" (মহাভারত, আদিপর্ব, ৭৩তম অধ্যায়, ৬)

মহাকবি কালিদাস নারীর এই দীন বা হীন অবস্থাকে আরও স্পষ্ট করেছেন। প্রিয়ম্বদা বলেছেন—ইনি নিজের ইচ্ছায় কিছুই করতে পারেন না। দ্বিতীয় অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে রাজা নিজেই স্বীকার করেছে "কন্যাটি নিজে পরাধীনা তাছাড়া গুরুজনও এখন নিকটে নাই।" অনুরূপভাবে তৃতীয় অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে তিনি বলে-

ছেন : "জানি সে পরাধীনা নারী।" দ্বিতীয় দৃশ্যে শকুন্তলা রাজাকে বলছেন : "আমি ভালবেসে কষ্ট পাচ্ছি বটে কিন্তু আপনি তো জানেন আমি পরাধীনা।" রাজা কর্তৃক পতিত্ব ও ভাবী সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকারের পর ঋষি শার্ঙ্গরব যিনি শকুন্তলাকে রাজ-সমীপে নিয়ে গেছেন তিনি বললেন : "পরিণীতা পত্নী হয়ে পিতৃ-গৃহ করে যে-আশ্রয়/হোক্‌না সে সাধ্বী সতী তবু লোকে করে গো সংশয়।" রাজা বলেছেন : ...এই গর্ভলক্ষণাক্রান্তা রমণীকে কিরূপে পত্নী বলে গ্রহণ করতে পারি? "স্বভাববঞ্চক নারী কে না জানে বল ইতর প্রাণীরও মাঝে নহে তা বিরল। কোকিলা উড়িয়া যবে ব্যোমমার্গে ধায়, আপন শাবকে রাখে পরের বাসায়।"

বলা বাহুল্য মহাকবি কালিদাসের অমর সৃষ্টি বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে আমাদের গৌরব 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক' বা তার বিভিন্ন সমালোচনা এখানে আলোচ্য নয়। শুধু দেখাতে চেয়েছি সাধারণতঃ সাহিত্যিক ও কবিরা বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক জগতের সাহিত্যিকরা যে সমস্যা এবং নারীর যে হীন অবস্থার আলোচনা পরিহার করে চলতে চান প্রাচীন কবিরা তা করেননি। (তবে বিভিন্ন সমালোচনার ক্ষেত্রে চন্দ্রনাথ বসুর একটি কথা উল্লেখ করতে হয়। তিনি রক্ষণ-শীল। সুতরাং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে সেই পশ্চাদপদতা প্রতিফলিত হবে তাতে তো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর সমালোচনায় একটি সুর আছে সেটি লক্ষ্য করার মতো। ব্যক্তি যে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এবং প্রণয়ের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিরেক হতে পারে না, এই সত্যটা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন—যদিচ সমাজ বলতে তিনি তাঁর প্রিয় প্রতিক্রিয়াশীল সমাজকেই ঠিক করেছেন। এসব ত্রুটি সত্ত্বেও নিম্নোদ্ধৃত উক্তি উল্লেখযোগ্য : "সমাজের গঠনপ্রণালী এবং সামাজিক নিয়ম এমন হওয়া চাই যে, সেই প্রণালী এবং নিয়মে লোকের ঐন্দ্রয়িক শক্তি প্রশ্রয় না পাইয়া দমিত হইয়া আসে।")

মার্কস্‌বাদের বক্তব্য

(অন্যান্য শিল্প ছাড়াও) সাহিত্যকেই বুর্জোয়ার ভাড়াটে লেখকরা বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রধান অবলম্বন করেছেন বলে অতীতের সাহিত্যের কিছু নির্বাচিত ক্ষেত্রে পরিক্রমা করলাম। দেখাতে চেষ্টা করলাম অতীতে যেখানে মহৎ শিল্পের অনু-প্রেরণা, সেখানে ভিন্ন ভিন্ন যুগে নানারকম সংস্কার থাকা সত্ত্বেও বাস্তবতার বিচারে সেই সত্যের দিকেই এগোতে হয়েছে নারী পুরুষ সম্পর্কে ও নারীর স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে মার্কস্‌বাদের যা বক্তব্য।

শেষোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে হলে মার্কস্‌বাদের অন্যান্য গ্রন্থ ছাড়া বিশেষ মনোযোগ দিতে হয় একটি পুস্তকে। এঙ্গেল্‌সের "পরিবারের ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি" হচ্ছে সেই পুস্তক। বলা বাহুল্য সমগ্র বিষয়টি এখানে উপস্থিত করা সম্ভব নয়। নিম্নে এঙ্গেল্‌সের ঐ পুস্তক থেকে কিছু উদ্ধৃত করবো।

"বিবাহের ব্যাপারে খুব প্রগতিশীল আইনও এইটুকুতেই সন্তুষ্ট যে উভয় পক্ষ বিবাহে সরকারীভাবে নিজেদের সম্মতি জানিয়েছে। আইনের যবনিকার আড়ালে যেখানে বাস্তব জীবন চলে সেখানে কি ঘটছে, কিভাবে এই স্বেচ্ছামূলক চুক্তিতে পৌছানো হচ্ছে তা নিয়ে আইন বা আইনজ্ঞ মাথা ঘামায় না।" এর পর এঙ্গেল্‌স্ দেখাচ্ছেন যে সম্পত্তি ভোগী শ্রেণীর মধ্যে এই সম্মতি শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় পিতামাতার সম্মতি ও অনুমোদন। বিবাহের অনুষ্ঠানাদির পর বিবাহিত জীবনের মধ্যে আইনের যে সমানাধিকারের কথা তার অবস্থাও তথৈবচ। এঙ্গেল্‌স্ বলছেন: "বিবাহে স্ত্রী-পুরুষের আইনী সমানাধিকারের ক্ষেত্রেও অবস্থা এর চেয়ে ভাল নয়। পূর্বতন সামাজিক অবস্থার উত্তরদায়িত্ব হিসাবে প্রাপ্ত উভয়ের আইনগত অসম অধিকার, এটি স্ত্রীলোকের উপর অর্থনৈতিক পীড়নের কারণ নয়, ফল। পুরোনো সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালীতে যেখানে বহু দম্পতি ও তাহাদের ছেলে-মেয়েরা থাকত সেখানে গৃহস্থালীর ব্যবস্থা স্ত্রীলোকদের উপর ন্যস্ত ছিল—এই কাজটি পুরুষদের খাদ্য আহরণের মতোই একটা সামাজিক ভাবে প্রয়োজনীয় বৃত্তি বলে গণ্য হতো। পিতৃপ্রধান পরিবার আসার সঙ্গে অবস্থা বদলে গেল এবং আরও বেশী বদলাল একপতিপত্নী স্বতন্ত্র পরিবার আসার ফলে। গৃহস্থালীর কাজের সামাজিক বৈশিষ্ট্য চলে গেল। এটি আর সমাজের দেখবার বিষয় রইল না—এটি হয়ে দাঁড়াল "ব্যক্তিগত সেবা"। সামাজিক উৎপাদনের থেকে বহিষ্কৃত হয়ে স্ত্রী'ই হল প্রথম ঘরোয়া ঝি। কেবলমাত্র আধুনিক বৃহৎ শিল্পই আবার তাদের সামনে সামাজিক উৎপাদনে প্রবেশের দরজা খুলে দিয়েছে, অবশ্য কেবলমাত্র প্রলেতারিয় স্ত্রীলোকদের জন্যই। কিন্তু সেটা করেছে এমন ভাবে যে,

যখন সে নিজের পরিবারের ব্যক্তিগত সেবার কর্তব্য পালন করে তখন সে সামাজিক উৎপাদনের বাইরে পড়ে যায় এবং কোনও কিছু উপার্জন করে না; এবং

যখন সে সামাজিক পরিশ্রমে অংশ নিয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করতে চায়—তখন আর সে পারিবারিক কর্তব্য পালন করতে পারে না।

কারখানার স্ত্রীলোকের পক্ষে যা প্রযোজ্য তা অন্য পেশায় এমনকি চিকিৎসা ও আইনের পেশাতেও প্রযোজ্য। আধুনিক ব্যক্তিগত পরিবার স্ত্রীলোকের প্রকাশ্য অথবা গার্হস্থ্য দাসত্বের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং বর্ত্তমান সমাজ হচ্ছে এইসব ব্যক্তিগত পরিবারের অণুর সমষ্টি। বর্ত্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্ততঃ পক্ষে বিত্তবান শ্রেণীগুলির মধ্যে পুরুষ হচ্ছে উপার্জনকারী, পরিবারের ভরণ-পোষণের কর্তা এবং এই জন্যই তার আধিপত্য দেখা দেয়, যার জন্য কোন বিশেষ আইনগত সুবিধা দরকার পড়ে না। পরিবারের মধ্যে সে হচ্ছে বুর্জোয়া, স্ত্রী হচ্ছে প্রলেতারিয়েত। কিন্তু শিল্প জগতে যে অর্থনৈতিক শোষণ প্রলেতারিয়েতকে পিষে ধরে তার বিশেষ প্রকৃতি সমগ্র তীক্ষ্ণতায় তখনই ফুটে ওঠে যখন পুঁজিপতি শ্রেণীর আইনগত সমস্ত বিশেষ সুবিধা দূর হয়েছে এবং আইনের চক্ষে উভয়ের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র উভয় শ্রেণীর বিরোধ লোপ করে না; পরন্তু সে বিরোধ লড়ে শেষ করার ক্ষেত্র জোগায়। ঠিক একই ভাবে আধুনিক পরিবারের মধ্যে স্ত্রীলোকের উপর স্বামীর আধিপত্যের বিশেষ চরিত্র এবং উভয়ের মধ্যে সত্যকার সামাজিক সাম্য-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ও পদ্ধতি তখনই পুরো ফুটে উঠবে যখন আইনের চক্ষে উভয়ের অধিকার সমান বলে স্বীকৃত হচ্ছে। তখন এটা স্পষ্ট হবে যে সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে গোটা স্ত্রী জাতিকে আবার নিয়ে আসাই হচ্ছে তাদের মুক্তির প্রথম সর্ত এবং এর জন্যই আবার দরকার হচ্ছে সমাজের অর্থনীতির একক হিসাবে ব্যক্তিগত পরিবারের যে গুণটি রয়েছে তার বিলোপ।"

* * * *

"... আমরা এমন একটি সমাজ বিপ্লবের দিকে এগোচ্ছি যখন বর্ত্তমানের একপতিপত্নী প্রথার অর্থনৈতিক ভিত্তি তেমন নিশ্চিতই লোপ পাবে, যেমন লোপ পাবে তার অনুপূরণ পতিতাবৃত্তির অর্থনৈতিক ভিত্তি। একই ব্যক্তির, মানে এক পুরুষের অধিকারে প্রচুর সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে এবং অপর কাউকে নয়, কেবল সে পুরুষের নিজের সন্তান সন্ততিকেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার দিয়ে যাবার ইচ্ছা থেকেই এই একপতিপত্নী প্রথা আসে। এইজন্যই নারীর পক্ষেই একপতিত্ব বাধ্যতামূলক, পুরুষের জন্য নয়। অতএব স্ত্রীলোকদের একপতিত্বে পুরুষদের গোপন বা প্রকাশ্য বহুপত্নীত্ব বাধে নি। উত্তরাধিকারযোগ্য স্থায়ী সম্পদের অন্ততঃপক্ষে বেশির ভাগ অংশকে, উৎপাদনের উপায়কে সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করে আসন্ন সমাজ বিপ্লব কিন্তু উত্তরাধিকারের এই সব চিন্তাকে সর্বনিম্নে নামিয়ে

আনবে। যেহেতু একপতিপত্নী প্রথা অর্থনৈতিক কারণ থেকে জন্মেছে, তাই সে সব কারণ চলে গেলে কি এটিও লোপ পাবে ?

এর উত্তরে যৌক্তিকতার সঙ্গেই বলা চলে : এই প্রথা লোপ না পেয়ে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হবেই। কারণ উৎপাদনের উপায়গুলি সমাজের সম্পত্তি হওয়ার ফলে মজুরি শ্রম, প্রলেতারিয়েত লোপ পায় এবং সেই সঙ্গে সমাজের কিছু সংখ্যক স্ত্রীলোকের (সংখ্যাগতভাবে যা গণনাযোগ্য) পুরুষের অর্থের জন্য আত্মদানের আবশ্যকতাও লোপ পাবে। পতিতাবৃত্তি লোপ পাবে এবং একপতিপত্নী ক্ষয় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বাস্তব হবে—সেটা পুরুষদের পক্ষেও।

মোটের উপর পুরুষদের অবস্থা এইভাবে যথেষ্ট পরিমাণে বদলে যাবে। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে ও সমস্ত নারীর ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটবে। উৎপাদন সমাজের সম্পত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিগত পরিবারগুলি আর সমাজের অর্থনীতির একক (unit) থাকবে না। ব্যক্তিগত গৃহস্থালী পরিণত হবে সামাজিক শিল্পে। শিশুর পরিচর্যা ও শিক্ষা হয়ে উঠবে সামাজিক ব্যাপার, বিবাহ-বন্ধনের মারফৎ অথবা তার বাইরে শিশু যেভাবেই জন্মাক না কেন, সমাজ তাদের সকলের সমান দায়িত্ব নেবে। এই জন্যই 'ভবিষ্যৎ ফলাফলের' দুশ্চিন্তা, নীতিগত ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকে যেটি আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কারণ—যেজন্য একটি মেয়ে যাকে ভালবাসে সেই পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে না—সেই কারণ আর থাকবে না।" (তলরেখ আমার—লেখক)

এঙ্গেল্‌সের শেষের কয়টি বাক্য বিশেষ মনোযোগ ও প্রণিধানের সঙ্গে দেখা উচিত। পরাশরের প্রেমাবেদনের উত্তরে সত্যবতী বলেছিলেন : "...আমার কন্যাত্ব নষ্ট হইবে। আমার কন্যাত্ব নষ্ট হইলে হে ধীমন ! আমি গৃহে কেমন করিয়া গমন করিব এবং তথায় কিভাবে অবস্থান করিব ?..." (মহাভারত, আদিপর্ব, ৬৩ তম অধ্যায়, ৭৫-৭৭) শকুন্তলা দুষ্মন্তকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন : "...অনুচিত কার্য করা আপনার পক্ষে উচিত নহে..." (ঐ, ৭১তম অধ্যায়, ৬) মেয়েদের এই দুশ্চিন্তার কারণ এঙ্গেল্‌স্ ভাল ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। তখনও অর্থাৎ মহাভারতবর্ণিত কালেও যা দুশ্চিন্তার কারণ ছিল এখনও তা আছে। আইনের ক্ষেত্রে মেয়েদের সমানাধিকারের স্বীকৃতি এই দুশ্চিন্তাকে আরও স্পষ্ট করতে পারে, মেয়েদের স্বাধীনতার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় যা (অর্থাৎ সমাজতন্ত্র) তার আন্দোলনে নারীদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে যেটা গণতান্ত্রিক অধিকার। এ অধিকার প্রলেতারিয়েতকে তার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সংগঠনের সুযোগ দেয়। কিন্তু

শুধু সেই সমানাধিকারের স্বীকৃতি দুশ্চিন্তাকে দূর করে না—করতে পারে না। এ-দুশ্চিন্তার কথা ভাবে না কেবল বুর্জোয়া সমাজের ভাড়াটে লেখক, যাদের কাজ হচ্ছে নারী সমাজকে বুর্জোয়ার লালসা ও পীড়নের শিকার করা আর সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ সমাজেরও নৈতিক অধঃপতন ঘটানো।

এঙ্গেল্‌সের কথাই আমরা পুনরুদ্ধৃত করব : "…বিবাহের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা সাধারণভাবে তখনই কার্যকরী হতে পারে, যখন পুঁজিবাদী উৎপাদন এবং তারই সৃষ্টি মালিকানা সম্পর্ক বিলুপ্ত হয়ে সেইসব গৌণ অর্থনৈতিক হিসাবকে হটিয়ে দেয়, যেগুলি বিবাহের সঙ্গী-নির্বাচনের উপর এত প্রভাব বিস্তার করে। তখন পরস্পর আকর্ষণ ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য থাকবে না।

যেহেতু যৌন প্রেম প্রকৃতিগতভাবেই একবদ্ধ (এক্সক্লুসিভ)—যদিও বর্তমানে কেবল স্ত্রীলোকের বেলাতেই এই একবদ্ধতা (এক্সক্লুসিভনেস) পূর্ণমাত্রায় রূপায়িত হয়—সেইজন্য যৌনপ্রেমের ভিত্তিতে বিবাহ হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবেই একপতিপত্নী প্রথা। আমরা আগেই দেখেছি যে বাখোফেন যখন সমষ্টি-বিবাহ থেকে এক-বিবাহে অগ্রগতিকে প্রধানতঃ স্ত্রীলোকদের কীর্তি বলেছিলেন তখন তিনি কত সঠিক ছিলেন। জোড়বাঁধা রিবাহ থেকে একপতিপত্নী প্রথায় অগ্রগতিকেই কেবল পুরুষের কাজ বলা যায় এবং ঐতিহাসিকভাবে এতে বস্তুতঃ স্ত্রীলোকের অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটেছে এবং পুরুষের ক্ষেত্রে বিশ্বাসহানির সুযোগ বেড়েছে। তাই যে-সমস্ত অর্থনৈতিক কারণে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের নিত্যকার বিশ্বাসহানি সহ্য করতে বাধ্য হত—নিজেদের জীবনযাত্রা নিয়ে এবং তার চেয়ে বেশী সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ—তার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীলোকের যে সমতা অর্জিত হবে তার ফলে অতীত সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, স্ত্রীলোকেরা বহুগামিনী না হয়ে বরং পুরুষই আরও কার্যকরীভাবে একপত্নীব্রতই হবে।"

এঙ্গেল্‌সের উদ্ধৃতি থেকেই আমরা দেখেছি নরনারী সম্পর্ক ও নারীদের স্বাধীনতার প্রশ্নকে মার্কসবাদ কতো সঠিকভাবে উপস্থিত করেছিল। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি এই নির্দেশকে ভালভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সংগ্রামের মধ্যেই তার রূপায়ণের উদ্দেশ্যে মতবাদগত প্রস্তুতি করে যাচ্ছিলেন। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে (লেনিন কর্তৃক রচিত) পার্টি কার্যসূচীতে স্বভাবতই থাকলো :

রুশ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে নিশ্চিন্ত করতে :—

(৬ নং দাবী) নারীদের প্রতি ক্ষতিকর শাখায় নারী শ্রম নিষেধ; নারীদের রাত কাজ নিষেধ; প্রসবের পূর্বে ৮ সপ্তাহ ও পরে ৮ সপ্তাহ কাজ

থেকে মেয়েদের ছুটি এবং এই সময়টার জন্য বিনামূল্যে ডাক্তার ও ঔষধপত্রের সাহায্য সমেত বেতন সংরক্ষণ।

(৭ নং দাবী) মেয়েরা যে সব কলকারখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তার সর্বত্রই স্তন্যপায়ী ও অল্পবয়সী শিশুদের জন্য শিশু লালনাগার এবং স্তন্যদানের জন্য ঘরের ব্যবস্থা। স্তন্যদায়ী মায়েদের অন্ততঃ তিন ঘণ্টা পর পর অন্যূন আধ ঘণ্টা করে ছুটি; স্তন্যদায়ী মায়েদের জন্য ভাতা প্রদান এবং কর্মদিন ৬ ঘণ্টায় হ্রাস।

৭ই নভেম্বর ১৯১৭ বিপ্লবের পর অবিলম্বে এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। ১৯শে নভেম্বর, ১৯১৮ লেনিন বলছেন "...সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের কর্তব্য হলো সর্বপ্রথমে নারী অধিকারের সমস্ত সীমাবদ্ধতা দূর করা। বুর্জোয়া নোংরামির, দলিতাবস্থা ও লাঞ্ছনার যা উৎস, বিবাহের সেই মামলাবিধি সোভিয়েত রাজ পুরোপুরি বিলুপ্ত করেছে। পুরোপুরি স্বাধীন বিবাহ বিচ্ছেদ আইন হয়েছে আজ এক বছর। আমরা ডিক্রীজারী করেছি, এতে বিবাহোদ্ভূত ও বিবাহবহির্ভূত সন্তানের অবস্থায় সবকিছু ভেদাভেদ লোপ এবং একরাশি রাজনৈতিক ভেদাভেদ দূর করা হয়েছে। মেহনতী নারীদের এমন পরিপূর্ণ সমানাধিকার ও স্বাধীনতা আর কোথাও নেই।......" কিন্তু ব্যাপারটা শুধু আইন নিয়ে নয়।..... এই বলে লেনিন আইনকে কার্যকরী করা ও ঘোষিত লক্ষ্য সাধন করার প্রয়াসের কথা বলেন এবং মেয়েদের অবস্থার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন: "মেয়েদের অবস্থা এখনও পর্যন্ত এমন থেকে গেছে যে তাদের বাঁদী বলা হয়। মেয়েরা নিজেদের সাংসারিক ঘরকন্নার চাপে পীড়িত, এ অবস্থা থেকে তাকে ত্রাণ করতে পারে কেবল সমাজতন্ত্র।" (তলরেখ আমার—লেখক)

১৯১৯ সালের জুলাই মাসে এক প্রবন্ধে লেনিন মেয়েদের সাংসারিক কাজের চাপের কথা বলেছেন। বলছেন যে "অনুৎপাদক, তুচ্ছ পিত্তিজ্বালানো মন-ভোঁতা-করা হাড়-গুঁড়নো কাজে অপচয় হচ্ছে তার শ্রম।" আরও বলছেন: "সামাজিক ভোজনালয়, শিশু-লালনাগার, কিণ্ডারগার্টেন এই হল (কমিউনিজমের) অঙ্কুরের নমুনা, এই হল সেইসব সাদামাটা দৈনন্দিন সব উপায়, আড়ম্বর, বাক্যোচ্ছ্বাস ও সমারোহ যাতে কিছু নেই; কিন্তু যা কার্যক্ষেত্রে নারীদের মুক্ত করতে সমর্থ, যা কার্যক্ষেত্রে সামাজিক উৎপাদন ও সামাজিক জীবনে নারীদের ভূমিকার ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে তার অসাম্য হ্রাস বা বিলোপ করতে সমর্থ।"

আজ দুনিয়ার এক তৃতীয়াংশে সমাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি সমাজ-

তান্ত্রিক দেশে লেনিন-প্রস্তাবিত সাধারণ ভোজনাগার শিশুদের লালনাগার কিণ্ডারগার্টেন সুপ্রতিষ্ঠিত। নারীর স্বাধীনতার বাস্তব রূপ সেখানে স্পষ্ট হয়েছে। শিশু লালনাগার, কিণ্ডারগার্টেন আজ সেখানে প্রতিটি নাগরিকের সন্তানের জন্য এবং সেগুলি এমন উচ্চস্তরের গুণসম্পন্ন যা ধনতন্ত্রের ধনিকতম দেশে নেই। উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত হয়ে নারী এখন তার সাম্যের অধিকার বাস্তবে পরিণত করতে পেরেছে। এই বিষয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাফল্য পুস্তক, পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকায় অনেক আলোচিত হয়েছে। বুর্জোয়া দেশের অ-কমিউনিস্ট লেখক বা দর্শকদেরও এই সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়েছে। সুতরাং এগুলির বিস্তৃত বিবরণের প্রয়োজন এখানে নেই।

বুর্জোয়া দাবী বনাম প্রলেতারিয়েত দাবী :

১৯১৫ সালে একজন লেখক নারী শ্রমিকদের জন্য লেখার উদ্দেশ্যে একটি পুস্তিকার পরিকল্পনা-ছক লেনিনের নিকট পাঠিয়েছিলেন। লেনিন আরও বিশদ করে লিখতে বললেন "কারণ অনেক কিছুই অস্পষ্ট থাকছে"। কিন্তু একটি অভি-মত তিনি তখনই দিলেন। উক্ত ছকে উল্লিখিত "প্রেম মুক্তির" দাবী সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন : "এটা সত্যিই প্রলেতারীয় দাবী নয়, বুর্জোয়া দাবী!···আসলে এ কথাটায় কী বোঝেন আপনি? কী বোঝা সম্ভব? (১) ভালবাসার ব্যাপারে বৈষয়িক (আর্থিক) হিসাব থেকে মুক্তি? (২) সেই সঙ্গে বৈষয়িক প্রযত্ন থেকেও?'' লেনিন বললেন, প্রলেতারিয়েতের কাছে সবচেয়ে জরুরী হল এই দুটি! যদি মনে করা হয় (৩) ধর্ম সংস্কার থেকে মুক্তি? (৪) পৈত্রিক নিষেধ ইত্যাদি থেকে মুক্তি? (৫) সামাজিক সংস্কার থেকে মুক্তি? (৬) পরিবেশের (কৃষক, পেটিবুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী বুর্জোয়া) সঙ্কীর্ণ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি? (৭) আইন আদালত ও পুলিশের নিগড় থেকে মুক্তি?—লেনিন প্রথমে বর্ণিত দুইটি প্রশ্ন ১নং ২নং এর পর এই কয়টিকেও প্রলেতারিয়েতের দরকারের মধ্যে গণ্য করতে রাজী হলেন। কিন্তু আর তিনটি প্রশ্নের উল্লেখ করে লেনিন বলেছিলেন, সেগুলি বুর্জোয়া দাবী। তিনি বলেছিলেন যদি আপনার প্রেমমুক্তিতে বোঝায় (৮) ভালবাসার গুরুত্ববোধ থেকে মুক্তি? (৯) সন্তানধারণ থেকে মুক্তি? এবং (১০) ব্যভিচারের স্বাধীনতা?" তাহলে এগুলি ঠিক সেই মুক্তি "বর্তমান সমাজে সবচেয়ে বাচাল, হট্টগোলকারী, উপরিওয়ালা শ্রেণীগুলি "প্রেমমুক্তি" বলতে বোঝায়। এটা প্রলেতারীয় নয়, এটা বুর্জোয়া দাবী।"

এই বুর্জোয়া দাবীই উপস্থিত করে আজ শোষকশ্রেণীর ভাড়াটে লেখক

সাহিত্যিক শিল্পীরা বিজ্ঞপ্তি প্রচার করার চেষ্টা করছে। এদের গুরু পীর সব সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতন্ত্রী দেশের অনুরূপ ভাড়াটেরা। "সমাজতন্ত্র" যা নারীকে প্রকৃত স্বাধীনতা দিচ্ছে, বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নের বাধা-বিঘ্নের ব্যাঘাত থেকে ভালবাসাকে মুক্তি দিচ্ছে, তা এদের কাছে ধনতন্ত্রের "বিকল্প সমাজ" (অলটারনেটিভ সোসাইটি) নয়। তাদের কাছে বিকল্প সমাজ বলে তারা ঘোষণা করছে যৌন ব্যাপারে স্বাধীনতা। ফলে কী হচ্ছে তার একটা বিবরণ উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল। "A few examples will suffice to illustrate the permissive society. The House of Commons was informed last month that the Director of Public Prosecutions would inquire into the circumstances under which the contraceptive pill was prescribed to a girl of 12 who recently had an abortion. A court has been informed by an educational psychologist that 'girlie' magazines were the standard literature of the modern secondary school. And reports say that many pregnant girls under I6 are seeking private abortion on being refused a Health Service abortion" (vide Statesman, page 6, August 14 197I)

বলা বাহুল্য, লেনিন অর্ধশতাব্দী আগে বুর্জোয়াদের "বাচাল হট্টগোল" বলে যাকে উল্লেখ করেছিলেন, সেই বাচাল হট্টগোল আরও নগ্ন নোংরা ও ব্যাপক প্রচারে পর্যবসিত হওয়াতেই নিতান্ত শিশুসম কিশোরীদেরও এইরূপ শোচনীয় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সমাজতন্ত্রের শত্রুরা সমাজতন্ত্রের প্রোগ্রাম থেকে কী ঘৃণ্য উপায়ে অল্পবয়স্ক কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের টেনে সরিয়ে লালসার শিকারে পরিণত করছে এ তারই এক বেদনাদায়ক ছবি। এদেশেও তাদের শাকরেদ ভাড়াটে লেখকরা এই একই নৃশংস হৃদয়হীন ও কুৎসিত কাজে নিযুক্ত।

উপসংহার :

মনে পড়ে টমাস হার্ডির উপরে উল্লিখিত উপন্যাস 'টেস' এর কাহিনী। গরীব কৃষকের মেয়ে জমিদারের বাড়ি কাজ করতে গিয়ে জমিদারের লম্পট ছেলের পাল্লায় পড়লো। শত প্রতিরোধের চেষ্টা সত্ত্বেও চেতন অবস্থায় তীব্র বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও পরিশ্রান্ত অবস্থায় নিদ্রার কালে উক্ত শয়তানের কাছে তার অমূল্য সম্পদ হারালো। অবৈধ সন্তান নিয়ে ঘরে ফিরলো।

ঔপন্যাসিকের কাছে শ্রেণীর ব্যবধান ও দ্বন্দ্বটা কিছুই নয়। বুর্জোয়া জমিদার সমাজে নারীর অসহায়তাটাও কিছু নয়। সবই দৈবের ফল। ঔপন্যাসিক বলছেন :

In the ill-judged execution of the well judged plan of things the call seldom produces the caller, the man to love rarely coincides with the hour for loving Nature does not often say "See" to her poor creature at a time when seeing can lead to happy doing and reply "Here !" to a body's cry of "Where ?"......We may wonder whether at the acme and summit of human progress these anachronisms will be corrected by a finer intuition, a closer interaction of the social machinery which now jolts us around and along ; but such completeness is not to be prophesied or even conceived as possible.

সর্বনাশের পর তিনি মন্তব্য করছেন :

Why it was that upon this beautiful feminine tissue sensitive as gossamer, and practically blank as yet, there should have been traced such a coarse pattern that it was doomed to receive, why so often the coarse appropriates the finer, thus the wrong man the wrong woman, the wrong woman the wrong man, many thousand years of analytical philosophy have failed to explain to our sense of order.

এ আর এক বিপজ্জনক সুর, হতাশার সুর। যা কিছু ঘটুক এ বিষয়ে এই ধরনের ঘটনা বা তার বেদনাদায়ক পরিণতি থেকে রক্ষার পথ যে সমাজতন্ত্র এই সত্যটাই লেখকের উপলব্ধির মধ্যে নেই। তিনি যেসব প্রশ্ন তুলেছেন বলতে গেলে সমাজতন্ত্র সে সব একরকম অবান্তরই করে দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধনতান্ত্রিক জগতে বিপদের শঙ্কার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এইরূপ লেখক আমাদের সচেতন করে যান। লেখকের অন্ততঃ সে অপরাধ নেই যা আজকের ভাড়াটে লেখকদের আছে। আজকের ভাড়াটে লেখকগণ মিথ্যার বেসাতি করে সবকিছু ঘোলাটে করে বিভ্রান্তি ঘটিয়ে বিপজ্জনক খাদেই শিশু ও কিশোরদের নিক্ষেপ করছে।

বলা বাহুল্য 'টেসের' জীবনের শেষ পরিণতি বিয়োগাত্মক। ব্যক্তিগত

ভাবে তার মনের জ্বালার নিবৃত্তি করলো অপরাধীকে খুন করে এবং ফাঁসির রজ্জুতে তার দণ্ড দিল। লেখক শেষ মন্তব্য করেছেন "The President of the Immortals in Aeschylan phrase ended his sport with Tess."

এও সেই দৈবের কথা। লেখক বলছেন, দৈবশক্তি টেসকে নিয়ে তার খেলা শেষ করলো। কিন্তু সচেতন পাঠক দেখবেন প্রতি পদে টেস যে বিপদের ফাঁদে পা দিয়েছে সবই শোষণবিশিষ্ট সমাজের বুর্জোয়া সমাজের ফাঁদ আর বিচারও সেই বুর্জোয়া সমাজের বিচার। যদি দেশের শিশু কিশোর, যুবক ও যুবতীদের ভাগ্য নিয়ে কেউ খেলা করে থাকে সে কোনও দৈব শক্তি নয়, সে হচ্ছে সম্পত্তি, প্রাইভেট প্রপার্টি, ধনতন্ত্র। মাধ্যম হচ্ছে তাদের দালালরা যাদের নাম তাদের পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা, ফিল্‌ম, মঞ্চ অলঙ্কৃত করে রেখেছে।

কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য দেশের মেহনতী মানুষ সজাগ। এই হিংস্র কুটিল 'স্পোর্টসের' মর্ম তারা বোঝে এবং তার শিকার তারা হবে না। তারা ধনতন্ত্রের এইসব ফন্দি-ফিকির কলা-কৌশল দেখে ব্যঙ্গের হাসি হাসে এবং নেমে পড়ে সংগ্রামের আশু কর্মসূচীর কাজে। তাদের জয় অনিবার্য।

অর্থের প্রয়াস

সব বিষয়ে লেম্যান এবং বিশেষজ্ঞও আছে, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেহেতু লেখকের আবেদন সকলের কাছে, কারও প্রবেশাধিকার বন্ধ করা যায় না। সুতরাং পাঠক হিসাবে আমারও ঢুকে পড়তে বাধা নেই, চর্চা করতেও বাধা নেই। তবু মনে মনে ভাবনা থাকে বিশেষজ্ঞের সংরক্ষিত গণ্ডিতে প্রবেশ করছি না তো? জানি, আমরা অনেকে তা করেও থাকি আর তাঁরা নিজগুণে ক্ষমাও করে থাকেন।

মুস্কিল হয় বোঝার চেষ্টা নিয়ে।

লিখি কিংবা না লিখি, পড়তে গেলে বুঝতে হয়। এই বোঝার ব্যাপার থেকেই শুরু হয় হাঙ্গামা। ধরুন কবি ও কাব্যের ক্ষেত্র। হাফেজের কাব্যের একটি সুপরিচিত অংশ এইরূপ—"গভীর অন্ধকার, ভয়ঙ্কর তুফান, মারাত্মক ঘুর্ণিতে আমরা পতিত, তীরে যাঁরা নিশ্চিন্তে বসে আছেন, তাঁরা আমাদের অবস্থা কি বুঝবেন?" (শবে তারীক ও বীমে মওজ গিরদাবে চুনী হায়েল কুজা দানন্দ হালে মা সবুক সারানে সাহিলহা—দিওয়ান-ই-হাফিজ)। সোভিয়েতের এক সমালোচকের প্রবন্ধে পড়েছিলাম তিনি এই উপমাতে মধ্যযুগের সামন্তশ্রেণীর নিপীড়নে বিক্ষুব্ধ মানুষের ভাষা পেয়েছেন। যেহেতু হাফেজ বা সাদীর কবিতায় কোথাও কোথাও সুস্পষ্টভাবে এরূপ বিক্ষোভের কথা আছে, ওরকম অর্থ অমূলক একথা বলা কঠিন। রামমোহন হাফেজের যে কবিতা তাঁর ফার্সী পুস্তকে উদ্ধৃত করে গেছেন সে উদ্ধৃতি হাফেজের এই ধরনেরই কবিতা। "আর যা কিছু ইচ্ছা কর করে যাও, শুধু অত্যাচারীর অনুসরণকারী হয়ো না। কারণ, আমার সাধন-পদ্ধতিতে এ ছাড়া আর পাপ নেই।" অন্যদিকে যাঁরা উপরে বর্ণিত উদ্ধৃতিটিতে ধর্মভাবের অর্থ পেয়েছেন, তাঁরা মনে করেন এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আত্মার কাতরতা। এরকম পার্থক্য ও মতবিরোধ ঘটবেই, যেমন জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ঘটে।

এইরূপ ঝড়-ঝঞ্ঝার কবিতার কথায় ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের এক কবিতার কথা মনে পড়লো। এঁকে নিয়ে বিপদ আবার এই, শিশুকাল থেকেই মাস্টার-মশায়রা পড়িয়ে আসছেন ইনি প্রকৃতির কবি। সুতরাং এঁর মতো প্রকৃতির কবির স্বভাব বর্ণনার মধ্যে যদি প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে আরও কিছুর ছায়া দেখা

যায়, বেশী কিছু না হোক ঈষৎ নিন্দাসূচক ভ্রূকুটি হয়তো অনেক ললাটেই দেখা যাবে।

যাক্, তাঁর যে বিশেষ কবিতার কথা বলছিলাম। প্যালগ্রেভের সঙ্কলনে এর শিরোনামা হচ্ছে "নেচার অ্যাণ্ড দি পোয়েট"—যদিচ কবির নিজের দেওয়া শিরোনামা হচ্ছে "এলিজিয়াক স্ট্যানজাজ সাজেসটেড্ বাই এ পিকচার অব পীল কাস্‌ল্ ইন এ স্টর্ম পেণ্টেড বাই স্যর জর্জ বোমণ্ট"। (এই শিরোনামার রূপান্তরও লক্ষণীয়)। যে-সব গুণের জন্য ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্য-প্রতিভা প্রসিদ্ধ তার যথেষ্ট এবং বিশেষ পরিচয় এ-কবিতার মধ্যে আছে। কবি বর্ণনা করেছেন—সমুদ্রধারের এক দুর্গের। স্যর জর্জ বোমণ্ট তার ছবি এঁকেছেন—প্রচণ্ড ঝড় ও উত্তাল তরঙ্গ এসে তার উপর আছড়ে পড়ছে। সেই সমস্ত আঘাত সেই দুর্গসৌধের কিছু হানি করতে পারছে না, সাহসের সঙ্গে এসব আঘাতের সে মুকাবিলা করছে। বোমণ্টের ছবিটি দেখে কবি কবিতাটি লিখছেন। বলছেন: "আই লাভ্ টু সী দি লুক উইথ্ হুইচ্ ইট ব্রেভস্—কেস্‌ড্ ইন দি আনফিলিং আরমার অব ওল্ড টাইমস—দি লাইটনিং, ফিয়ার্স উইণ্ড অ্যাণ্ড ট্র্যাম্পলিং ওয়েভস্।" কবি এর আগেই বলে নিয়েছেন, অনেকদিন আগে তিনি এই দুর্গ দেখেছেন। তখন সমুদ্র ছিল শান্ত, ধীর। তখন যদি তাঁর ছবি আঁকবার ক্ষমতা থাকতো আর যদি এই দৃশ্যের ছবি আঁকতেন, তিনি দেখাতেন শান্ত পরিবেশে একটি সৌধ। অর্থাৎ ছবিটা হতো বিপরীত। প্যালগ্রেভের উপরিলিখিত সুপরিচিত সঙ্কলনে সম্পাদক এই কবিতার পরেই ঐ সঙ্কলনে দেওয়া শেলীর কবিতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। শেলীর ঐ কবিতায় শেলী উল্লেখ করছেন, কবি সামনে যা থাকে তাকে ছাড়িয়ে এমন রূপ তাঁর কবিতায় সৃষ্টি করেন যা হয় চিরন্তন। অর্থাৎ উক্ত প্রসিদ্ধ সঙ্কলনের সম্পাদক ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের কবিতার মধ্যে কবি-চরিত্রের ঐ বৈশিষ্ট্যেরই উল্লেখ করতে চাইছেন।

তখনই মনে হয় বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের সঙ্কেতে সম্পাদকের তো শেলীর আর একটি কবিতা মনে পড়তে পারতো—যা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকেই উদ্দেশ্য করে লেখা। সেখানে শেলী দুঃখ করে বলছেন: "তুমি তো একদিন ছিলে সেই তারকা যার আলো শীতের রাতে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে দুর্বল নৌকাকে আলোর নির্দেশ দিত। আর আজ তুমি কোথায়?"

"In honoured poverty thy voice did weave songs concrete to truth and liberty—Deserting these thou leavest me to grieve, Thus having been, that thou shouldst cease to be."

অর্থাৎ শেলী তাঁর উদ্দেশ্যে বলছেন : "দারিদ্র্যের মধ্যেও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তোমার স্বর একদিন সত্য এবং স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে গান রচনা করতো, আর আজ তুমি (দলত্যাগীর মতো) সেই আদর্শ ত্যাগ করে আমাকে এই বিক্ষোভ প্রকাশ করতে ছেড়ে দিয়ে গেলে যে তুমি একদিন ঐরূপ থাকা সত্ত্বেও আজ আর তুমি তা থাকলে না।" এরই প্রতিধ্বনি আবার কয়েক দশক পরে করেছিলেন ব্রাউনিং। বলেছিলেন : "জাস্ট্ ফর এ হ্যাণ্ডফুল অব সিল্ভার হি লেফ্ট্ আস্", শুধু একমুঠো রূপোর বদলে তিনি আমাদের দল ত্যাগ করলেন। বলার কারণও ছিল। ১৭৯২-৯৩ সালে যিনি ফরাসী বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন, ১৭৯৩ সালে বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের যুদ্ধ ঘোষণায় 'শক্ড্' হয়েছিলেন, পরে তিনি কলম ধরলেন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের যুদ্ধের পক্ষে, আর শেষে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচারের অভিযোগ তুলে তার অছিলায় বিপ্লবেরও বিরুদ্ধে। ১৮০৫ সালে লেখা ঐ দুর্গ সংক্রান্ত কবিতার সঙ্গে তুলনা করে দেখতে হয় ১৮০২ সালে লেখা ফ্রান্সের নিকটতম ইংলণ্ডের সমুদ্রতট "ক্যালে"তে লেখা কবিতা। বিপ্লবের ঝড়ে যারা যোগ দিয়েছে তখন তাদের অনেককেই তাঁর মনে হচ্ছে তারা দুর্বল হয়ে মাথা নত করেছে। (অবশ্য নেপোলিয়ানের সম্রাট হওয়ার অজুহাতটা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর প্রতিক্রিয়া বিপ্লবের প্রতি সুবিবেচনাপ্রসূত নয় একথা সহজেই বলা যায়)। বিপ্লবের সঙ্গীদের তখন তিনি দেখছেন বাতাসে দোদুল্যমান সরকাঠির গাছের মতো। বুর্জোয়া-চরিত্রের দোদুল্যমানতার সঠিক ব্যাখ্যাই বটে। তবু যেভাবে সকলকে আনত করেছেন তাতে তিনি নিজে যে পক্ষ পরিবর্তন করেছেন এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। লক্ষ্য করার বিষয় ইংলণ্ডের বুর্জোয়াদের সম্বন্ধে তাঁর এই ধারণা নেই।

অবশ্য পক্ষ পরিবর্তনের স্পষ্টতর সাক্ষ্য ও প্রকাশ্য ঘোষণা তাঁর কাব্যের অন্যত্রও যথেষ্ট আছে। সুতরাং এটাও কি সহজে মনে হতে পারে না "নেচার অ্যাণ্ড দি পোয়েট" কবিতাটিতে এই ধরনেরই একটা বক্তব্যকে তিনি ভাষা দিতে চেয়েছেন? তিনি কি সূক্ষ্মভাবে দেখাতে চাননি—ফরাসী বিপ্লবের তুফানে সব যখন ভেসে গেল ইংলণ্ডের বুর্জোয়া অভিজাতদের মিলিত নেতৃত্বে পরিচালিত রাজমুকুট অলঙ্কৃত রাষ্ট্র সমস্ত আঘাতকে উপেক্ষা করে অজেয় দুর্গের মতো টিঁকে থাকলো? উদ্ধৃত কবিতাংশের মধ্যে "আরমার অব ওল্ড টাইমস" বা প্রাচীন বর্ম কথাগুলি লক্ষণীয়।

এদিকে দেখি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের অধীনতা ও পুরাতন জীর্ণ সমাজের

বন্ধনে জর্জরিত ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথের কিন্তু ভিত নড়াতেই এসেছিল আনন্দ :

"ঝড় এসে তোর ঘর ভরেছে,
এবার যে তোর ভিত নড়েছে
শুনিসনি কি ডাক পড়েছে
নিরুদ্দেশের দেশে গো।

*　　　*　　　*

কিসের তরে চিত্ত বিকল
ভাঙুক না তোর দ্বারের শিকল
বাহিরপানে ছোট না, সকল
দুঃখসুখের শেষে গো।"[১]

কিংবা রবীন্দ্রনাথের আর একটি কবিতায় :

"বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছি, আকাশে,
ক্রুদ্ধ মুনির মতো ঐ গাছ মাথা তুলেছে
তার শাখায় শাখায় ভর্ৎসনা।
"গলির দুই ধারে কোঠাবাড়িগুলো হতবুদ্ধির মতো,
আকাশের অত্যাচারে
প্রতিবাদ করবার ভাষা নেই তাদের।
একমাত্র ঐ গাছটার পত্রপুঞ্জের আন্দোলনে
আছে বিদ্রোহের বাণী,
আছে স্পর্ধিত অভিসম্পাত।
অন্তহীন ইটকাঠের মূক জড়তার মধ্যে
ঐ ছিল এক মহারণ্যের প্রতিনিধি—
সেদিন দেখেছি তার মহিমা
বৃষ্টিপাণ্ডুর দিগন্তে।"[২]

১. বলাকার দ্বিতীয় কবিতা (লেখার তারিখ ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১) কবি ঐ সময়কার তাঁর অনুভূতি সম্বন্ধে লিখেছিলেন : "আমার মনে হয়েছিল যে, আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসানপ্রায়, মৃত্যু-দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন।"

২. "তেঁতুলের ফুল, শ্যামলী" (লেখার তারিখ ৬ই জুন, ১৯৩৬)।

"জড়তার মধ্যে ঐ ছিল এক মহারণ্যের প্রতিনিধি"—এখানে মহারণ্যের পশ্চাৎপটটি লক্ষণীয়।

প্রগতিবিমুখতার কথায় ফিরে এসে সুক্ষ্মভাবে পরিবেশিত প্রগতিবিমুখতার দৃষ্টান্ত আরও অনেক স্মরণে পড়ে। ইংলণ্ডের গ্রামের গরীবরা শিল্পবিপ্লব এবং তার পূর্ব হতেই যেভাবে জীবন-জীবিকার জন্য শহরে আসতে বাধ্য হয়েছিল তাদের ইতিহাস আমাদের দেশের অনুরূপ ক্ষেত্রের ইতিহাসের মতই বেদনাদায়ক। ইংলণ্ডের বুর্জোয়া উন্নয়ন সার্থক হওয়ায় সেই শোচনীয় অবস্থা নেই, আমাদের এখনও আছে এই যা তফাৎ। যাই হোক, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের লেখায় ইংলণ্ডের এই গরীবদের দুঃখ ব্যথা ও বেদনা সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে যদিচ প্রগতিবিমুখতার এই সুরটি থেকে গেছে, যেন পূর্বের সামন্ততান্ত্রিক অবস্থাতে থাকলেই ভাল ছিল। ১৭৭০ সালের ৭ই এপ্রিলে তাঁর জন্ম আর ১৮৫০ সালের এপ্রিলে তাঁর মৃত্যু। এই আশি বৎসরই আবার ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের তীব্রগতিতে রূপান্তরের কাল। এঙ্গেল্‌সের '১৮৪৪ সালে ইংলণ্ডে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা' পুস্তকে এই বিরাট ওলটপালটের ইতিহাস এবং ব্যাখ্যা আছে। দেখানো আছে কেমন করে গ্রামগুলি ভেঙ্গে শহর এবং পরে বৃহত্তর শহরে পরিণত হচ্ছিল। ইংলণ্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য বেড়ে সাত সমুদ্রে ইংলণ্ডের জাহাজ পাড়ি দিচ্ছিল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সার্থক কলমে এ-সবেরই কিছু কিছু ছবি ফুটে উঠেছে। যদি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর কথাটা বাদ দিয়ে ধরা যায় দেখা যাবে মানুষের মর্মান্তিক ব্যথা-বেদনার কাহিনী তাঁর কাব্যে আজও জীবন্ত হয়ে আছে। অবশ্য তাঁর বক্তব্য থেকে বিদ্রোহের কথা বেরিয়ে আসে না, শেলীর প্রমিথিউস আনবাউণ্ডের নিপীড়িত রক্তশোষিত বিপ্লবী কর্তৃক স্বৈরাচারীর মুখে ছুঁড়ে দেওয়া সেই কথায় যেমন আসে —"these pale feet they might trample thee, if they disdained not such a prostrate slave." তা হলেও সতর্ক ও সচেতন পাঠকের কাছে ঐরূপ বাণী উচ্চারিত হবার সহায়ক ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করে। কিন্তু সমস্যাটা সেইখানে। সতর্কতা ও সচেতনতার প্রয়োজন। তা হলেই বুঝতে অসুবিধা হয় না। কারণ, ভাষা ও বিষয়বস্তুর পরিবেশনে সরলতার দিক থেকে এই কবির সৃষ্টি সর্বকালের অতুলনীয় সৃষ্টির মধ্যেই গণ্য।

উপরের সম্পূর্ণ বক্তব্যের নিদর্শনের অভাব তাঁর কবিতায় নেই। দুই একটির এখানে উল্লেখ করব। ধরুন, সেই সুপরিচিত ক্ষুদ্র কবিতাটি—সাইমন লী দি ওল্ড হাণ্টস্‌ম্যান। সাইমন লী'র পুরাতন পেশা ছিল এই যে সে ছিল জমিদারের পালিত পেশাদার শিকারী। মালিকের সাথে শিকারে ঘোড়া আর কুকুর ছিল

তার সঙ্গী। ইংলণ্ডের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে-মালিকও নেই, সেই ঘোড়া কুকুরও নেই। চাষের কাজ সে জানে না। শেষ বয়স নিদারুণ দারিদ্র্যে কাটছে। কবি বিষাদের মধ্যেই একটি লক্ষণীয় বিষয়ের উল্লেখ করতে ভোলেন-নি। He lived in liveried poverty—দারিদ্র্যের মধ্যেও তার সেই পুরানো জীর্ণ জমিদারের ভৃত্যের চাকচিক্যের পোশাকটি ছিল। যাই হোক, এই বৃদ্ধের শেষ পরিণতিকে বেদনাদায়ক করে কবি উপস্থিত করেছেন। ইংলণ্ডের যে পুরাতন গ্রাম্য-জীবনে এই মানুষটির সুখের জীবন ছিল সেই পুরাতন গ্রাম-সমাজে কি ধনীর বিলাসের অন্যতম উপকরণে পরিণত এইরূপ মানুষের চেয়েও বেশী দুঃখী মানুষ ছিল না? তাঁতী যাদের কাজ গেল কিংবা চাষী যাদের জমি গেল তাদের হীনাবস্থা ঐ সব ধনী ও জমিদারদের কাজের ফলেই। দ্বিতীয়তঃ, লিভারী পরা সামন্ত-অভিজাতের খানসামার চেয়ে ল্যাঙ্কাশায়ার ও ম্যানচেস্টারে শ্রমিক হয়ে গরিব নিজের আত্মসম্মানের সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর মানব-সমাজের মুক্তির পথ রচনা করছিল না? এঙ্গেল্‌স্ উপরোক্ত পুস্তকে এবং 'হাউসিং কোশ্চেন' পুস্তকে দেখিয়েছেন সে তাই করছিল।

সুপ্রসিদ্ধ "মাইকেল" কবিতাটি আর এক নিদর্শন হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। বৃদ্ধ চাষী মাইকেল-দম্পতির শেষ বয়সের একমাত্র পুত্রকে তারা তাদের ছোট খামারে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যাবে বলে নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছিল। এমন সময় এলো আঘাত। একজন আত্মীয়ের জন্য বৃদ্ধ জামিন ছিল। অপ্রত্যাশিত সঙ্কটে সেই আত্মীয়ের বৈষয়িক বিপর্যয় ঘটে। ফলে মাইকেলেরও সম্পত্তি যাবার মতো হয়। শেষে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের আশায় তারা পুত্রকে পাঠালো শহরে উন্নতি করার জন্য। পুত্র প্রথমে উন্নতি করলেও অসৎসঙ্গে পড়ে অপরাধী হয়ে বিদেশে পালালো। আশাহত মাইকেল-দম্পতির শেষ জীবন নিতান্ত দুর্দশা ও দুঃখে কাটলো। অপ্রত্যাশিত ব্যবসায়-সঙ্কট যা ঐ চাষী-পরিবারের আত্মীয়ের বিপর্যয় ঘটালো এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের কঠিন শ্রমে অর্জিত শান্তির জীবনকে অতর্কিত আঘাতে মোচড় দিয়ে দুর্দশায় নিক্ষেপ করলো—তা ধনতন্ত্রেরই চরিত্র। যেভাবে ভীড় করে ঘিঞ্জি বস্তিতে অনশন ও অর্ধাশনে শহরে শ্রমিকদের থাকতে হতো এবং পাপের পথে তাদের একাংশকে ঠেলে দেওয়া হতো বা প্রলুব্ধ করা হতো, সেও ধনতন্ত্রেরই কাজ। এও এঙ্গেল্‌স্ দেখিয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে কবি সবই একদিকে দুর্ভাগ্য এবং অন্যদিকে শ্রমিক-সন্তানের নৈতিক অবনতির উপরই সব দোষটা চাপিয়ে দিলেন। মাইকেলের ছেলে গ্রামেই থাকতে পারলো না কেন? কবি নিজেই বলছেন:

.....If here he stay,
What can be done ? Where everyone is poor,
What can be gained ?"

গ্রামের এ অবস্থা হল কেন ?

আর একটি অনুরূপ কবিতা "রিপেনটেন্স" (অনুতাপ) বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। ইংলণ্ডের চাষীরা কিভাবে বাধ্য হয়ে গ্রাম থেকে বিতাড়িত হচ্ছিল, ঋণ, কর্জ, মর্টগেজের দায়ে ছোট ছোট জমির টুকরোগুলি ধনিকের নিকট বিক্রয় করে আসতে বাধ্য হচ্ছিল তার উল্লেখ পূর্বে করেছি। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এ ঘটনা সুপরিচিত। কিন্তু কবি বিক্রি করার ঘটনাকে লোভ ও লালসার কারণে বিক্রয়ে পর্যবসিত করলেন। "দি ফিল্ডস্ হুইচ্ উইথ্ কভেটাস্ স্পিরিট উই সোল্ড।"—অনুতপ্ত কৃষক নিজের হারানো জমির উল্লেখে বলছেন, যে-জমি আমরা লালসার তাড়নায় বিক্রয় করেছি। তারপর অনুতপ্ত হৃদয়ে অতীতের মালিক ঐ দরিদ্র কৃষক নিজের সেই ক্ষেতের কাছে দাঁড়িয়ে দুঃখ করছে। এই হচ্ছে কবিতার কাহিনী। গরীবরা যে-সব মর্টগেজ, বণ্ড্ প্রভৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে শেষে বাধ্য হয়ে জমিহীন হয় একথা কবিরও জানা। "ব্রাদার্স" নামক এক কবিতায় তিনি বলেছেন :

"Year after year the old man still kept up
A cheerful mind—and buffeted with bond
Interest and mortgages : at last he sank,
And went into the grave before his time."

বৎসরের পর বৎসর বৃদ্ধ তবুও মনটা স্ফূর্তিতে রেখেছিল এবং খত, মর্টগেজ ও সুদের সঙ্গে লড়ে চলেছিল। শেষে অকালেই কবরে ঢলে পড়লো।

কিন্তু এই ক্ষেত্র-বিশেষে বিষয়টি কবিতার প্রথম বিষয়বস্তু নয় বলেই এ উল্লেখে কবির অসুবিধা হয়নি এমন ধরা যেতে পারে। কিন্তু "রিপেনটেন্স"-এ তিনি শ্রমিকের লোভ, লালসা, অবিমৃষ্যকারিতার উপরই দোষারোপ করেছেন। এই কবিতার সঙ্গে সহজেই রবীন্দ্রনাথের "দুই বিঘা জমির" তুলনা এসে যায়। রবীন্দ্রনাথ সেখানে জমিদারদের লোভ-লালসার নগ্ন চরিত্র কি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। "...পরে মাস দেড়ে ভিটা মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে, করিল ডিক্রি সকলই বিক্রী মিথ্যা দেনার খাতে।... রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।" ধনতন্ত্র কিরূপে মানুষের সব কিছু সুমিষ্ট বন্ধনকে ছিন্ন করে দেয়, মায়া-মমতাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় তার বর্ণনা মার্কস্-এঙ্গেলস্ কমিউনিস্ট ইস্তাহারে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাতে এরও যেন কিছু অভিব্যক্তি পাওয়া গেছে : "ধিক্ ধিক্ ওরে শতধিক্ তোরে, নিলাজ কুলটা ভূমি। যখনি যাহার তখনি তাহার এই কি জননী ভূমি!" কিন্তু ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের উল্লেখিত কবিতাটিতে ধিক্কারটা জমি থেকে উৎখাত কৃষকের উপর :

"When I walk by the hedge on bright summer's day
Or sit in the shade of my grandfather's tree
A stern face it puts on, as if ready to say,
What ails you that you must come creeping to me!"

যেন জমিটাই কঠিন মুখ করে তিরস্কার করছে, যেন বলতে চাইছে : "তুই তো বিশ্বাসঘাতকতা করে পুরুষানুক্রমের সম্পর্ক লোভের বশবর্তী হয়ে ছিন্ন করলি—এখন কেন কোল ঘেঁসে আসছিস?"

এঙ্গেল্স্ দেখিয়েছিলেন যদিচ দারিদ্র্য ও অত্যাচারের ফলেই গরীবকে তার ভিটের বন্ধন থেকে ছিন্ন হয়ে শহরে আসতে হয়েছিল, যা ঘটেছিল তার শেষ পরিণতি ভালই। তিনি বলেছিলেন—১৮৭২ সালে ইংলণ্ডের প্রলেতারিয়ান্ "হেঁসেল আর ঘরের মালিক" গ্রাম্য তাঁতীর চেয়ে অন্তহীন পরিমাপের উচ্চস্তরের। রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও তার প্রতিধ্বনি পাই :

"মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে
তাই লিখি দিল বিশ্ব নিখিল দু'বিঘার পরিবর্তে।"

সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের গফুর, অরক্ষণীয়া ও অন্যান্য কয়েকটি পল্লী চিত্র মনে পড়ে। কোথাও গরীবকে দায়ী করা হয়েছে বলে সহসা মনে পড়বে না। তারাশঙ্করের গ্রামের কাহিনীও মনে পড়ে। অত্যাচারের কাহিনী সেখানে নেই তা নয়। গ্রাম ভেঙে পড়ার হা-হুতোস্মি অনেক আছে। কিন্তু মনে হয় না কি গ্রাম ওলট-পালট হওয়া এবং গ্রাম ছেড়ে শহরে আসা এই সমস্ত ব্যাপারে যোগ-বিয়োগ করে অঙ্কের শেষে যা দাঁড়ায় তাতে তার বেশ একটা বড় দায়িত্ব গরীবের কাঁধেই চাপানো হয়েছে?

তাই বলছিলাম। নিছক পাঠক হওয়া ও পড়তে যাওয়ারও অসুবিধা আছে। বুঝতে হয়। বুঝতে গেলেই মুশকিল হয়। বহু বিজ্ঞাপিত গরীবের বন্ধুদের ঠিক আর তেমনটি যেন মনে হয় না। অনেক সময় বিপরীতটাই সন্দেহ করার কারণ ঘটে না কি?

কিপলিং

গত ডিসেম্বর মাসে কিপলিং-এর জন্মের একশত বর্ষের পূরণ হল।

পশ্চিমী মহলে বড় একটা ঢাকঢোল বাদ্যি করে এই শতবার্ষিকী পালন করা সম্ভব হল না বটে, তবু কিছু ডুগডুগি বাজল—কিছু পট্‌কা ফুটল।

পশ্চিমে—বৃটেনে ও আমেরিকায়—শাসকশ্রেণী ও তাদের প্রভাবান্বিত সমাজে রোমাঞ্চের একটা শিহরণ খেলে যায় যখন "সুয়েজের পূবে, ইস্ট অব্ সুয়েজ" কথাটা কানে আসে। লোভী, হিংস্র, দুর্বৃত্ত শ্রেণীর লোক বলেই আমরা জানি সেইসব পশ্চিমী মানুষদের—ক্লাইভ আর হেষ্টিংসের দল; ড্যালহাউসি, অকটারলনি, লরেন্সের দল; কিচেনার ও ডায়ারের দল, যারা যুগে যুগে "সুয়েজের পূবে" (বা অন্যত্র) পাশ্চাত্য সাম্রাজ্য বিস্তারের ভিত্তি স্থাপন করছিল বা সেই সাম্রাজ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে এসেছে। এদেরই কুৎসিত ক্রিয়াকর্ম কালা আদমীকে সভ্য করার গুরু ও মহৎ দায়িত্ব বলে প্রচার করলেন বৃটেনের শাসকশ্রেণীর প্রচারক ও অনুচরেরা। কিপলিং শেষোক্তের প্রধানতম। "ইস্ট অব্ সুয়েজ—সুয়েজের পূব" কথাটাও তাঁর কবিতা থেকেই। ('মান্দালয়'—কিপলিং)

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইংলণ্ডের জনসাধারণের (এমনকি শাসকশ্রেণীর একাংশের) মধ্যে ঐসব পরদেশ লুণ্ঠনকারীদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল না। উপদলগত দ্বেষবিদ্বেষ, শ্রেণী-বিরোধ (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায় স্বার্থসম্পন্ন ধনিক বনাম শিল্পস্বার্থ ও অন্যান্য ধনিক) প্রভৃতি নানান কারণে লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেষ্টিংসকে লর্ড সভায় আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় ও দীর্ঘদিন ধরে ভারতে অনুষ্ঠিত তাদের অত্যাচার, অনাচার ও দুর্নীতির বিচার চলে। এই ঘটনায় অভিযোগকারীরা জনসমর্থন পান উপরে উল্লেখিত কারণে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফরাসী বিপ্লবের কখনও বড় ঢেউ, কখনও ছোট ছোট উর্মিমালা বয়ে যাচ্ছিল ইউরোপের বিভিন্ন দেশের উপর দিয়ে। শ্রমিকশোষণ বেশ কড়া মাত্রায় চলছিল। ফলে মজুরশ্রেণীর মধ্যে বিক্ষোভ ও আন্দোলন। সামন্তযুগের পশ্চাৎপদতা তখনও অনেক বিষয়ে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বিকাশ, প্রসার ও গতিকে বাধা দিচ্ছিল। ফলে শক্তিশালী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনও জেগে ওঠে। শেলী বাইরনের কবিতা তখন ইউরোপের দেশে দেশে

Works of Kipling.

জনপ্রিয়। শেলী উপরোক্ত পরদেশ লুণ্ঠনকারীদের বলছেন, 'সমাজের আবর্জনা, যা কিছু নিকৃষ্ট তার তলানী' ('Refuse of society, dregs of all that is vile')। এই আবহাওয়ায় সাম্রাজ্যের রোমান্স আর তার ভাবানুভূতির মাদকতা বেশী জমতে পারত না। শেষে চীন ও ভারতের বিস্তৃত বাজার ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ধনতন্ত্রের প্রসার ও স্ফীতির সুযোগ করে দিল। উপনিবেশের শোষণপুষ্ট সমাজে ধীরে ধীরে জনসাধারণের মধ্যে এমন কি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও উপরতলার এক থাক দেখা দিল। জোসেফ চেম্বারলেন ও রোড্‌স্ তখন সাম্রাজ্যবাদকে একটা রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে খাড়া করেছেন। তখন আর সে অন্যমনস্কতার ভাব নাই যে কেমন করে অন্যমনস্কভাবে সাম্রাজ্যটা যেন এমনিই এসে গেল। এখন নির্লজ্জভাবে 'হোয়াইটম্যান্‌স্ বার্ডেন' তত্ত্ব প্রচার হতে লাগল। বলা হল কালা আদমীকে সভ্য করার দায়িত্ব সাদা মানুষের ঘাড়ে এক বোঝা—যা ঈশ্বর নির্দেশে বহন করতে হচ্ছে এবং করতে হবে। নিরুদ্বিগ্ন ধনতন্ত্রের প্রসারে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল হাল-পয়সার ধনী। তাদের ধনের জলুসের উৎকট চাকচিক্য ও উলঙ্গ আত্মপ্রচারের চিহ্ন সর্বত্র—তাদের ঘরের স্থূলকায় আসবাবপত্র থেকে শুরু করে তাদের প্রধানমন্ত্রী লর্ড বেকন্সফিল্ডের আংটির বহরে (সবকটা আঙুলে আংটি ভরে থাকত)। এইসবের শীর্ষে যা, তাকেও মানানসই করে নিতে হবে। শুধু রানী ডাকে পোষাচ্ছিল না, তাই ক্ষুদ্র বৃটেনের মহারানী হলেন 'সম্রাজ্ঞী'—সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া। এমন সমারোহে ভাঁড়েরও দরকার। ডাক পড়ল কবির। কবি জুটছিল, যেমন বরাবরই জুটেছে। ধনতন্ত্রের উন্মেষের যুগে শাসকশ্রেণী পেয়েছিল খ্যাতিমান ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে—"এক মুঠো রূপোর বদলে তিনি ছাড়লেন আমাদের" (ব্রাউনিং)। অথচ তিনি গরীবকে উপদেশ দিলেন 'rapine, avarice, this is idolatry' 'লোভ লালসা, মাৎসর্য এ হোল পৌত্তলিকতা'—অতএব পরিত্যজ্য। সামন্ত প্রভাবাচ্ছন্ন ধনতন্ত্রের ছত্রছায়ায় ধননিন্দা! এ রকম গুরুগম্ভীর নীতিবচনে আর চলছে না। ধনতন্ত্রের সহজ প্রসারের যুগ আর নাই। চারিদিকে তাকে দ্বন্দ্বমান শক্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এখন বরং দরকার ছিল সাম্রাজ্য সম্বন্ধে লাজ লাজ ভাব কাটিয়ে তোলা, পাপবোধকে দূর করা এবং লোভলালসার পিছনে মানুষকে ধাবিত করে, মাতিয়ে তুলে, ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের অস্ত্র হিসাবে নিযুক্ত করা। কিপলিং-এর স্তুতিকার কবি টি-ই-এস ইলিয়ট দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করেছেন: 'অত্যন্ত বেশী সংখ্যার লোকের কাছে সাম্রাজ্যটা একটা ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপার (সামথিং টু এপোলজাইজ ফর) দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কারণ, (তাদের মতে) সাম্রাজ্যটা তো

ঘটনাচক্রে উদ্ভূত। উপরন্তু এটা সাময়িক ব্যাপার, শেষে কোনও ইউনিভারস্যাল ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশনের (বিশ্ব সমিতির) মধ্যে মিলিয়ে যাবে।' (কিপলিং-এর পদ্যসঞ্চয়নের ভূমিকা : টি-ই-এস ইলিয়ট)। তিনি কিপলিং-এর জঙ্গীবাদ ও জাত্যভিমানকে 'পেট্রিয়টিজ্‌ম্' বা দেশভক্তি আখ্যা দিয়েছেন এবং দুঃখ করেছেন "পেট্রিয়টিজ্‌ম্ ইজ ইটসেল্ফ্ এক্সপেক্টেড টু বি ইনআর্টিকুলেট—দেশভক্তিই উচ্চারিত হবে না এইরূপ প্রত্যাশিত।' অর্থাৎ তাঁর দুঃখটা এই যে সাম্রাজ্যবাদের উলঙ্গ প্রচার সোচ্চার হতে পারছে না।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এইরূপ প্রচারকের প্রয়োজন হল সাম্রাজ্যবাদের। এ প্রয়োজন মেটাবে এমন কবি কে? বুর্জোয়ার দরবারী কবি (পোয়েট-লরিয়েট) টেনিসানের বা সুইনবার্নের কাজ এ নয়। তাছাড়া ইংলণ্ডের বাইরে যে-ইংলণ্ড বিস্তৃত তার সাক্ষাৎ পরিচয়ও তাদের ছিল না।

"What does he know of England who only England knows?' 'যে শুধুই কেবল ইংলণ্ড জানে সে ইংলণ্ডের কি জানে?' (কিপলিং)

সত্যই তো? যে-ইংলণ্ড শঠতা করে, জাল দলিল সই করতে পারে (উমিচাঁদের দলিল), তাঁতীদের হাত কেটে দেয়, ভারতের স্বাধীনতার সৈনিকদের রাস্তায় রাস্তায় লট্‌কে ফাঁসী দেয়, চা-বাগান আর কয়লাখনিতে, কলে-কারখানায় নিষ্ঠুরভাবে শ্রমিক নির্যাতন করে লুঠ করে, ধনসম্পদ নিয়ে যায়, সে ইংলণ্ডকে যে দেখল না সে ইংলণ্ডের দেখল কি? ইংলণ্ডের জানলই বা কি?

তাই ডাক পড়লো সেই লেখকের যিনি সাম্রাজ্যের ফাঁড়িতে ফাঁড়িতে লাহোর, কলকাতা, সিমলায় স্থানীয় খবরের কাগজের স্তম্ভে আর ছন্দ গাঁথার মাধ্যমে সম্রাজ্ঞীর কর্তব্যরত সন্তানদের ভাঁড়ামীর আনন্দ সরবরাহ করতেন। এঁরই নাম রাড্‌ইয়ার্ড কিপলিং।

জন্ম ১৮৬৫ সালে বোম্বাই-এ। পিতা জে. লকউড কিপলিং কিউরেটার। শৈশব কাটল ভারতে। কৈশোরে বিলাতে স্কুলে ও হোস্টেলে কষ্ট পেতে হয়েছে। যাই হোক, শেষে কয়েকরকম হোঁচট খেয়ে ১৮৮২তে ভারতে ফিরে এসে লাহোরের সিভিল মিলিটারী নামক সাহেবদের কাগজের সাব্ এডিটার। ১৮৮৬তে বেরোলো "ডিপার্টমেণ্টাল ডিটিজ" (পদ্য)। ১৮৮৭তে 'প্লেন টেল্‌স্ ফ্রম হিল্‌স্' প্রভৃতি লিখেই নাম করলেন। ভারতে থাকতে থাকতেই এসব। ১৮৮৯-র মধ্যেই প্রসিদ্ধ। নোবেল প্রাইজও পেলেন।

আসর জমালেন কি ভাবে?

সোজাসুজি সাম্রাজ্যরক্ষা, সাম্রাজ্য বিস্তার আর তলোয়ার ও আগুনের ডাক :

"দূর হঁটো—হঁটো ভাগো—
উইণ্ডসারের বিধবার (ভিক্টোরিয়ার)
সাম্রাজ্যের সীমানার দূরে থাক।
আধা জগৎ তাঁর
আমরাই দিয়েছি তাঁকে,
তলোয়ার দিয়ে আর আগুনের ফিন্‌কি ছুটিয়ে···
নিজেদের হাড় দিয়ে
এই সাম্রাজ্যকে
আমরা সোনা করেছি, সরস করেছি ··
সল্‌টেড উইথ আওয়ার বোন্‌স্···"

—(উইণ্ডসারের বিধবা : কিপলিং)

এই 'আমরা' কারা ? "কুক্‌স্ সান্, ডিউক্‌স্ সান্" "রাঁধুনীর ছেলে ডিউকের ছেলে,···আজ সবই এক, প্রত্যেকেই দেশের কাজে প্রাণ দিচ্ছে···।" কিন্তু ? একটা বড় 'কিন্তু' ! "হু ইজ টু লুক আফটার দি গার্ল ?" নিহত সৈনিকের বিধবা বৌটাকে কে দেখবে ? ডিউকের ছেলেকে তো ভাবতে হয় না, রাঁধুনীর ছেলেকে হয়। ঐ বিধবা বৌ-এর জীবিকার জন্য কিপলিং-এর সমাধান "হ্যাট পাস কর —ভিক্ষা দাও—এতে তোমারই ক্রেডিট, তোমারই মান ?" ('দি এ্যাবসেণ্ট মাইনডেড বেগার'—কিপলিং)। মান কিসের ? মান কেন ? ইংরাজের সাম্রাজ্য হল না ? তুমি তো ইংরাজ ! সুতরাং ভিক্ষা দাও। কিন্তু কিপলিং-এর যে 'দেশভক্ত' প্রাণ দিল, সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি আরও কয়েক লক্ষ একর বৃদ্ধির জন্যে প্রাণ দিল, তার মানের কি হল ? বিধবা বৌ-এর হাতে ভিক্ষা পাত্র ? ধনতন্ত্রের সেবক 'দেশভক্তের' শেষ দশার-প্রকৃষ্ট পরিচয় ! উনবিংশ শতাব্দীর এক আদর্শবাদী কবির (ক্রিস্টিনা রসেটির) কল্পিত স্বর্গে ছিল সকলের স্থান—'ইজ দেয়ার স্পেস ফর এভরিওয়ান ? আর, ফর অল হু কাম্'—যে আসবে তারই জায়গা আছে।' কিপলিং-এর শ্মশানে আমন্ত্রণও কি তারই প্যারডি ?

আমরা দেখলাম বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৯৪২) ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক টি-ই-এস ইলিয়ট হাতে ভগবান খৃষ্টের জপমালা নিয়ে বুকের ভিতর এইরূপ কুৎসিত এবং সোচ্চার 'দেশভক্তি' শোনার কামনা লালন করেন। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর শেষে সাম্রাজ্যের জাঁকজমক ও ধনসম্পদ স্ফীত অথচ জন্মের

সম্মুখে আক্রমণমুখী (এগ্রেসিভ) ইংলণ্ডের বুর্জোয়া ও তাদের প্রভাবান্বিত সমাজে কিপলিং যে জনপ্রিয় হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি ?

ফানুসের মত খ্যাতি উঠল। ফানুসের মত না পড়লেও খ্যাতির দীপ্তি ম্লান হতে শুরু করল খুব শীঘ্রই এবং সম্পূর্ণ মিলিয়ে যেতেও বিলম্ব হল না। ১৯০০ সালেও একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক (রিচার্ড লি গ্যালিয়েন) ৩৫ বৎসরের যুবক কিপলিং-এর খ্যাতিকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে বই লেখেন। তিনি অবশ্য লিখলেন তাঁর নিজের বক্তব্যই, যথা : 'দি ইংলিশম্যান অ্যাজ ব্রুট'—পশু ইংরাজের সমর্থনেই কিপলিং-এর বেশী খেলা। আরও বললেন : '…প্রগতিশীল চিন্তাধারার পক্ষে ইংলণ্ডে এরূপ বিপদ অনেকদিন দেখা দেয়নি। আমাদের সর্বোত্তম কবি, সাহিত্যিক, সামাজিক, অর্থনীতিবিদ যা' কিছু কাজ এতদিন করে গেছেন, এই লোক (কিপলিং) তাব শক্তিশালী শত্রু…'।

সমালোচনা তাঁর ঠিকই, কিন্তু কিপলিং-এর শক্তির পরিমাপে তিনি ভুল করেছিলেন।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই স্বনামখ্যাত কার্টুনিস্ট ম্যাক্স বীয়ারবোম কৃত ব্যঙ্গ চিত্রে ও প্রদর্শনীতে একটি লক্ষণীয় ব্যঙ্গচিত্র দেখা গেল। ছবির বিষয়বস্তু : ত্যক্ত আসবাবপত্রের গুদাম ঘরের (জাঙ্ক রুমের) শেষে অবস্থিত এক কোণে কিপলিং-এর পিতলের একটা মূর্তি। অর্থ পরিষ্কার। শিল্পী দেখাতে চেয়েছেন কিপলিং এমনই এক পাশে পড়ে গেছেন যে কারও নোটিস নেওয়ার মত বস্তু থাকছেন না। বিরোধিতার কশাঘাতও আর আকর্ষণ করতে পারছেন না।

ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসোন্মুখ অবস্থার সম্মুখে তার হামবড়ামি আস্ফালন আর ভাঁড়ামির ক্ষেত্র ক্রমোত্তর সঙ্কুচিত। বাস্তব অবস্থার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না, ঠোকর খাচ্ছে। একই আবেদন এখন পরিবেশন করতে হবে রেখে ঢেকে সুচতুর কৌশলে। সুতরাং কিপলিং-এর খ্যাতি এখন ঊর্ধ্বগতি থাকবে কি করে ? ঘটনাস্রোতই তাকে উল্টে দিচ্ছিল।

ধরুন ভারতবাসীর আর্মস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর কবিতা : হরিচন্দর মুখার্জী ব্যারিস্টার-এ্যাট-ল, বাড়ী তার বৌবাজার, গভর্নমেণ্টের কাছে তলোয়ার আর গান লাইসেন্সের জন্য প্রার্থনা করলেন।

> '…Govt of India winked a wicked wink
> and asked Chander Mukherjee to stick to pen and ink
> They are safer implements…'

ভারত গভর্নমেণ্ট চোখ ঠেরে বললেন, তার চেয়ে কলম কালি ভাল, ওগুলো

বেশী নিরাপদ। শেষ পর্যন্ত ভারত গভর্নমেণ্ট অনুমতি দিলেন। এত অস্ত্রশস্ত্র দেখে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের দুর্ধর্ষ মানুষেরা (যাদের থেকে, তাঁর মতে, ইংরাজ আমাদের নিরাপদে রেখেছিলেন) আকৃষ্ট হল। শেষ পর্যন্ত অস্ত্রও গেল, মুখার্জীও গেল।

এই তো তার বিদ্রূপ। কিন্তু বেশী দিন গেল না। আর বিদ্রূপের অট্টহাস্যকে স্তব্ধ করে বাঙ্গালী ছেলের হাতের রিভলবারের বুলেট সাহেব আর সাহেবের অনুচরদের বুকে বসল। ধ্বংসোন্মুখ সাম্রাজ্যবাদ জাগ্রত জাতীয়তাবাদের সম্মুখীন হল ও মার খেল।

সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষ্য করার বিষয় কিপলিং-এর বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তু ভারতের সেই শ্রেণীর চরিত্র যারা তাদের ভিক্ষাপ্রার্থী। 'বেশ চিকনচাকন ঘৃতসিক্ত নধর দেহ বাবুটি আছেন বসে—বৃটিশ সরকারকে সেবা করে টাকার থলি আর পেটের আয়তন দুইই বেড়েছে।' বৃটিশ বাহিনীকে আক্রমণ করতে এসে হরেন্দ্রের গাড়ি উল্টে তার তলায় পড়ে এবং হরেন্দ্রের ভারী পেটের চাপে ব্রহ্মদেশের দেশভক্তের মৃত্যু ঘটল। শহীদের মাথার পুরস্কার ঘোষণা করা ছিল। সেই মাথা কেটে পাঠিয়ে দিয়ে সরকারের সেবক হরেন্দ্র পুরস্কার প্রার্থনা করল, শেষে লিখল : '…চিলড্রেন ওয়াণ্ট ফুড…শো অ'ফুল কাইণ্ডনেস্ টু মী—আই অ্যাম গ্রেটফুল মাস্টার, এচ. মুখার্জী…' ('দি ব্যালাড অব বোহ ডা থোন'—কিপলিং)। ইংরাজের সেবা করে এবং ইংরাজের অনুগ্রহপুষ্টিতে যে উপরতলার সমাজ গড়ে উঠেছিল, মোটমাট তারই উত্তরাধিকারীদের একটা অংশ আজিকার শাসক-শ্রেণী। মাঝে মাঝে মনে হয় শেষোক্তদের এবং তাদের বর্তমান সহচর যেসব বুদ্ধিজীবী তাদের কিছুটা কিপলিং পড়া ভাল, আত্মগরিমার ঔষধ হিসাবে। "তৈলমাথা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রারসে ভরা…দাস্যসুখে হাস্যমুখ বিনীত জোড়কর প্রভুর পদে সোহাগ মদে দোদুল কলেবর" যে-সব ভারত সন্তান মার্কিন সরকারের প্রতিনিধির নিকট প্রার্থী হয়ে দাঁড়ান, তাঁরা অনেকে হয়তো কিপলিং-এর আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখতে পাবেন। ইংরাজ আমলে বাংলার লাট তাঁর সরকারসহ দার্জিলিং যেতেন। ব্যবসাবাণিজ্য-পেশা উপলক্ষে যে সব ইংরাজদের কলকাতায় থাকতে হত হিংসার কারণে তাদের এই বিলাসে আপত্তি ছিল। এই অপব্যয়ের বিরুদ্ধে দেশের লোকেরও আন্দোলন ছিল। এই প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রূপ করে কিপলিং-এর এক কবিতা আছে। তার শেষ পংক্তি কয়টি এইরূপ :

'Let the Babu drop inflammatory hints
In his prints

'And mature—consistent soul—his plan for stealing
to Darjeeling.'

'বাবু যতই গরম গরম লেখা ছাপুন, কথায় কাজে সঙ্গতির মানুষ তো। ভিতর ভিতর দার্জিলিং পালাবার ব্যবস্থা করছেন!' 'স্বাধীনতার' প্রস্তাব নিয়ে শেষে মাউন্টব্যাটেনের চরণতলে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস্ গ্রহণ করার সঙ্গে কথাটার মিল নাই কি? সুতরাং কিপলিং-এর ঠাট্টায় মেজাজ খাপ্পা হলেও, কোন্ শ্রেণীর আচরণের ফলে আমরা বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছি ভুলব কি করে?

ভারতীয়দের ব্যঙ্গ করার সময় কিপলিং-এর কলমে বাঙ্গালী চরিত্রের প্রাচুর্য হয় কেন? সহজেই বোধ্য। জাতীয় আন্দোলনের উদ্যোক্তা হিসাবে বাঙ্গালীই ঐ আন্দোলনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং ইংরাজের আক্রোশেরও বস্তু হয়েছিল। আক্রমণের সময় সুযোগ বুঝে আমাদের দুর্বল অংশকে আক্রমণ করবে তাতে আশ্চর্য কি?

লেখাপড়ার পাট গুটিয়ে কিপলিং ভারতে ফিরেছিলেন ১৮৮২ সালে। ইতিমধ্যে ভারতে কিছু কিছু দাবীদাওয়া উসুলের জন্য শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। আই-সি-এস পরীক্ষার বয়স কমিয়ে দিয়ে ঐ চাকরিতে ভারতীয়ের পথ বন্ধ করা হচ্ছিল। দেশী ভাষার সংবাদপত্রের টুঁটি বন্ধ করা হল। আর্মস্ অ্যাক্ট পাস করে অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করা হল। মোটা কাপড়ের উপর শুল্ক তুলে দিয়ে দেশের বস্ত্র উৎপাদনের প্রাথমিক উদ্যম বন্ধ করার চেষ্টা হল। ১৮৭৬ থেকে ১৮৮০ এই সব ঘটল। '৮৭৬ সালেই আবার সুরেন্দ্রনাথ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশানের প্রতিষ্ঠা করলেন এবং উপরোক্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা করলেন। তিনিই উত্তর ভারত এবং মাদ্রাজ বোম্বাই ঘুরে প্রচার করলেন। বিলাতে প্রচার ও আবেদনের জন্য ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশান লালমোহন ঘোষকে পাঠালেন। কাজেই বাঙ্গালীই যে আক্রমণের লক্ষ্য হবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

মানুষের বিবেককে শুদ্ধ করার জন্য কিপলিং-এর বড় কৌশল সব দুর্নীতি, পাপ, গ্লানিকে সহজ, স্বাভাবিক চিরকালের সত্য বলে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা।

'Who shall doubt the secret hid
Under the Cheops' pyramid,
Was that the contractor
Did Cheops out of millions.'

সন্দেহ কী, পিরামিড তৈরী কাজে কনট্রাক্টার মিশরের রাজার কোটি কোটি টাকা মেরেছিল। কনট্রাক্টারি ব্যবস্থা নিতান্তই ধনতন্ত্রের। ধনতন্ত্র যেন চিরস্থায়ী, কিপলিং-এর ভাব এই। উনবিংশ শতাব্দীর কমিউনিস্ট কবি উইলিয়ম মরিস জনসাধারণের শত্রুদের কথায় বলেছিলেন, তারা বলে : Leave hope and praying—all days shall be as all have been—দুনিয়া যেমন চলেছে তেমনই চলবে। যাদের কথা মরিস বলেছিলেন, কিপলিং তাদের অন্যতম ও প্রধান।

অত্যন্ত হালকাভাবে হাসি-তামাসা করে ভারত সরকারের শাসনব্যবস্থার দুর্নীতিগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে কিপলিং কিছু পদ্য লিখেছেন। বলা বাহুল্য এর প্রায় সবই ভারতের বর্তমান শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধেও প্রয়োগ হতে পারে।

'You know they dammed
the Gauri with a dam
And all the good contractors
scamped their work
And all the bad materials at hand
Was used to dam the Gauri
—which was cheap
And, therefore, proper. Thus the Gauri burst,
And several hundred cubic tons
Of water dropped into the valley, flop
And did a lakh or two of detriment
To crops and cattle……:'

এরূপ কাহিনী আজ খুবই পরিচিত। বাঁধ বাঁধার কনট্রাক্টের ফাঁকি আর শেষ পর্যন্ত বাঁধ ভেঙ্গে সম্পত্তি ও প্রাণ হানি!

কিপলিং উপাসকদের কাছে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল তাঁর উপন্যাস 'কিম্'। ভারতের উত্তরে তিব্বত ও অন্যান্য দেশে ভারত সরকারের গুপ্তচর বিভাগের গুপ্তচরদের ক্রিয়াকর্ম নিয়ে এই উপন্যাস। একজন আইরিশ সৈনিক পত্নীহারা হয়ে পাগল হয়ে যায়। সে তার ৩ বৎসরের শিশু 'কিম্'কে কিছুতেই মিশনারীদের হাতে দেয় না। একজন গরীব ভারতীয় মেয়েছেলের কাছে রেখে মারা যায়; কবচের আকারের এক বস্তুতে পরিচয় ইত্যাদি রেখে যায়। 'কিম্' সাধারণ ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে মানুষ হতে থাকে। রাস্তায়

মানুষ হলে ভাল-মন্দ অভ্যাস যা হয় তা হল। ছাতে ছাত ঠেকা ঘনবসতি লাহোর শহরে ছাতে ছাতে সে অনায়াসে ঘোরে। বাহাদুরির নেশায় প্রেমাকাঙ্খী নারী-পুরুষের গোপন পত্র আদানপ্রদান যোগাযোগে সাহায্য করে, তাদের বাহক হয়। তার এই দক্ষতাকে তার অজ্ঞাতে কাজে লাগালে ভারত সরকারের গুপ্তচর ঘোড়াবিক্রেতা পাঠান মহবুব আলী। ঘোড়া কেনা বেচার উপলক্ষে ও অছিলায় সে ভারতের উত্তরে ঘুরত, ইংরাজ সরকারের গুপ্তচরবৃত্তি করত। বলা বাহুল্য, ইংরাজের এই সব দাসেরা ভারতের বাইরে ঐসব দেশের অভ্যন্তরে ষড়যন্ত্র, শঠতা ও 'আগুনের ফিনকি' ছড়াতে নিযুক্ত হত। লামার চেলা হিসাবে ভ্রমণকালে কিম্ মহবুবের পাঠানো গোপন কাগজের তুবড়ি ইনটেলিজেন্স বিভাগের বড়কর্তা ক্রেটন সাহেবের কাছে পৌঁছে দিল। ক্রেটন সাহেবের প্রকাশ্য বৃত্তি এথ্‌নোলজি—জাতিতত্ত্বের গবেষণা। তাক্ বুঝে ইংরাজ বাহিনী রওয়ানা হল উত্তরের দিকে। কিম্ এবার সচেতনভাবেই গোপন বিভাগে নিযুক্ত হয়ে গেল। ক্রেটন সাহেব বলল, তোমাকে অনেক শিখতে হবে। বসে বসে আঁকতে পাবে না, অথচ চোখে দেখে উপযুক্ত সময়ে টুকতে হবে। এ কাজে আর একজন সহায়ক জুটল হরিচন্দর মুখার্জী। (নাম হিসাবে এই নামটি কিপলিং-এর অতি ব্যবহৃত)। মুখার্জী তাকে শেখাল হাজার হিসাবে পদক্ষেপে হিসাব রাখতে। গণনার কাজে জপমালাকে লাগাতে হবে। এ কাজে একাশি ও একশ' আশি দানার জপমালা কেমন কাজে লাগে তাও শেখাল। এসব নিছক গল্প নয়। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' হতে নীচের উদ্ধৃতি পড়লেই বুঝা যাবে :—

১৮৬৩ থেকে বরাবর ভারত গভর্নমেণ্ট তিব্বতের মধ্যে অনুসন্ধানকারী পর্যটক পাঠাতেন। উদ্দেশ্য দেশটাকে সার্ভে করা এবং অধিবাসীদের সম্বন্ধে খবর আনা। তারা (বৌদ্ধ) প্রার্থনার চক্র নিয়ে ঘুরত। তাতে প্রার্থনার বদলে নোট করার জন্য সাদা কাগজ থাকত। তারা তিব্বতীয় জপমালা সঙ্গে নিত। এর এক-একটা দানায় একশত পদক্ষেপ গণা হত। কাজটা কঠিন ও বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু ফল লক্ষণীয়ভাবে সঠিক হ'ত। এইসব লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে সুপরিচিত পণ্ডিত নয়ন সিং, পণ্ডিত কৃষ্ণ..." (লক্ষ্য করার বিষয়, এই সব হিন্দুস্থানী পণ্ডিতদের ভূমিকায় কিপলিং বাঙ্গালীকে নামিয়েছেন।)

কিম্‌কে এসব নিয়মিত শেখাবার জন্য একজন বিভাগীয় শিক্ষকের কাছে রাখা হল। সাধু-সন্ন্যাসী পর্যটকদের মাধ্যমে তিব্বতে যোগাযোগের চেষ্টা এবং চীন থেকে বিচ্ছিন্ন করে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভাবে আনার চেষ্টা ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলেই হয়েছে। (১৭৯৭ সালের এশিয়াটিক রিভিউ-এ পুরান

গিরি সম্বন্ধে জোনাথান ডান্‌কানের প্রবন্ধ ও ১৮৭০ সালে এশিয়াটিক জারন্যালে গৌর বসাকের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

বর্ণিত পদ্ধতিসমূহ এবং গুপ্তচর বৃত্তির অন্যান্য কৌশল কিম্‌কে শেখাবার জন্য একজন বিভাগীয় শিক্ষকের কাছে রাখা হল। লামার সঙ্গে ভ্রমণ কালে মুখার্জি এবং মহবুবের সঙ্গে কিমের যোগাযোগ থাকত। এইরকম এক ক্ষেত্রে মুখার্জী ও কিম্ নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা রক্ষা করে, জারের গুপ্তচর রুশ পর্যটকের নিকট হতে তাদের গোপন তথ্যাদি কৌশলে সংগ্রহ করে, গুপ্তচর বিভাগে কৃতিত্ব দেখাল। শেষে পর্যটনকারী লামা (কিমের গুরু) তাঁর লক্ষ্য অর্জন করলেন। এখানে গল্পের শেষ।

উপন্যাস বা সাহিত্য সৃষ্টি হিসাবে বইটা এমন কিছুই নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রহস্য এডভেঞ্চার লেখার সঙ্গে এ লেখা তুলনা করার মতও নয় অথচ টি-ই-এস ইলিয়ট এরও প্রশংসা করেছেন। বিশেষতঃ দাস্যবৃত্তির ভূমিকায় ভারতীয় গুপ্তচরদের চরিত্র সম্বন্ধে তিনি প্রশংসায় গদ গদ।

এখানে কিপলিং-এর হৃত খ্যাতিকে পুনরুত্থিত করার যে ব্যর্থ প্রয়াস হচ্ছে তার উল্লেখ প্রয়োজন। এর প্রধান হোতা হচ্ছেন, আমাদের শাসকশ্রেণী ও তাঁদের অনুগৃহীত বুদ্ধিজীবিদের উপাস্য টি-ই-এস ইলিয়ট। তিনি ১৯৪২ সালে পুনরুত্থাপন করার পূর্বে আর নতুন করে কেউ কিপলিং-এর কথা তোলেও নাই (হিলটন ব্রাউনের মন্তব্য)। এবিষয়ে তাঁর ধারণার কিছু নমুনা উপরে দিয়ে এসেছি। তীক্ষ্ণ আলোকপাতে তাঁর মানস জগতের এই অংশ উদ্ঘাটিত করে এমন একটি নিদর্শন নীচে উপস্থিত করলাম।

'লুঠ' নামে কিপলিং-এর একটি পদ্য আছে। পদ্যটিতে বলা হচ্ছে, কুকুরের সঙ্গে যেমন করতে হয়, (বৃটিশ) সৈন্যদের সঙ্গেও তাই। ছোটাতে হলে কুকুরকে যেমন হাড় ফেলে "লুও" বলে ছোটাতে হয়, এদেরও তেমনই লুঠের লোভ দেখাতে হয় আর লুঠ লুঠ বলে এগিয়ে দিতে হয়। এতেও সাঙ্গ নয়। লুঠ কেমন করে করতে হবে সমস্ত ঘর উল্টে পাল্টে কেমন করে দেশী গৃহস্থের যা কিছু আছে নিতে হবে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ আছে। লুটপাট করার সময়, ঘরগুলিতে ঘোরার সময় একা একা ঘুরতে নিষেধ করা হয়েছে। মেয়েরা পিছন থেকে মাথায় লাঠি মেরে কর্ম সাবাড় করবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি। (একটা মজার কথা, এদেশের নারী চরিত্র সম্বন্ধে কিপলিং-এর যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখা যায়) কিপলিং-এর উপর লিখতে গিয়ে হ্যাঙ্কসং এই কুৎসিত পদ্যের জন্য গ্লানিবোধ ও লজ্জাবোধ করেছেন। টি-ই-এস ইলিয়ট বলছেন, কেন, পদ্য তো ঠিকই

আছে। এতে আবার লজ্জার কি? মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এখন শ্রমিকদলের বুদ্ধিজীবিদের একাংশও কিপলিং-এর খ্যাতি পুন-প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসে যোগ দিয়েছেন। (হিলটন ব্রাউনের পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

সাম্রাজ্যকে তাঁরা এখন মূল্যবান (অ্যাসেট) মনে করছেন। 'নয়া সাম্রাজ্যবাদের' তত্ত্বের আচ্ছাদনে সাম্রাজ্য বজায় রাখার তাঁরা পক্ষপাতী। 'নয়া সাম্রাজ্যবাদের' খেয়ালের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের কবি কিপলিং-এর তাঁরা নব মূল্যায়নের প্রয়োজন বোধ করেছেন। তাঁরা বলছেন: সাদা আদমী ও কালা আদমীতে ফারাক থেকেছে, এখনও থাকছে। শেষোক্তকে প্রথমে শাসন করে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে তবে তাদের হাতে শাসন ব্যবস্থা দেওয়া হচ্ছে, যেমন ভারত-পাকিস্তানে দেওয়া হয়েছে। যাদের হাতে শাসন ভার ছেড়ে দেওয়া হল, তারাও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এ দান স্বীকার করছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে সাদা আদমীর ঘাড়ে বোঝা কিছু আছেই। তাঁরা বলছেন, কিপলিং মনে করতেন চিরকালই বোঝাটা সম্পূর্ণই ঘাড়ে রাখতে হবে। এটাই তাঁর ভুল এবং 'সামান্য' ভুল।

প্রাচীন এথেন্সের এক রাষ্ট্রনেতা বেশ কিছুকাল পীড়িত থাকার পর মৃত্যু শয্যায়। তিনি ছিলেন দার্শনিক। তাঁর গলায় সাধারণ সংস্কারগ্রস্ত মানুষের মত রোগ নিরাময়ের জন্য কবচ ও তাবিজ দেখে বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার গলায় এসব কি? মৃত্যু শয্যায় শায়িত দার্শনিক উত্তর দিলেন—এটা কবচের শক্তির পরিচায়ক নয়, এটা আমার অক্ষমতা, আমার অসহায়তার পরিচায়ক।

উপলক্ষ টি-ই-এস ইলিয়টই হন আর অন্য যেইবা হন—কিপলিং-এর খ্যাতিকে পুনর্জাগরিত করার এই যে চেষ্টা চলছে এ কিপলিং-এর শক্তির পরিচায়ক নয়, ধনতন্ত্রেরই শেষ দশার পরিচায়ক।

গালিব

"জ্যোৎস্না রাতে ক্ষতি কি ছিল? ভর দুপুরে এ খর রৌদ্রের মাঝে এ মওজ কেন, কবি? উত্তরে আমি বলি আমার বয়েই গেল, আজ যদি আকাশে এক টুকরো মেঘও না থাকে আর ঠাণ্ডা হাওয়াও যদি না বয়। —বলাসে আজ আগর আব্‌র ও বাদ নহীঁ"—এই হোল কবির প্রশ্ন আর কবির জওয়াব। দুঃখ, দুর্দশা, ব্যথা বিয়োগের মাঝে সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন ও আনন্দে গালিব বিভোর। নিজের জীবনে বহু দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা গালিবকে ভোগ করতে হয়েছে। রাজদত্ত যে সামান্য বৃত্তির উপর তিনি নির্ভরক রতেন তাও হারিয়েছেন, দারুণ দারিদ্রে কাটাতে হয়েছে, সাত সন্তানের মধ্যে একটিও জীবিত থাকেনি, পাগল ভাই ইংরাজ সৈন্যের গুলীতে মারা গিয়েছে, শেষ মোগল বাদশার কাব্যচর্চার পরা-মর্শদাতা হিসাবে ইংরাজের রোষ থেকে তিনিও রেহাই পাননি, যদিচ তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ও সাক্ষাৎ সাক্ষীর অভাবে কয়েদ আর কতল থেকে তিনি বেঁচে-ছেন।—তাঁর সঙ্গী, সাথী, বন্ধু বান্ধব, পরিচিতের অধিকাংশ ও তাঁদের পরিবার ইংরাজের নিপীড়নে আম-কতলে, ফাঁসির রজ্জুতে কিংবা অন্য উপায়ে নিহত ও ধ্বংস হয়েছেন। এইভাবে সারাজীবনের অর্জিত ও সঞ্চিত স্নেহ, মায়া, মমতার বন্ধন হারিয়ে তিনি নিঃসঙ্গ হয়েছেন। এসব সত্ত্বেও জীবনের প্রতি দুঃখজয়ী সেই আস্থাকে তিনি কখনও হারাননি। আশার বাণী দিয়ে মানুষকে বুঝিয়েছেন —"ইলাওয়া ঈদকে মিলতি হয় আওর দিন ভি শারাব, গদায়ে কুচায়ে ময়খানা নামুরাদ নহীঁ, খুশীর দিন ছাড়াও শারাব পাওয়া যায়; শারাবের দোকানের গলির যে-ভিখারী, সে কখনও আশাহত, বঞ্চিত হয় না।" সেই সুরেই লিখেছিলেন "নহো মরনা তো জিনেমে মজা কিয়া—" —মরণই যদি না থাকে জীবনের স্বাদ কি?

শেষ মোগলের দিল্লী

১৭৯৭ সালে তাঁর জন্ম। ১৮৬৯ সালে (বাংলা ১২৭৫ সালের ফাল্গুনে) তাঁর মৃত্যু। এই সময়ের মধ্যে ইংরাজ দক্ষিণ ও পূর্ব থেকে অগ্রসর হতে হতে সারা ভারত গ্রাস করেছে। অধিকাংশ ভারতই তাদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। পরোক্ষ শাসনের ক্ষেত্রেও পরোক্ষতার পরদা সে সময় নাগাদ অনেক পাতলা দাঁড়িয়ে গেছে। তাঁর ৭২ বৎসর জীবনের শেষ এগারো-বারো বৎসর তো কেটেছে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর। তখন ইংরাজ শাসনের পরোক্ষতা কোথাও আর

থাকেনি। তার পূর্বেই ইংরাজ শাসনের অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর নিজের সহরে। কারণ, যদিও শেষ মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহকে সামনে রেখে পোশাকী ব্যবস্থা একটি ছিল, দিল্লীর আসল শাসনকর্তা ছিলেন কোম্পানী বাহাদুর তথা ইংরাজের রেসিডেণ্ট। বাদশাহ ইংরাজের কাছ থেকে বৎসরে ১২ লক্ষ তনখা পেতেন। তাতেই কোনও মতে একটা বাদশাহী ঠাট বজায় ছিল। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে বাদশার বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি ছিলেন কাব্যানুরাগী। দীনতর অবস্থার হোলেও ঐ কালের দিল্লী দরবার ও সেই দরবার সংশ্লিষ্ট কবিদের দান ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও উর্দু সাহিত্যে একটি স্থায়ী স্থান সৃষ্টি করে গেছে। রাজসভার গৌরব কবি জাওক ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি গত হলে তাঁর পদেই কবি গালিব নিযুক্ত হন। অবশ্য তার পূর্বেই কবি বাদশাহ কর্তৃক মোগল বাদশাহদের ইতিহাস লিখতে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বাদশাহ নিজেও কবি ছিলেন। উর্দু সাহিত্যে তিনিও কবি হিসাবে স্বীকৃত। বলা হোত পাঁচশত বৎসর পূর্বে কবি খশরুর চর্চায় উর্দু (বা হিন্দী) সাহিত্যের কলি ফুটে উঠেছিল। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের বিতর্ক আছে। যাই হোক মোগল যুগের শেষে ও ইংরাজ আমলের প্রারম্ভে, যেমন বাহাদুর শার সময়, গদ্য ও পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই সেই ভাষা ও সাহিত্য বেশ পরিণত রূপে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। গালিবের পরিবেশই ছিল কাব্যের অনুকূল এবং তিনি তাঁর পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্নও নন। কিন্তু তাঁর কাব্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তাঁকে সুস্পষ্ট করে, পৃথক সত্তায় দীপ্তিমান করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

গালিবের বৈশিষ্ট্য

বাহাদুর শার কবিতাই ধরা যাক। কয়েক শত বৎসরের দরবারের মার্জিত আচার ব্যবহার অনুশীলনের ঐতিহ্যের মাধুর্য সে ভাষায় আছে। এমনকি সাধারণ মানুষের ভাষাকে তুলে নিয়ে নিপুণ হস্তে তাকে সুমিষ্ট রূপ দেওয়া হয়েছে। গালিবের চেয়ে তাঁর ভাষা অনেক সরল। কিন্তু সব সত্ত্বেও সে কাব্যরচনা অতীতের অঙ্গ হিসাবেই রয়ে গেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় যাওয়ার সময় বাহাদুর শাহকে কেল্লার সামনে ময়দানে ঘুড়ি উড়াতে দেখে গিয়েছিলেন। বয়স্ক মানুষের ঘুড়ি উড়ানোও যেমন পুরানো দিনের প্রতীক, তাঁর কবিতাও তেমনি। পুরাতন ঐতিহ্যের সীমা তা অতিক্রম করতে পারেনি। শাহানশাহ আকবরের ভাঙ্গা ঘরের শেষ প্রদীপ বাহাদুর শাহ লিখেছিলেন :

"লাগতা নহী হয় জি মেরা উজ্‌ড়ে দিয়ার মে
কিস্ কি বনি হয় আলমে না' পায়দার মে
কহদো উন্ হাস্‌রতোঁসে কাহী আওর জা বসে
ইতনি জাগা কহাঁ হয় দিলে দাগদার মে ?"

(অর্থ : পড়া পতিত ঘরে আমার আর মন বসছে না, এ অস্থিত পৃথিবী কার তৈরী, মনের আশাআকাঙ্ক্ষা কামনাগুলিকে বলে দাও তারা যেন অন্যত্র যায়, এই ক্ষতচিহ্নভরা বুকে তাদের ঠাঁই দেওয়ার স্থান কোথায় ?) কিন্তু গালিবের কাছে সৃষ্টি অস্থিত নয়, তা লয়হীন। তাঁর এক কবিতায় সৃষ্টির শতবার লয়ের সঙ্গে পুনরাবির্ভাবের কথা লিখেছেন এবং বলেছেন "ইম্‌রোজ বেফারদা নীস্ত—'আগামী কাল' ছাড়া 'আজ' বোলে কিছু নাই।" ভবিষ্যতের অস্তিত্ব ছাড়া বর্তমান কল্পনা করা যায় না। এ যেন কয়েক দশক পরের রবীন্দ্রনাথের ধ্বনি পেয়ে যাই :

"বজ্র দগ্ধ অতীতের, নিরাশার অতিথের
ঘোর স্তব্ধ সমাধি আবাস,
ফুল এসে পাতা এসে কেড়ে নেয় হেসে হেসে
অন্ধকারে করে পরিহাস।"

(নূতন, কড়ি ও কোমল)

গালিব মানুষকে আবার সেই লয়হীন সৃষ্টিরও উপরে স্থান দিয়েছেন। বলেছেন,

জগতের সৃষ্টি মানব ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্যে নয়,
আমাকে কেন্দ্র করেই বিশ্ব ঘুরছে।

এও সেই কড়ি ও কোমলের "চারিদিকে তার মানব মহিমা উঠিছে গগন পানে" স্মরণ করিয়ে দেয়। ('কড়ি ও কোমলের' উল্লেখ করছি গালিবের কাল থেকে নিকটে বলে।)

মানুষের মর্যাদা

মানবপ্রেমের আদর্শ মধ্যযুগ থেকেই চলে আসছে। সাদীর "বনি আদম আ'জায়ে একদীগরন্দ—একে অন্যের অঙ্গ হয় মানব সন্তান"—ফারসী সাহিত্যে যুগ যুগ ধরে এর ঐতিহ্য চলে এসেছে। (সাদী দিল্লীর সুলতান দাস রাজাদের সমসাময়িক) হাফিজে তা চরমে উঠেছে—"মরদুম আজারী মকুন (মানুষের উপর অত্যাচার কোরোনা)···দর্ পয়ে আজার মুবাশ (অত্যাচারীর পদানুসরণকারী

হোয়োনা)···দর্ শরীয়তে মা হীচ আজীন গুনাহ্ নীস্ত (আমাদের শরীয়তে বা ধর্মে এছাড়া আর পাপ নাই) ।" কিন্তু সামান্য মোচড় দিয়ে গালিব মানুষকে সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে রূপায়িত করেছেন—মানুষের এই মর্যাদা গালিবেই আবির্ভাব। অথচ এই মানুষকে মানুষ করার চিন্তাও তাঁর কম নয়। তাই কখনও কখনও ঘা খেয়ে এ চিন্তাও হয়েছে—হর্ কামকে দুশওয়ার হয়্ আসান হোনা, আদমী কো ভি মুয়স্সর নঁহী ইনসান হোনা। প্রত্যেক কাজ সহজ হওয়া শক্ত, 'আদমী'র ইনসান হওয়া বা মানুষ হওয়া সেই মত।

ধর্ম সম্বন্ধে গোঁড়ামীর অভাব ফারসী কাব্যের ঐতিহ্যের মধ্যেই নিহিত। তাই সাদী বলেছেন, জপমালা আর নামাজ পাটিতে কিছু হবে না। হাফেজ বলেছেন, হদীস আজ্ মতরব ও ময় গো, রাজে দহর কমতর জো—হদীসের গান ও সুরার মাধ্যমেই কর, বিশ্বরহস্যের খোঁজে থেকো না। ভক্তিমার্গ দিয়ে যতই ব্যাখ্যা করা হোক, শরীয়তের মসলা (সূত্র) দিয়ে এ সবের ব্যাখ্যা হয় না। কিন্তু গালিবের ক্ষেত্রে এখানে কিছু নতুন বৈশিষ্টের আবির্ভাব হচ্ছে —যেন অগ্রাহ্য করার ভূমিকা তিনি নিতে পারছেন।

ব্যাখ্যাটা পরিষ্কার করতে একটা দৃষ্টান্ত নিয়ে আরম্ভ করা যাক। মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ কবি ইরাকী বলেছেন "চুঁ বাতাওফে কাবা রফ্তম···যখন আমি কাবা তওফ করতে (আনুষ্ঠানিক নিয়মমত পরিক্রম করতে গেলাম) জদরুন নেদা বরামদ, ভিতর থেকে শব্দ এলো, বেরুণ চে-তু-করদি কে দরুন খানা আঈ— বাইরে তুমি কি করেছ যে ভিতরে এসেছ?" অর্থাৎ কৈফিয়ত তলব হোল। বুঝলাম আচার অনুষ্ঠানে কিছু হবে না। সুতরাং প্রেম, ভক্তি, অধ্যাত্ম সাধনার দিকে যেতে হবে। কিন্তু গালিব ঠিক এইরূপ উপমায় কি প্রকাশ করছেন?

"বন্দেগী মে ভি উওহ্, আজাদ
ও খুদবীন হঁয় কে হম
উল্টে ফিরে আয়ে দরে কাবা
আগর ওয়া ন হুয়া।"

প্রণতিতেও আমি এমন মুক্ত এবং আত্মসচেতন যে কাবার দরজা যদি খোলা না থাকে আমি উল্টে ফিরব।" কারও কৈফিয়ত চাওয়ার অপেক্ষা এখানে নাই, ভক্তিমার্গ প্রভৃতিতে আশ্রয় নেওয়ার কামনাও নাই। যতই দীন অবস্থা হোক তাঁর মনে এ প্রশ্ন আছে—এবং তিনি মানুষের মনে তা রাখতে চান —"কিয়া আসমান কে ভি বরাবর নহী হুঁ ময়? কী? আমি কি আকাশের

সমান নই ?" মনের এই দিকটা যেন আর একটু বেশী উন্মোচিত হয় এই সুপরিচিত উদ্ধৃতিতে :

"হম কো মালুম হয় জান্নত কি
হকীকত লেকিন
দিল্ কো বাহ্‌লানেকো গালিব
ইয়ে খেয়াল আচ্ছা হয়।"

(জান্নাতের তথা স্বর্গের সত্যতা বা বাস্তবতা সম্বন্ধে আমার জানা আছে, তবু যাই হোক মনকে ভোলাবার জন্য খেয়ালটা ভাল। যা কবির মতে শুধু মন ভোলাবার খেয়াল তার বাস্তব অস্তিত্ব সম্বন্ধে কবির কি মত সহজেই তা বোধ্য।)

সামাজিক প্রশ্ন

সমাজকে ওলট-পালট ভাববার যুগ তখন আসেনি। কিন্তু এ প্রশ্ন তিনি তুলেছেন যে শক্তিমানরা যদি লালসায় উন্মত্ত না হবে তা হলে বাগানের সুন্দর ফুল বাজারে কেন আসবে—শাহেদে গুল বাগ সে বাজার মে কেঁও আয়ে ? তাঁর একটি চিঠি উদ্ধৃত হয়ে থাকে যেখানে তিনি বলেছেন, সারা দুনিয়াভর যদি সম্ভবও না হয় তিনি চান অন্ততঃ তাঁর সহর দিল্লীতে যেন ক্ষুধিত কেউ না থাকে। এটা হল ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের শোষণে জর্জরিত দৈন্যক্লিষ্ট সামন্ত সমাজের সাহিত্য ধারার শেষ প্রতীকের আবেদন। উদীয়মান মুসলিম বুর্জোয়া সমাজের প্রিয় কবি ইকবালের জমিদারদের আক্রমণ করার কুণ্ঠার কারণে লক্ষ্যবিহীন আক্রোশ—"জিস্ খেত সে দেহকানো কো মুয়াস্‌সর নহো রোজি উস্ খেতকা হর খোশায়ে গনদুম কো জালা দো—যে খেত থেকে চাষীর রুজী আসে না, সে খেতে গমের প্রতিটি দানাকে পুড়িয়ে দাও"—এই উক্তি কি গালিবের সহানুভূতি কাতর বক্তব্যের তুলনায় অর্থহীন প্রলাপ মনে হয় না ?

আত্মসম্মান বোধ

গালিব সামন্ত সমাজের অভ্যন্তর থেকে উদ্ভূত হলেও আধুনিক মানুষের ব্যক্তিত্বের সম্মানবোধ তাঁর ছত্রে ছত্রে জাগরিত। তাঁর প্রায় পাঁচ শতাব্দী আগে সাদী বলেছিলেন বটে সত্য কথা যা জানো তাই বলো। (কাব্যগ্রন্থ বুসতান দ্রষ্টব্য) কিন্তু সামন্ত সমাজের স্বৈরাচারের কথা বুঝে তাঁকেও অন্যত্র বলতে হয়েছিল, রাজরোষ থেকে মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াও

ভাল (গুলিস্তানের গল্প দ্রষ্টব্য)। প্রভুত্ব বিশিষ্ট সমাজে, কবির স্বাধীনতায় সীমাবদ্ধতা গালিব সরল ভাবেই স্বীকার করেছেন। আজকালকার বুর্জোয়া সরকারের ও শ্রেণীর কবিদের মত তিনি মিথ্যাচারের আশ্রয় নেননি।

"গালিব, ওজিফাখার হো, দো শাহকো দুয়া,
উওহ্ দিন্ গয়ে কে কহতে থে নওকর নহী হুঁ ময় ।।"

(অর্থ : গালিব তুমি ওজিফাখার, পেনশান্‌ভোগী, বাদশাহকে আশীর্বাদ দাও, যেকালে তুমি বলতে চাকর নই সেকাল চলে গেছে)। বুর্জোয়া সমাজে ভণ্ডামি এমন পুণ্যাচার হিসাবে উত্তোলিত হয়েছে যে আজকের বুর্জোয়া শোষকদের অনেক 'নওকর' সাহিত্যিক তাদের ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করতে কোনও কুণ্ঠা জড়তায় বিব্রত হয় না।

সুখের বিষয় গালিব ওজিফাখার বা পেনশান্‌ভোগী হলেও কাব্য সাহিত্যে তিনি আত্মসম্মানের অবমাননাকর কিছু লেখেন নি। তিনি এক পত্রে লিখেছেন, "বিলকুল ভাঁড়দের মতো বকতে শুরু করা, ভারতবর্ষের ফারসি লেখকদের এই (সীমাহীন স্তুতির) রীতি আমার আসে না। আমার গীতিকাব্য দেখো। প্রেম ও ভালবাসার কবিতা অনেক পাবে। প্রশংসা ও স্তুতির কবিতা খুবই কম। গদ্য লেখাতেও এইরূপ।" কবির এই দাবীর সত্যতা সকলকে স্বীকার করতে হবে। তখনকার পড়ন্ত সামন্ত সমাজের লিখনরীতি (স্টাইল) ছেড়ে একটা মোড় ঘুরিয়ে গালিব উর্দু সাহিত্যে গদ্য ও পদ্য রচনায় আধুনিক রীতির প্রবর্তনে তাকে সূচনাতেই শক্তিশালী করেন।

ব্যবধানের সংস্কৃতি

এইখানে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি পরম বেদনাদায়ক পরিচ্ছেদের স্মরণ করতে হয়। সুরেন সেন মহাশয়ের ১৮৫৭-র ইতিহাসের ভূমিকায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ দেখিয়েছেন সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতবাসীদের প্রতি যেসব আবেদন বিদ্রোহীদের তরফ থেকে প্রচার করা হয়েছিল তাতে কোথাও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের আবেদন করার প্রয়োজন হয়নি। কারণ সমস্যাটার অস্তিত্ব ছিল না। ইংরাজ দেশের এক সামন্ত রাজা বা রাজবংশের বিরুদ্ধে আর এক রাজাকে সাহায্য করে এইভাবে ভেদ-বিভেদের সুযোগ সৃষ্টির দ্বারা এগোচ্ছিল বা এগিয়েছিল। অবশ্য এখানে অর্থনৈতিক কারণ, সামন্ত শাসিত রাষ্ট্রব্যবস্থার শেষ দশা ইত্যাদি এসব আলোচনা করছি না। শুধু ইংরাজ কর্তৃক ভেদ-বিভেদের সুযোগ নেওয়া এবং সৃষ্টি করার কথা বলছি।

বিদ্রোহের পর এই ভেদ-বিভেদের সুযোগ নেওয়ার রূপ বিভিন্ন রাজবংশ ও সামন্ত গোষ্ঠী অবলম্বন করে আর থাকলো না। সমস্ত দেশ তখন ইংরাজের প্রত্যক্ষ অধিকারে। পুরাতন সামন্ত প্রধানরা শেষ হয়েছেন। অল্প সংখ্যক যাঁরা আছেন, ইংরাজের পদানত ও পদাশ্রয়ী হয়ে 'দেশীয় নৃপতির' রূপে ইংরাজের যাদুঘরে পুরাতন সামন্ত সমাজের জীবাশ্মরূপে বিরাজ করছেন। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিরাট সংখ্যার এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী অবলম্বন হারিয়ে এক ছিন্নমূল অবস্থায় দুর্দশাগ্রস্ত হল। এদের মধ্যে একটা বড় সংখ্যা হল মুসলমান। সারা দেশব্যাপী ছড়ানো হলেও উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা ও দিল্লীতে তার কেন্দ্র। ইতিপূর্বেই ইংরাজকে অবলম্বন করে একটা মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছিল এবং ইংরাজের প্রসারমাণ ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও প্রসার ঘটছিল। এর বড় কেন্দ্র বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা—এদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। যারা আশ্রয় হারিয়ে এখন আশ্রয় খুঁজছে তারা এবং যারা নতুনকে অবলম্বন করে সেই সমাজ ব্যবস্থায় কিছুটা সুপ্রতিষ্ঠিত এই দুই উপরতলার শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব নিয়েই এখন ইংরাজ শাসকদের প্রধান কূটনৈতিক খেলার শুরু হল। অবশ্য সমস্ত দেশবাসীর বিবেক লুপ্ত হয়নি। ইংরাজের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সচেতনতা এবং জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে উঠছিল। কিন্তু প্রথম হতেই ইংরেজ সুচতুর ভাবে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদকে ব্যবহার করে তাকে ব্যাহত করতে শুরু করল।

সংস্কৃতিতে এর রূপ যা দেখা দিল তার কথাই এখানে আলোচনা করব। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময়েই এর একটা কদর্যরূপ কলকাতায় দেখা দিল কবি ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে'র পাতায়। তিনি খোলাখুলিভাবে ইংরাজকে আহ্বান দিলেন, মুসলমান সমাজকে জব্দ করতে, কারণ, তাঁর মতে তারাই বিদ্রোহের প্রধান উদ্যোক্তা, নাটের গুরু। কলকাতা মাদ্রাসার নিকট ইংরাজ সেনাবাহিনী মোতায়েন হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করলেন। (শ্রীবিনয় ঘোষ কৃত পুরাতন সংবাদপত্রের সংগ্রহ দ্রষ্টব্য) লর্ড এলেনবরা (১৮৪২-৪৪) "ডিভাইড এণ্ড রুলে"র তখনকার সূত্র করে দিয়েছিলেন "Pit the Hindus against the Muslims". (লালা লাজপৎ রায়, আনহ্যাপি ইণ্ডিয়া দ্রষ্টব্য) তার বিষময় ফল অন্যান্য ক্ষেত্র ছাড়াও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দেখা দিচ্ছিল। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে'র উপরিউক্ত লেখাসমূহ তার এক দৃষ্টান্ত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শক্তিশালী সাহিত্য সৃষ্টির একটা অংশকে এরই সাধনায় নিযুক্ত করলেন।

রাজা রামমোহন, মাইকেল, বিদ্যাসাগরকে অবলম্বন করে বাংলার সংস্কৃতির

যে-সুস্থ, যুক্তি-আশ্রয়ী নতুন চিন্তাধারা গড়ে উঠছিল এবং উঠেছিল—তা হতে প্রধান বিচ্যুতি ঘটল ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্তিত ধারায়। সাম্প্রদায়িক ভেদবিভেদকে তা পুষ্ট করল।

এ ছাড়াও জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাতে সুস্থ যে সব ধারা তার মধ্যেও সম্পূর্ণভাবে 'জাতীয়' বর্ণিত হওয়ার জন্য যা প্রয়োজন তার অভাব ঘটল। যদিচ জাতীয় আন্দোলনের সূচনা ও পরিপোষণে তার বিরাট দান অনস্বীকার্য তবু উপরিউক্ত অভাবজনক ত্রুটিকেও অস্বীকার করা যায় না। "হিন্দু মেলা" প্রভৃতিতে নির্দেশিত, জাতীয় আন্দোলনের ভাবধারা স্বতন্ত্র "হিন্দু জাতীয় আন্দোলন" রূপে প্রতিফলিত হতে লাগল। (রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ডে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

মুসলমান মধ্যবিত্তদের মধ্যেও শিক্ষা, অর্থোপার্জন, সমাজ সংস্কার ও উন্নয়ন প্রভৃতি এবং হারানো পোজিশান্ পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনায় স্বতন্ত্র আন্দোলন আরম্ভ হল। সামাজিক দিক দিয়ে স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ এর সূচনাকারী। সংস্কৃতিতে এর প্রতিনিধি কবি আলতাফ হোসেন হালি (১৮৩৮-১৯১৪) প্রমুখ। তাঁর 'শিকওয়ায়ে হিন্দ' এবং 'মুসাদ্দাসে হালি' দুই প্রসিদ্ধ ও শক্তিশালী কাব্যগ্রন্থ এর দৃষ্টান্ত। (অবশ্য এই ধারা ছাড়াও হালির উর্দু সাহিত্যে বিশেষ করে গীতি-কাব্যে বিশেষ দান আছে। তিনি অন্যতম বড় কবি হিসাবেই স্বীকৃত। আরবী ফারসীর ন্যূনতম ব্যবহারে এক সরল ভাষা ও রচনারীতি তিনি অনুশীলন করেন এবং উর্দুকে আধুনিক সংস্কৃতির বাহন হতে সাহায্য করেন।) মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে তারা যে উদাসীন এবং তাদের পুনরুন্নয়নের আহ্বান—কাব্যের এই হল বিষয়বস্তু। মুসলমানদের ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের কথা আছে। মুসলমানদের সম্বন্ধে তাঁর ব্যথা বেদনায় অভিযোগ অনেক। এই ধারায় অনেক লেখা। তার মধ্যে দু'লাইন এখানে তুলছি। "না আফসোস উনহেঁ আপনি জিল্লাত প' হয় কুছ, নারশ্‌ক্ আওর কওমোঁ কি ইজ্জত প' হয় কুছ" (তাদের নিজেদের লজ্জাকর অবস্থা সম্বন্ধে দুঃখবোধ নাই। অন্য জাতির সম্মান ও মর্যাদাতেও ঈর্ষা নাই।) স্মরণ রাখতে হবে এখানে অন্য জাতি বলতে তার মধ্যে হিন্দুকেও ধরা হয়েছে। ঈর্ষার প্ররোচনায় কিরূপ অমঙ্গল্ ঘটতে পারে তা আলোচনার প্রয়োজন হয় না।

অপেক্ষাকৃত অনেক নিম্নস্তরের কবির দ্বারা উপরিউক্ত ধারা পরিপুষ্ট হয়েছিল। শেষে পুনরায় জোরালো হয় ইকবালের লেখায়। তাঁর নানামুখী সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম ধারায় এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির দোষ অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

সঙ্গে সঙ্গে ধর্মক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিম রিভাইভ্যালিজম্ সেই একই স্রোতকে স্ফীত করেছে।

গালিবের সাহিত্যে (সাদী আর হাফেজের লেখার মত) মানুষের ভাবনা আছে, শুধু মাত্র মুসলমানের ভাবনা নাই—যদিচ তাঁর চোখের সামনেই ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর ইংরাজ কর্তৃক বিদ্রোহের দমন ও অত্যাচারের কালে সে ভাবনার প্ররোচনার খোরাক ছিল। তিনি তখনও বৃহত্তর মানুষের ভাবনার মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করে রাখতে পেরেছিলেন যেমন বাংলা সাহিত্যে পূর্বে ও পরে অনেক মহান কবি ও সাহিত্যিক পেরেছেন।

একদিন যেমন ইংরাজের যথা এলেনবরার নীতি ছিল হিন্দু স্বাতন্ত্র্যকে উৎসাহিত করা তেমনই আর একদিন দাঁড়ালো মুসলমান স্বাতন্ত্র্যকে উৎসাহিত করা। সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পর মুসলমানকে প্রধান অপরাধী খাড়া করে তার উপর নিগ্রহ করা হল বেশী। বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দুর ক্ষেত্রেও ইংরাজ কর্তৃক এইরূপ প্ররোচনামূলক স্বতন্ত্র নিগ্রহের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর এবং পুলিশ অফিসার আহসানুল্লা নিহত হওয়ার পর চট্টগ্রাম সহরে ও গ্রামসমূহে ইংরাজ হিন্দু নিপীড়ন ও অত্যাচার অনুষ্ঠিত করে, তাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপায়িত করার চেষ্টা করে এবং যেমন একদিন ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ক্ষেত্রে দিল্লীতে, তেমনই এখানেও এইরূপ সাম্প্রদায়িক রূপায়নে বিফল হয়। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় দিল্লী তখনও বিদ্রোহীদের হাতে। এমন সময় আসন্ন বকরীদে গো-কোরবানি নিয়ে ইংরাজের দালালরা উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করলো। বাহাদুর শাহ জনমতের সহযোগিতায় শান্তি বজায় রাখতে সমর্থ হলেন। হিন্দু নাগরিক কিভাবে বিপন্ন মুসলিম নাগরিককে সাহায্য করেছেন তার পরিচয় গালিবের পত্রাবলী ও সমকালীন অন্যান্য রেকর্ডে পাওয়া যায়। এখানে চট্টগ্রামের ৩০শে আগস্ট, ১৯৩১-এর ঘটনার বিবরণ দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বক্তৃতা থেকে দিচ্ছি :—

"I have personally inspected the places where these incidents occurred. I have visited the houses which have been destroyed. I have visited a printing press which has been broken to pieces by some non-official Europeans. I have visited the villages where poor women's houses have been destroyed and burnt in the middle of the day not by Muhammedans, nor by paid hooligans but by the police, the British officers and the

so-called Gurkhas. I may state here that the incidents on the night of Sunday the 30th August were under the guidance of police officers and non-official Europeans and officials of the town. On Monday, Tuesday, and Wednesday all attacks were entirely conducted by Police officers and the British officers. Not a single Muhammedan—be it said to their credit—although that community was convassed came forward to help these people."

এইরূপই সাধারণ দেশের মানুষের credit, হিন্দুর এবং মুসলমানের। সংগ্রামের মুখে, ইংরাজের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে তারা পরস্পরকে সাহায্য করেছে, এগিয়ে দিয়েছে। সে বৃত্তান্ত যেমন পাওয়া যায় সিপাহী বিদ্রোহের বর্ণনায় তেমনই পাওয়া যায় চট্টগ্রাম সংগ্রামের অনুষ্ঠাতাদের জীবন বৃত্তান্তে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ আর দেশের বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণী দেশের ভেদ-বিভেদের স্রষ্টা বা পরিপোষক। তারা বেঁচে থাকবে না। তাদের শেষ হতেই হবে। বেঁচে থাকবে সিপাহী বিদ্রোহের কালের সেই হিন্দু যে সংগ্রামের সংগঠককে অন্ধকারে এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে নিয়ে গেছে, সেই মুসলমান যে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছে। সীমানার এপার ওপার ঢাকা, চট্টগ্রাম, কলকাতায় তাদেরই আওয়াজ শোনা যাচ্ছে······"আমাদের সংগ্রাম চলবে, চলবে, চলবে।"

এই পরিপ্রেক্ষিতেও পুরাতন সংস্কৃতির বিচার করতে হবে। এঙ্গেলস্ বলেছেন: "The East fell to the West because of segregation of man from man—মানুষে মানুষে ব্যবধানের জন্যই প্রাচ্য প্রতীচ্যের কাছে নত হয়েছে।" নানারূপ বিচারের মধ্যে এ বিচারও আজ সঙ্গত। কে এই ব্যবধানকে দূর করতে সাহায্য করেছে, কে এই ব্যবধানকে বাড়িয়েছে।

আজও এর প্রয়োজন আছে।

দেখিনি আমরা ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় সীমানার এধার ওধার তথাকথিত প্রগতিশীল কবিদের দেশপ্রেমের উদ্গার······সাজ্জাদ জাহীরের বন্ধুদের রণহুঙ্কার···বুর্জোয়ার 'নওকর'দের উপহারের ছেঁড়া রুটি সংগ্রহের জন্য কাড়াকাড়ি, মারামারি, কবিতার মাধ্যমে জাতিবৈর প্রচারের প্রতিযোগিতা···?

গালিবের ভাষায় এদের যেন বলতে শুনি—

"কহিতেছ : কিবা লেখা লিখে দিল
ভাগ্য দেবতা
ললাটে তোমার···
যেন আগেই
দেখনি মৃত্তিকার পর
ললাটচিহ্নের হেতু যাহা,
প্রণতিতে ভূলুণ্ঠিত
মস্তক আমার।"

পুরাতন প্রসঙ্গ—সাদী ও হাফেজ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর পিতার কথা উল্লেখ করে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন : "বাবা তাঁর গ্রামে জীবন যাপনে অসুবিধার কথা গোপন করতেন না। তিনি প্রায়ই গ্রামের ভদ্র সমাজ সম্বন্ধে তিক্ত ও বিরূপ মন্তব্য করতেন। তাঁর জগৎ থেকে তাদের জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। যাঁর মন ও চরিত্র হাফেজ, সাদী এবং ইংরাজী সাহিত্যের কিছু সর্বোত্তম সৃষ্টির প্রভাবে গড়ে উঠেছিল, যিনি এক-কালে রামতনু লাহিড়ীর পদতলে উপবেশন করেছেন এবং প্রধান সহরের (কলকাতার) আলোকপ্রাপ্তদের সঙ্গে মিশেছেন, তিনি এমন মানুষদের সঙ্গে মিলিত হবেন যারা অর্ধশতাব্দী পশ্চাৎপদ এটা আশা করা যায় না।"

লক্ষ্য করার বিষয় যে আধুনিক ও উনবিংশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্তদের সঙ্গে নাম করা হচ্ছে কবি হাফেজ ও সাদীর। যা সাধারণতঃ ধরা হয় তাতে সাদীর জন্ম দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে (১১৮৪ খ্রীষ্টাব্দে) এবং মৃত্যু শতাধিক বৎসর পর ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে (১২৯১ খ্রীষ্টাব্দে)। হাফেজের জন্ম তারিখ তর্কের বিষয়, মৃত্যু ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। যাই হোক দাঁড়ালো এই, বাংলার গ্রামে পশ্চাৎপদ উচ্চ বর্ণের মানুষ অর্ধশতাব্দী পিছিয়ে থাকা বলে বর্ণিত হচ্ছেন। কিন্তু যে-কবিদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে তাঁরা ঐ সময় থেকে অন্ততঃ চারশ' থেকে পাঁচশ' বছর আগের। তবু একথার মধ্যে কিছু বাস্তব সত্য আছে। এটা বুঝতে হয় যখন দেখি রামমোহন তাঁর সিরিয়াস আলোচনায় হাফেজকে উদ্ধৃত করছেন (যথা বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারক পত্রে কিংবা তাঁর বিখ্যাত পুস্তিকা তুহফায়), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ করছেন তাঁর আত্মচরিতে, মাইকেল তাঁর ইংরাজী রচনায়, তখন বুঝতে হবে এই দুইজন কবিদের মধ্যে এমন কিছু ছিল যা বহুযুগ পরের মানুষ এমনকি আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত মানুষ আদরের সঙ্গে গ্রহণ করছেন।

সাধারণ মানুষের মধ্যে সাদীর কবি-খ্যাতি হাফেজের চেয়েও বেশী ছিল। কারণ, প্রথমতঃ যাঁরাই ফারসী পড়েন সাদীর গুলিস্তান ও বুস্তান তাঁদের পাঠ্য। তাছাড়া সাদীর মধ্যে আছে এক ধরনের বিশ্বজনীনতা যা তাঁকে সবার কাছেই প্রিয় করে। সুফীবাদের রহস্যময় জগতের আহ্বান তাঁর সাহিত্যেও আছে। তবু সমগ্র বিচারে এরই আবেগ ও আবেদন প্রধান নয়। মানুষকে সর্বদা ব্যবহারিক জগৎ সম্বন্ধে সচেতন ও "প্র্যাকটিক্যাল" হবার কথাই তাঁর ছোট ছোট চিত্তাকর্ষক কাহিনীগুলিতে আছে—তা গদ্যেই হোক, বা পদ্যেই হোক। সুবুদ্ধির পরামর্শ দিতে গিয়ে অনেক সময় শত্রুর নিকেশ করতে বলা হয়েছে বা ঐ ধরনের

বক্তব্য আছে। এ কারণে অন্ততঃ একজন সমালোচক (ব্রাউন) তাঁকে 'মেকিয়াভেলিয়ান' বলেছেন। কিন্তু বেশীর ভাগ লেখা সাধারণ মানুষের প্রতি দরদ ও মমতা, উৎপীড়িতের প্রতি সহানুভূতি, মধ্য যুগের স্বৈরাচারী শাসককুলের বুদ্ধি বা বিচারশক্তির স্বল্পতাকে নিয়ে তামাশা ও কৌতুক এই সবই আলোচ্য। ইংরেজ সমালোচকের উষ্মা এর জন্যও হতে পারে। প্র্যাকটিক্যালটা কি রকম এতেই বুঝতে পারেন—"আয়্ তেহী দাস্ত রফতা দর্ বাজার, তারাস্মাত্ বাজ নাদারি দাস্তার"—তুমি খালি হাতে বাজার যাচ্ছ আমার ভয় হয় মাথার পাগড়ি খুইয়ে আসবে। আর এক কথিকায় বিখ্যাত জ্ঞানী লুকমানকে একজন জিজ্ঞাসা করলো "হিকমাত্ আজ্‌কে আমোখতি?" —হিকমত (জ্ঞান) কার কাছ থেকে শিখলে? উত্তর: অন্ধদের কাছ থেকে, তারা পরীক্ষা না করে পা রাখে না। জগতে মানুষে মানুষে মেলামেশা আনন্দের পরিবেশই সাদীর পছন্দ। একজন জানু পেতে বসে মুখ বুজে গম্ভীর হয়ে প্রার্থনা করছে, বন্ধুর আনন্দের কথায় যোগ দিচ্ছে না। সাদী বন্ধুকে এ-উপদেশ দিচ্ছেন না যে ওকে প্রার্থনা করতে দাও। বরং উল্টো। নীরব প্রার্থনাকারীকেই উপদেশ দিচ্ছেন: "যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার কথা কওয়ার ক্ষমতা আছে, একটু মুখ খুলে কথাই না হয় কইলে, কারণ মুখ তো বুজবেই যেদিন মরণ এসে দরজায় দাঁড়াবে" (গুলিস্তান নওলকিশোর সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১১)। এমন সুস্থ আনন্দময় কবিকে মানুষ সহজেই ভালবাসে। ধর্ম সাধনা সম্বন্ধে কবির বক্তব্য তো এই —মানুষের সেবা ছাড়া কোনও সাধন পদ্ধতি নেই—তসবী (জপমালা), নামাজ পাটি বা দরবেশের পোশাকে নেই। (তরীকত বজুজ খিদমাতে খল্‌ক নীস্ত, বতসবীহ ও সাজ্জাদা ও দাল্‌ক্ নীস্ত—রামমোহনের প্রিয় উদ্ধৃতি)। মানুষের মধ্যে ভেদ-বিভেদের বিরুদ্ধে তাঁর বাণী:

একে অন্যের অঙ্গ হয় মানব সন্তান
কারণ, একই জওহর হতে সৃষ্টি হয় তার।
যেমন এক অঙ্গে হলে ব্যথার সঞ্চার
অন্য অঙ্গে এ জগতে না হয় কাহার,
অন্যের ক্লেশে যে জন না হয় ব্যথিত
সম্ভবে না মানুষেতে নাম লয় তার॥

—গুলিস্তান (নওলকিশোর সংস্করণ, পৃ ৩৯)

স্বস্তি

মধ্যযুগের রাজারাজড়ার স্বৈরাচার ও অত্যাচার সম্বন্ধে কবি খুবই সচেতন। যারা তাদের ক্রোধের সম্মুখীন, মিথ্যা কথা বলে যদি তাদের বাঁচানো যায় সত্য কথার চেয়ে সে-মিথ্যাও ভাল ("দারোগ মসলহত আমেজ বেহ্ আজ্ রাস্তি ফেতনাঙ্গেজ"—(নওলকিশোর সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২২)। কবি সতর্ক করে দিচ্ছেন যে একজন দরবেশকে যদি একটি রুটি দেওয়া যায়—আধা রুটি সে আর একজনকে দিবে কিন্তু রাজা যদি একটা দেশ দখলে পায় তখন আর এক দেশ দখলের তালে থাকে (ঐ পৃষ্ঠা ২৬)। যে ব্যক্তির জুলুম করাই পেশা সে বাদশাহী করবে কি করে? ভেঁড়া কখনও রাখাল হতে পারে? (পৃষ্ঠা ৩৪)। বাদশাদের কবি উপদেশ দিচ্ছেন রায়তদের সন্তুষ্ট রাখো কারণ ন্যায়পরায়ণ রাজার রায়তরাই রক্ষক, তারাই তার সেনাবাহিনী (ঐ পৃষ্ঠা ৩৫)। রাজাদের অগুণ বা অযোগ্যতা নিয়ে ঠাট্টা তামাশাও কম নেই। একটা দৃষ্টান্ত আছে এই গল্পে। এক মন্ত্রী বিতাড়িত হয়ে দরবেশ হলেন। কিছুদিন পর রাজার সঙ্গে দেখা হওয়ায় রাজা তাঁকে পুনর্নিয়োগ করতে চাইলেন। দরবেশ হেতু জিজ্ঞাসা করায় রাজা বললেন—"আমার একজন যোগ্য এবং জ্ঞানবান ব্যক্তি প্রয়োজন।" প্রাক্তন মন্ত্রী (যিনি বর্তমানে দরবেশ) জবাব দিলেন—"তা হলে সেরূপ ব্যক্তি পাবেন না। কারণ, আপনি যে গুণ চাইছেন তা যদি তাঁর থাকে সে গুণ থাকার প্রমাণই হবে এই যে তিনি এরূপ পদে আত্মসমর্পণ করবেন না।"

এই রকম কৌতুকের এক কাহিনী আছে রাজা বাদশার কে শত্রু এবং কেই বা বন্ধু তা চেনার অক্ষমতা সম্বন্ধে। রাজা একদিন শিকার করতে গিয়ে লোকলস্কর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখলেন, একটা লোক দৌড়ে আসছে। রাজা দেখেই ভীত হলেন। আসলে কিন্তু সে রাজারই পশুপালক—রাজাকে দেখেই কাছে আসছে। রাজা শত্রু মনে করে ধনুকে তীর লাগিয়ে কান পর্যন্ত টান দিয়েছেন—এমন সময় পশুপালক নিজেকে বন্ধু বলে চিৎকার করে নিরস্ত করলো। যাই হোক পরিচয়াদির পর রাজার সেই ভৃত্য বললো তুমি তো কতবার আমাকে দেখেছ অথচ এখন চিনলে না—অথচ তোমার লক্ষ ঘোড়া থেকে আমি এক ঘোড়াকে বার করে আনতে পারি। (বুস্তান, নওলকিশোর সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৬) রাজাদের ভৎ‍র্সনা করে একটি কবিতা প্রায়-আধুনিক। "তুমি তো তোমার উচ্চ আসমানে শুয়ে ঘুমাচ্ছ। এমন ভাবে শোও যেন বিচার-প্রার্থী উৎপীড়িতের মর্মবেদনার চিৎকার তোমার কানে আসে। সেই উৎপীড়িত ব্যক্তি তো তোমার রাজত্বেই ঘটিত কোন জুলুমের বিরুদ্ধে চিৎকার করছে। কারণ যে কোন অত্যাচারই ঘটুক সে তোমারই কৃত অত্যাচার। কুকুর যখন কোনও আগন্তুকের কাপড় কামড়ে

ছিঁড়ে দেয় তখন আসলে সে কামড় কুকুরের নয়, সে কামড় হচ্ছে সেই গৃহস্থের যে সেই কুকুর পালন করেছে। সাদী, তুমি তো কথা বলতে খুব সাহসী। তোমার হাতে যখন তলোয়ার আছে, হক অর্থাৎ হক কথা বলার ক্ষমতা আছে, সেই তলোয়ার হাতে নাও আর ফতেহ করে যাও। যা কিছু জানো বলে ফেল —কারণ সত্যকথনই ভাল (তোমার পরোয়া কী?) তুমি তো ঘুষও খাও না আর মোসাহেবীও কর না।" (ঐ পৃষ্ঠা ৪৭) ভারতের বর্তমান শাসকশ্রেণীর ঘাতক 'কুকুর'দের প্রতিপালক দিল্লীর মসনদের অধিকারীদের উদ্দেশ্যে সাদীর এই কবিতা পাঠানো যেতে পারে। আর সুভাষ মুখুজ্যেদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায় শেষ বাক্যটি। অবশ্য বলে রাখা দরকার যে বেশীর ভাগ এই রকম কথা নানান কৌশলের মাধ্যমেই সাদীকে বলতে হয়েছে। কারণ কালটা তো মধ্যযুগ, সামন্ত আধিপত্যের যুগ। মূল পাঠে কবি কর্তৃক এই সব কৌশলের ব্যবহার লক্ষ্য করে যাওয়াও চিত্তাকর্ষক হয়। সাদী অবশ্য জীবনের বেশীর ভাগ সময় পর্যটন করে কাটিয়েছেন। তাঁর লেখার জনপ্রিয়তা তাঁর স্বাতন্ত্র্যবোধকে কিছু সাহায্য করেছিল। তবু একথা ভুললে চলবে না তাঁকেও এক রাজার পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং তার জন্য মূল্যও দিতে হয়েছিল। উক্ত রাজার স্তুতিতে রচিত কবিতাগুলিই তার সাক্ষ্য।

এবার হাফেজের কথা বলবো। হাফেজ ইরানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি তাতে সন্দেহ নেই। হাফেজ প্রধানতঃ প্রেম ও মিসটিসিজমের কবি। কিন্তু তাঁর এই মিসটিসিজম্ প্রায় অজ্ঞেয়বাদের পর্যায়ে পৌছেছে (কে কস্ নগশওদ ও নগশায়াদব হিকমত ঈঁ মুআম্মারা)। হাফেজও বিষাদ ও বিষণ্ণতার বিপক্ষে। তিনিও আনন্দের কবি। "যতদিন না জীবনের শেষ ফয়সালা হয়ে যায়, ততদিন তোমার কাজ যেন খুশীর কাজই হয়।" (সবরঙ্গ, কিতাবঘর দিল্লী সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৭০) "মূল্যবান জীবন যখন অল্প সময়ের, মুখে হাসি ও তাজা চেহারা হওয়া চাই" (ঐ পৃষ্ঠা ৩৭০) গান ও সরাবের মধ্যে যিনি শাস্ত্র পাঠ করতে বলেন (ঐ পৃষ্ঠা ৭) তিনি যে মাদ্রাসার মধ্যে কিছু দেখবেন না তাতে আর আশ্চর্য কী? তিনি বলেছেন—মাদ্রাসার বহস্ আলোচনা তর্কাতর্কি বড় বড় স্তম্ভ ও প্রাসাদে কি লাভ যদি দিলটাই জ্ঞান আহরণ করার মতো আর চোখটা দেখার মতো না থাকে। (ঐ পৃষ্ঠা ৩৮৮)।

বিড়ালতপস্বী অত্যাচারীদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করছেন: "হে স্ফূর্তিতে বিচরণকারী তিতির, তুমি কোথায় যাচ্ছ? বিড়াল নামাজ পড়েছে এই জ্ঞানে মি এত উৎফুল্ল হয়ো না (আয় কবকে খোশ খারাম কুজা মিরাওয়ি

বি-ইস্ত গুবুরা মশও কে গুরবা আবেদ নামাজ কবুদ)।" কবি তো আগেই বলেছেন—যে ব্যক্তি মানুষের উপর অত্যাচার করে কুকুরও তার চেয়ে ভাল। (পৃষ্ঠা ৩৮৭)। বলেছেন: "অত্যাচারীর অনুসরণকারী হয়ো না।—এ ছাড়া অন্য যা ইচ্ছা তুমি করো, কারণ আমার সাধন-পদ্ধতিতে এছাড়া আর কিছু পাপ নয়। (মুবাশ দর্ পায়ে আজার ও হর্ চে খাহি কুন্ কে দর তরীকাতে মা হীচ আজহ্ঁ গুনাহ নীস্ত)।" (এই উদ্ধৃতিও রামমোহনের প্রিয় এবং তাঁর ফারসী কিতাব 'তুহফা'তেও উদ্ধৃত)। এর অব্যবহিত আগের দুটি লাইন রামমোহনও দেননি, আমিও দিলাম না। তিনি কেন উদ্ধৃত করেননি, আমি জানি না। আমি স্বীকার করছি আমার হিম্মত নেই। ঐ দুটি লাইনে অত্যাচারীদের পাপের ঘৃণ্যতা বোঝাবার জন্য এমন উপমা আছে যা ধর্মান্ধ সহ্য করবেন না। প্র্যাকটিক্যাল কবি সাদী তো বলেছেন বুদ্ধিমান মানুষ জানে কখন মুখ খুলতে হয় এবং কখন নীরব থাকতে হয়। আমি এখানে কবির উপদেশই শিরোধার্য করলাম।

বলা বাহুল্য, এ ক্ষুদ্র আলোচনায় পারস্যের দুই মহাকবির অল্পই পরিচয় থাকলো। উভয়ের বিশেষ করে হাফেজের ভাষার সুমিষ্টতা অনুবাদে আনা কঠিন। তাঁর বিস্তৃত সাহিত্য আলোচনার যোগ্যতাও আমার নেই। তবে পাঠককে এ বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া কর্তব্য যে মধ্যযুগের কবিদের যে সীমাবদ্ধতা তা উভয়েরই আছে। সে-সব আলোচনা বা পূর্ণ আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়।

বিচিত্র ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের প্রতিফলন'

রহস্য রোমাঞ্চ ডিটেকটিভ কাহিনীর একজন বিশ্ববিখ্যাত লেখিকা আগাথা ক্রিস্টি মারা গেলেন। রহস্য, রোমাঞ্চ, ক্রাইম ফিকশান (অপরাধী কে?) —এই ধারা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে চলেছে। জনপ্রিয়তাও যথেষ্ট। অনেক পাঠকের আকর্ষণ হচ্ছে এই ধরনের কাহিনী ও উপন্যাস। মানসিক স্বভাব কিংবা বৃত্তি অনুশীলনের তাগিদে যাঁরা সিরিয়াস পুস্তকে সময় দেন বা দিতে বাধ্য হন তাঁরাও অনেক সময় সুযোগ মতো এরকম পুস্তক পড়েন এবং আনন্দ পান। উইলকি কলিন্সের (১৮২৪-৮৯) রহস্য উপন্যাস হয়তো এখন অনেকটা বিস্মৃত। কিন্তু কনান ডয়েল (১৮৫৯-১৯৩০) এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি তাঁর শার্লক হোম্‌স্ কাহিনীগুলি বেশ উঁচু থাকেই উপস্থিত করেছিলেন। তারপর থেকে এ ধারার লেখকের সংখ্যা ক্রমোত্তর বেড়েই গেছে। মার্জনীয় অতিশয়োক্তির ছাঁটান বাদ দিলে এদের সংখ্যা যদি এখন 'অগণনীয়' বলা যায় এমন কিছু অন্যায় হয় না। অর্ধশতাব্দী আগে এড্‌গার ওয়ালেস, স্যাপার, ওপেনহাইম প্রমুখদের নামই ছিল সামনের সারিতে। তারপরে পর পর আসরে নেমেছেন এবং নাম করেছেন অনেক লেখক। ইতিমধ্যে সে যুগেই আমাদের মাতৃভাষায় পাঁচকড়ি দে'র পর দীনেন রায় স্থান করে নিয়েছিলেন। ইদানিংকালে ইংরাজী ক্রাইম ফিকশান (অপরাধী কে?) এবং রহস্য রচনায় প্রথম সারির লেখক-লেখিকার তালিকার মধ্যে ক্রিস্টির স্থান। শুধু প্রাসঙ্গিক হিসেবেই এ কয়টা কথা বললাম। নচেৎ এ প্রবন্ধের আলোচ্য সাধারণ ভাবে উল্লিখিত সাহিত্য নয়, ক্রিস্টির সমগ্র সাহিত্যও নয়। আমার উদ্দেশ্য খুব সীমিত। ক্রিস্টির একটি পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা।

তত্ত্বের দিক থেকে হেতু শুধু এই। সমাজে যে বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব বা ঠোকর চলছে তার প্রতিফলন সর্বত্র। অপরাধ ও রহস্য কাহিনীর (ক্রাইম এবং মিস্ট্রি স্টোরিজের) ক্ষেত্রে আরও স্বাভাবিক। রহস্য রোমাঞ্চে বিভোর না হয়ে একটু তলিয়ে দেখলেই এর নানান চেহারা দেখা যাবে। বছর পঁচিশেক আগে একজন অখ্যাত মার্কিন লেখকের একটা বই পড়েছিলাম। তাতে একজন বৈজ্ঞানিককে আসল অপরাধী দাঁড় করানো হয়েছে। যুদ্ধের মারণাস্ত্র-গুলির জন্য ধনতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিজমকে দায়ী না করে উদ্ভাবক বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানকে দায়ী করা ধনতন্ত্রের প্রবক্তাদের একটা কৌশলে দাঁড়িয়েছে। সে সময় আমেরিকার এটা আরও দরকার হয়েছিল। কারণ, হিরোসিমা নাগা-

সাকির নৃশংসতার কলঙ্কের ছাপ তখন মানুষের মনে টাটকা। উল্লিখিত কাহিনী মাধ্যমে মানুষের অসতর্ক মনের অগোচরে কিভাবে মার্কিন ধনতান্ত্রিক প্রচারের উদ্দেশ্য সাধন করা হয়েছে তা লক্ষণীয়। লেখক সচেতনভাবেই মার্কিন প্রচারের লক্ষ্য সামনে রেখে এরূপ লেখা রচনা করেছেন এমন বলার দায়িত্ব না নিলেও চলে। এমনও হতে পারে শ্রেণীসুলভ মানসিকতার কারণেই হোক বা পারি-পার্শ্বিক প্রভাবের প্রাবল্যেই হোক বা ধনতান্ত্রিক সমাজের উপর-থাকের মানুষদের তুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্যেই হোক লেখক নিজেও নিতান্ত ঘটনাচক্রে উল্লিখিত প্রচারের অস্ত্র হয়ে পড়েছেন। ফল একই। গল্পে দেখা গেল একজন বৃহৎ পুঁজিপতি যিনি এক প্রকাণ্ড শিল্প প্রতিষ্ঠা করেছেন হঠাৎ নিহত হলেন। প্রচলিত কৌশলে নানান ধাঁধা লাগিয়ে লেখক কাহিনীকে উদ্দেশিত পরিণতিতে নিয়ে গেলেন। শেষে অপরাধী যিনি ধরা পড়লেন তিনি হলেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান বৈজ্ঞানিক। গোয়েন্দাকে তাঁর কীর্তি ব্যাখ্যা করতে বলায় তিনি বললেন—"আজকের মারণাস্ত্রগুলি দেখিয়ে দিচ্ছে বৈজ্ঞানিকরা সেই ধরনের মানুষ যারা ঠাণ্ডা মাথায় সুপরিকল্পিত ভাবে হাজার হাজার নির্দোষ মানুষকে নিহত করার ব্যবস্থা করতে পারে। তাদের বিবেকে বাধে না। সেইজন্য প্রথম থেকেই নানান রকম ঝুঁটো খি (ফল্‌স্‌ কিউ) নিয়ে তদন্ত চালিয়ে গেলেও বৈজ্ঞানিকদের ঐ বিশেষ চরিত্রের জন্য প্রধান বৈজ্ঞানিকদের কথা আমার মাথায় ছিল। শেষে যখন আবিষ্কার করলাম নিহত পুঁজিপতি তাকে ঠকিয়ে তার কাছ থেকে তার আবিষ্কৃত তত্ত্ব, তৈরী করার পদ্ধতি এবং ডিজাইন হাত করে এবং তারই উপর তার অন্যতম বৃহৎ শিল্পটি গড়ে তোলে তখন হত্যা করার উদ্দেশ্যও পেয়ে গেলাম।" গোয়েন্দা বোঝালেন—"বৈজ্ঞানিকদের শুধু বুদ্ধিই ছিল, তার বলে সে না হয় কৌশল উদ্ভাবন করেছিল। কিন্তু শিল্প গড়ে তুলতে চাই পুঁজি, উদ্যোগ ও সংগঠনের ক্ষমতা। নিম্নতম ন্যূনতম প্রয়োজন হচ্ছে পুঁজি, যা-তার মোটেই ছিল না। অথচ প্রতিভাবান উদ্যোগী পুঁজিপতির ন্যায্য প্রাপ্য মুনাফার বিরাট অংশের ভাগের নিশ্চয়তা না পেলে পুঁজিপতিকে বৈজ্ঞানিক তার বিদ্যে ছাড়তে রাজি হলো না। এর অর্থ সমাজকে পিছিয়ে রাখা। যে হাজার হাজার মানুষ এখন এই শিল্পে কাজ পেয়েছে তাদের সেই কাজের সম্ভাবনাকে রোধ করা। এই সামাজিক দৃষ্টিতে পুঁজিপতির অপরাধকে যে-কোনও ব্যক্তি তুচ্ছ অপরাধ বলে মেনে নেবেন। অথচ ঠাণ্ডা মাথায় নৃশংসতা করতে অভ্যস্ত বৈজ্ঞানিক চরিত্রের দরুন এই ব্যক্তি দেশের এমন এক বড় স্তম্ভ, এক উদ্যোগী পুঁজিপতি, যার প্রয়াসের ফলে হাজার হাজার মানুষের রুজি হচ্ছে, ইতিপূর্বে অদৃষ্টাবিত নতুন

উৎপন্ন দ্রব্য উন্নততর পদ্ধতিতে উপস্থিত করা হচ্ছে, নিছক ব্যক্তিগত ক্ষতির প্রতিশোধের আক্রোশে এরকম প্রতিভাবান স্রষ্টাকে হত্যা করলো।"

এই হল গল্পের সারমর্ম। গল্পে মায়া দরদ সব কিছু উথলে উঠেছে পুঁজিপতির পক্ষে। আর নির্মম হাতে প্রবঞ্চিত বৈজ্ঞানিককে ঠাণ্ডা মগজে নরহত্যা করার মতো শয়তান হিসেবে খাড়া করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকের মেধার ও মেহনতের ফল চুরি করার অপরাধে অপরাধী এবং পণ্যের আসল স্রষ্টা শ্রমিকের উদ্বৃত্ত মূল্যের শোষণকারীকে মহত্ত্ব-মণ্ডিত করে উপস্থিত করা হল। মার্কিন পুঁজিবাদের এমন খোলাখুলি ওকালতি এবং তাদের চুরি বদমাসী সব কিছুর পক্ষে অভিনব যুক্তি রচনা চমৎকৃত করে। কি ধরনের সাহিত্য ওয়াটারগেটের পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে তার একটি নিদর্শন।

ক্রিষ্টির যে উপন্যাসটির কথা আলোচনা করছি সেটির চরিত্র ঠিক বিপরীত। উপন্যাসটির নাম হচ্ছে 'ডেসটিনেশান আননোন'। ১৯৫৪ সালের রচনা। "ব্রেন ড্রেনের" কথা আমরা জানি। উনবিংশ শতাব্দী ধরে সাম্রাজ্যবাদ দুনিয়া জুড়ে উপনিবেশ এবং অনুন্নত দেশসমূহে তৈরী পণ্য বিক্রয় করেছে এবং সেই পণ্য উৎপাদনের জন্য ঐসব দেশ থেকেই সস্তায় কাঁচা মাল সংগ্রহ করেছে। এখন আবার সেই মতো ভাবে তারা মেধাবী বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ এবং ধীসম্পন্ন নিপুণ শ্রমিক ছেঁচে তুলে নিজ নিজ দেশে নিয়ে যাচ্ছে। এরই নাম দেওয়া হয়েছে "ব্রেন ড্রেন"—অর্থাৎ দেশের "মেধা" ধরে রাখা জল ড্রেন দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার মতো বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে; বিদেশে অর্থাৎ অধিকতর শক্তিশালী ধনতান্ত্রিক দেশে চলে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজি বেশী। ফলে এই ড্রেনের স্ফীততম ধারা এবং বিরাটতম অংশ থেকেছে ঐ দেশমুখী। যুদ্ধের পূর্বেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্যাসিজম্ প্রপীড়িত ইউরোপের অনেক বৈজ্ঞানিককে পড়ে পাওয়ার মতো পেয়ে যায়। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর মার্কিনমুখী ড্রেনের প্রবাহের প্রাবল্য অনেক বেড়ে যায়। তারা সুপরিকল্পিতভাবে সারা বিশ্ব হতে মেধাবী বৈজ্ঞানিক, নিপুণ শ্রমিক ও সম্ভাবনাবিশিষ্ট ছাত্র ও শিক্ষানবীশদের নিয়ে যেতে থাকে। বৈদেশিক সাহায্য আখ্যায় এঁদের যে লুঠের কৌশল তার একটা উদ্দেশ্য এই ধরনের গুণ সম্পন্ন শ্রমশক্তির আধার ব্যক্তিদের রিক্রুট করা বা সংগ্রহ করা। ইকনমিকস্ অব এডুকেশান আখ্যায় ধনতন্ত্রের অর্থনীতির এক বিশেষ শাখার উদ্ভব হয়েছে। তার একটা অংশ হচ্ছে শিক্ষায় বৈদেশিক সাহায্যদানের লাভালাভ বিষয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার বা বিশেষজ্ঞ তৈরী করতে যা খরচ তার চেয়ে উন্নতিকামী দেশের নিজস্ব খরচকে

প্রভাবিত করে যদি এই সব তৈরী বিশেষজ্ঞ সে সব দেশ থেকে আনা যায় তা হলে লাভ হয় বেশী। বিষয়টির এর চেয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। (কৌতূহলী পাঠক আমার লেখা 'শিক্ষা ও শ্রেণী সম্পর্ক' নামক পুস্তক দেখতে পারেন। বিস্তৃততর আলোচনা ঐ পুস্তকে আছে।)

প্রথম দিকে মার্কিন ধনতন্ত্রের এই নীতির আঘাতের প্রথম লক্ষ্য থাকে পশ্চিম ইউরোপ। একদিকে চলে "মারশ্যাল এড" আর অন্য দিকে পশ্চিম ইউরোপ থেকে মেধা সিঞ্চন। মাতৃভাষা এক হওয়ার দরুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ইংলণ্ডের "ব্রেন পণ্যের" বিক্রয় উপযোগিতা থাকে বেশী। তবু এর অনুভূতি ১৯৫৪ সালেই তীব্রতম ভাবে একজন 'ক্রাইম ফিকশান'-এর লেখিকার বুকে সাড়া দিল এটা চমৎকৃত করে। এতে পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে তাঁর অনুভূতির তীক্ষ্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজনৈতিক লেখকদের বাইরে লেখক সমাজে এটা খুব সহজপ্রাপ্য নয়। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধের মনোভাব এমনকি রক্ষণশীল দলের কিছু অংশের মধ্যেও দেখা গেছে।

"ব্রেন ড্রেন" ছাড়া গল্পটির আর এক দিক হচ্ছে পুঁজিপতিরা কেমন করে কেবল টাকার জোরে মেধা তথা মেধাবী ব্যক্তিদের হাতের মুঠোর মধ্যে আনে তার বিবরণ। টাকার সঙ্গে উপযোগী ছল বল কৌশলের জালও ফাঁদতে হয়, যেমন অন্যান্য সম্পত্তি আহরণে করতে হয়। বই-এ তারও বিবরণ আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা মূল শক্তি হলো টাকার জোর। এটাকেই লেখিকা সুস্পষ্ট করেছেন।

আলোচ্য পুস্তকের গল্প এইরূপ। সারা ইউরোপ ধরে হঠাৎ দেখা যেতে থাকে নামকরা বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকরা নিরুদ্দেশ হচ্ছেন। হঠাৎ নিপাত্তা। ইউরোপের বিভিন্ন সহর ও পল্লী থেকে এরকম ঘটনা মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে বেরোতে থাকে। এর কোন হদিস পাওয়া যায় না। নিরুদ্দেশ ব্যক্তিদের কোন খবর পাওয়া যায় না। পুলিশ গোয়েন্দা তৎপর হয়েও কিছু করতে পারেন না। তাদের প্রতিক্রিয়া একজনের ভাষায়: "ইউ কান্‌ট লুজ এ টেম সায়েনটিস্ট এভরি মন্‌থ অর সো উই হ্যাভ নো আইডিয়া হাউ দে গো অর হোয়াই দে গো অর হোয়্যার!" ("টেম" শব্দটি লক্ষণীয়, বন্য নয়, পোষ মানানো —অর্থাৎ শান্ত নিরীহ।) মর্মার্থ প্রতি মাসে একজন শান্ত নিরীহ বৈজ্ঞানিককে হারানো যায় না। কেমন করে তারা যায়, কেন যায় আর কোথায়ই বা যায় ধারণাও হয় না। সদ্য নিরুদ্দেশ একজন বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে তদন্তের সময় তদন্তকারী ডিটেকটিভ বলছেন: "ইয়েস, হি ওয়াজ এ ব্রিলিয়াণ্ট সায়েনটিস্ট।

দ্যাটস্ রিয়েলি দি ক্রাক্স অব দি হোল ম্যাটার। হি মাইট হ্যাভ বিন অফারড্ ভেরী কনসিডারেবল ইনডিউসমেন্টস্ টু লীভ দিস কানট্রি অ্যাণ্ড গো এল্স্ হোয়্যার।" (মর্মার্থ: একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। সেই জন্যই তো চিন্তা। তাঁকে অনেক কিছু লোভনীয় প্রাপ্যের আশা দিয়ে এদেশ ছেড়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হতে পারে।) এখানে "এ দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও" কথাটা লক্ষণীয়। নিরুদ্দেশ বৈজ্ঞানিকের স্ত্রীকে তদন্তকারী ডিটেকটিভ জেরা করছেন: "ইউ ডোন্‌ট্ থিঙ্ক হি হ্যাড এনি কোয়ামস ওভার ইটস্ ডেসট্রাকটিভ পসিবিলিটিজ, শ্যাল আই সে? সায়েনটিস্টস্ ডু ফীল দ্যাট সাম্‌টাইমস্।" (মর্মার্থ: আবিষ্কারের বিধ্বংসী সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁর কোনও বিবেক তাড়না ছিল নাকি? বিজ্ঞানীরা অনেক সময় এরকম বোধ করেন।) এটা বলা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক দেশের উদ্দেশ্যে। বিবেকবান বৈজ্ঞানিকেরা সেখানে যেতে চান। (প্রসঙ্গত উপরে প্রথমে বর্ণিত পুস্তকটির সঙ্গে পার্থক্য লক্ষণীয়।) শেষে নানান জটিলতা ভেঙ্গে যা বের হলো তা এক অভিনব ব্যাপার। অ্যারিসটাইডিস নামের একজন প্রকাণ্ড ধনী। তিনি জগতের মধ্যে বৃহত্তম ধনী হতে পারেন। তিনিই এর পিছনে।

মরক্কোতে অ্যাটলাস পাহাড়ের কাছে মরুভূমির মধ্যে তিনি এক দুর্গের মতো প্রাসাদ গড়ে তুলেছেন। কুষ্ঠ চিকিৎসার হাসপাতাল ও গবেষণাগার হিসেবে তার পরিচয় কিন্তু তার আড়ালে পাহাড়ের মধ্যে খোদা বিরাট প্রাসাদোপম সৌধে বৃহৎ সুসজ্জিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যবস্থা এবং বৈজ্ঞানিকদের আবাসস্থল। এমন আরামে তাঁদের রাখা হয় যা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন না। যা চান তাই পান, সব কিছু হাতের মধ্যে। কিন্তু বন্দী। বের হবার কোনও উপায় নেই। তাঁরা যাতে বন্দিত্বের জন্য মানসিক যন্ত্রণা না পান তার জন্য সিনেমা থিয়েটার খেলা-ধূলার ব্যবস্থা সবই রাখা হয়েছে। উদ্দেশ্য? অ্যারিসটাইডিস নিজের ব্যবস্থা সম্বন্ধে এতই সুনিশ্চিত যে একজন বন্দী মহিলাকে তাঁর উদ্দেশ্য পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন: "আমি একজন ব্যবসায়ী। আবার একজন কলেকটার (সংগ্রহকারী)। ধনসম্পদের প্রাচুর্য পীড়া দিলে, উপশমের উপায়ই এই। আমি অনেক কিছু কলেক্ট (সংগ্রহ) করেছি। ছবি—ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র সংগ্রহ আমার। চীনা মাটির সুন্দর পাত্রাদির সংগ্রহ। আমার ডাকটিকিট সংগ্রহ প্রসিদ্ধ। এর পর আর কি কলেক্ট্ করবো?…শেষে ব্রেন (মেধা) কলেক্ট্ করা শুরু করেছি।…আস্তে আস্তে আমি সারা বিশ্বের ব্রেনের সমাবেশ গড়ে তুলছি। তরুণ বৈজ্ঞানিকদের আমি নিয়ে এসেছি। বর্তমানের অগ্রগণ্য বৈজ্ঞানিকরা বৃদ্ধ

ও অকর্মা হয়ে যাবেন। তখন হঠাৎ সচকিত হয়ে জেগে সারা বিশ্ব দেখবে সব ব্রেনই আমার মুঠোর মধ্যে। তাদের বিজ্ঞানীর প্রয়োজন হলে সে প্লাসটিক সার্জানই হোক বা বাইওলজিস্ট হোক আমার কাছে হাত পাততে হবে এবং তারা আমার কাছ থেকে বিজ্ঞানীর বিদ্যা কিনতে বাধ্য হবে।” শ্রোতা প্রশ্ন করলো, আপনার এটা ফাইনানশিয়াল অপারেশান? আর্থিক কারবার? অ্যারিসটাইডিস উত্তর দিল “তাছাড়া আর কী? আমি তো মূলে ব্যবসায়ী। সেটাই আমার পেশা।” শ্রোতা জিজ্ঞাসা করলো “এদের আপনি পান কিরূপে?” অ্যারিসটাইডিসের উত্তর: “ম্যাডাম, আমি তাদের ক্রয় করি। খোলা বাজারেই করি যেমন অন্য পণ্যাদি করা হয়। অর্থ দিয়ে খরিদ করি। আবার ভবিষ্যত আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সম্ভাবনার এবং সমৃদ্ধ জগতের স্বপ্নে বিভোর যুবকযুবতীদের তাদের স্বপ্নের খোরাক দিয়েই টেনে নিই। গবেষণার সাজসজ্জা উপযোগী ল্যাবোরেটারি চমৎকার কাজ করার সুযোগের ছবি সামনে তুলে ধরি। কেউ কোনও কারণে আইনের চোখে অপরাধী হলে তাদের নিয়ে এসে নিরাপদ আশ্রয় দিই। সেই সব অপরাধী প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকরা নিরাপত্তার বদলে তাঁদের ব্রেন বিক্রয় করেন।”

উপরে প্রথমে বর্ণিত পুস্তকে বৈজ্ঞানিকের প্রকৃতির সম্বন্ধে বলা হয়েছে, বৈজ্ঞানিকরা সেই প্রকৃতির মানুষ যারা ঠাণ্ডা মাথায় নৃশংস কাজের পরিকল্পনা করতে পারে। ক্রিস্টি তাঁর উল্লিখিত পুস্তকে বলেছেন ঠিক তার বিপরীত। পুঁজিপতির নিযুক্ত মনস্তাত্ত্বিক বলছেন: “গল্পে যেমন বৈজ্ঞানিকদের ঠাণ্ডা মাথার বলে বর্ণনা করা হয়, তারা মোটেই সেরকম 'কাম অ্যাণ্ড কুল' নয়। আবেগজনিত উত্তেজনা ও অস্থিরতায় একজন বড় টেনিস খেলোয়াড় কিংবা অপেরার অভিনেত্রীর সঙ্গেই তাদের তুলনা চলে এবং সমতুল বলা যায়।”

যাই হোক শেষে ডিটেকটিভদের কৌশলের কাছে অ্যারিসটাইডিসকে হার মানতে হলো। তার সব খেলা গেল ফাঁস হয়ে। বন্দী করা বৈজ্ঞানিকদের ছাড়িয়ে আনা হলো।

অবশ্য এর মধ্যে মধ্যযুগে হাসান বিন সাব্বার (১০৯০ খ্রীষ্টাব্দ) দুর্গের কথা এবং পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ জুড়ে হাসান বিন সাব্বার বিস্তৃত গোপন হিংসাত্মক সংগঠনের ছায়া আছে। হাসান বিন সাব্বা শক্তিশালী দল গঠন করে ইরানে দুর্গম স্থানে দুর্গ তৈরী করে। সেখানে স্বর্গতুল্য আরামের ব্যবস্থা থাকে আবার কঠোর শাস্তিরও ব্যবস্থা থাকে। এক গোপন দুর্ধর্ষ বাহিনীর কেন্দ্র স্থাপন করে এক যুগ ধরে ইরান আরবের রাজা প্রজা সকলকে আতঙ্কিত করে

রেখেছিল। এ গল্প নয়, ইতিহাসের সত্য কাহিনী। এদের মার্কামারা মানুষকে এদের অনুচরদের হাতে প্রাণ দিতেই হত। হত্যা করার অন্যতম পদ্ধতি ছিল ঘাতককে হাসিস খাইয়ে তৈরী করা। তার থেকে গুপ্তঘাতকের ইংরাজি শব্দ অ্যাসাসিন এবং হত্যার নাম অ্যাসাসিনেশান। হাসান বিন সাব্বার কাহিনী অবলম্বনে অর্ধ শতাব্দী আগের নাম করা রহস্য রচনার লেখক ওপেনহাইম একখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। এ সবের প্রভাব বর্ণিত পুস্তকে আছে।

তাছাড়া অ্যাটম বৈজ্ঞানিকদের কাহিনী থেকেও এই পুস্তকের মাল মশলা নেওয়া আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক কেমনভাবে বৈজ্ঞানিকদের মঙ্গলময় বিশ্বের স্বপ্ন দেখিয়ে বিভ্রান্ত করা হয়েছিল তার কাহিনী এখন সুপরিচিত। (দ্রষ্টব্য : রবার্ট জুং লিখিত "ব্রাইটার দ্যান থাউজ্যাণ্ড সান্‌স"।)

সে যাই থাক, আগাথা ক্রিস্টির আলোচ্য পুস্তক একটি মৌলিক সৃষ্টি একথা মানতে হয়। সাধারণভাবে ক্রিস্টি প্রগতিশীল ছিলেন একথা বলার উদ্দেশ্য আমার নয়। আলোচ্য পুস্তকটি বিষয়বস্তুর জন্য আকর্ষণীয় শুধু এইটুকুই বলবো। তার থেকে বড় সত্য গোড়ায় যা বলেছি তাই। সর্বক্ষেত্রের মতো ক্রাইম ফিকশানেও সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের প্রকাশ পায়, তার ছাপ পড়ে। এ পুস্তক তার এক বড় নিদর্শন। প্রথম উল্লিখিত পুস্তকটিতে যেমন সেই দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়াশীল দিকের প্রভাবের নিদর্শন শেষোক্ত পুস্তক অর্থাৎ আগাথা ক্রিস্টির উল্লিখিত পুস্তক তার বিপরীত প্রভাবের নিদর্শন।

বাংলার বিদ্বৎসমাজ

বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতি বিষয়ে এখন অনেকেই লিখছেন। পত্র, পত্রিকা, পুস্তকে এরূপ লেখা খুবই নজরে পড়ে। কিন্তু অধিকাংশতেই কোনও মৌলিক গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায় না। বেশীর ভাগই একই কথা কিংবা হাল আমলের বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ চর্চিত বাঁধা গত।

এ বিষয় উনবিংশ শতাব্দীতেই প্রবন্ধে ও রচনায় বিক্ষিপ্তভাবে হলেও লেখা শুরু হয়েছিল। পত্র-পত্রিকাগুলিতে এর পরিচয় পাওয়া যায়।

ডক্টর দীনেশ সেন এবং তাঁকে অনুসরণ করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকগণ কিছু বিবরণ শৃঙ্খলিত ধারায় এনেছিলেন। পরবর্তীকালে যা প্রথম সামনে আসে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র জীবনী। যথোপযোগী পটভূমিকা হিসাবে তাঁকে উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসকে রাখতে হয়েছে। আর আছে অতুলনীয় সংগ্রহের সমাবেশ ও ব্যাখ্যা। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর ন্যাশনাল দৃষ্টিভঙ্গী। যা তিনি সত্য বলে বুঝেছেন রেখেছেন। অনেকের কাছে এমন কি গুরুস্থানীয়ের কাছে অপ্রিয় হলেও তা নির্দ্বিধায় রেখেছেন—সরল ও সহজভাবে, তিক্ততা ও উগ্রতা বর্জন করে। ফলে সেই কারণেই আরও আকর্ষণীয়। মাঝে চল্লিশ দশকে কল্পনার রাজ্যে উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিবর্তনকে প্রতিফলিত করার চেষ্টায় লিখিত একটি উপন্যাস—সরোজ রায়চৌধুরীর 'শতাব্দীর অভিশাপ' খ্যাতি লাভ করেছিল। এর পর যাঁদের নাম মৌলিকত্বের দাবী করতে পারে তাঁদের মধ্যে, বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় সুপরিচিত শ্রীবিনয় ঘোষের নাম। একাধিক পুস্তকে তিনি উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নানান দিকের প্রতি আলোকপাত করেছেন। আলোচ্য পুস্তকখানি "বাংলার বিদ্বৎ সমাজ" তাঁর অধুনাতম পুস্তকের একটি। সকলকেই নানান তথ্য সমাবেশের মধ্যে স্থান দিতে হয়েছে—তখনকার কাজের প্রগতি ও পুনরুত্থান এই উভয় পক্ষের, (শ্রীবিনয় ঘোষের অঠিক এবং অনুপযোগী ভাষায় অ্যাংলিসাইজড ও ট্র্যাডি-শানিস্ট দুই পক্ষের) বাকবিতণ্ডার বিবরণ বা সারমর্ম। যাঁদের বলা হয় মধ্যপন্থী কিংবা মডারেট তাঁদের কথাও রাখতে হয়েছে। অবশ্য একটু পরীক্ষা করলে দেখা যাবে এঁদের মধ্যপন্থাও শেষ পর্যন্ত একটা কিংবা আর একটা মেরুর দিকে হেলে আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা স্থিতাবস্থার দিকেই এবং

বাংলার বিদ্বৎসমাজ: শ্রীবিনয় ঘোষ, প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৮০।

যেহেতু সমাজের অবস্থা এযুগে স্থিত থাকে না, সেহেতু (খোলাখুলি ভাষায়) পুনরুত্থানের দিকে।

আবার সকলকেই উল্লিখিত কালের রেখাচিত্রে (কার্ভে) কয়েকটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে লক্ষ্য করতে হয়েছে বা স্বীকৃতি দিতে হয়েছে যেমন শতাব্দী শুরু হবার আগেই এমন কি ইংরাজ রাজতক্তে বসার উপক্রম করার সময়েই কলকাতার বা দেশের অবস্থা। যে দুটি ধারা উনবিংশ শতাব্দী ধরে ক্রমোত্তর সুস্পষ্ট রূপ নিতে থাকে তার সূচনা গোড়াতেই দেখা যায়। 'রাজা নবকৃষ্ণ পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে লিখিয়া পাঠান, দাদা, দালান দেও, এইবারই পূজা করিতে হইবে। তিন মাসের মধ্যে দালান প্রস্তুত হইল। নবকৃষ্ণ মহাসমারোহে পূজা করিলেন। সমস্ত ইংরাজদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন।'—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী "·· with my known Sentiments on that Subject Indolatory—having produced a coolness between me and my immediate kindred I proceeded on my travels and passed through different countries chiefly within but some beyond the bounds of Hindoostan with a feeling of great aversion to the establishment of British power in India ···" —Rammohan's autobiographical Letter.

ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ, ইউরোপের নতুন চিন্তাধারার প্রভাব প্রভৃতি ও শেষে ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীলদের চিন্তাধারার আনুকূল্য নিয়ে পুনরুত্থান। শতাব্দীর গোড়ায়, নিতান্ত সংস্কার বর্জনের উল্লাসে নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ, মাঝখানে টাল খেতে খেতে গোঁত্তা (দৃষ্টান্ত, 'রাজনারায়ণ বসুর হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব') শেষে বঙ্কিম ও শশধর তর্কচূড়ামণি বেয়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া (দৃষ্টান্ত, রোষান্বিত লেখনী প্রসূত "We have to eat a little cow dung") এবং পাশাপাশি ঘটে চলেছে ব্রাহ্ম সমাজের পত্তন, আদর্শের দ্বন্দ্ব ও বিভক্ত হওয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কর্মকাণ্ড। এর মধ্যে বাঙালী মুসলমান সমাজের বিবর্তনের সংবাদ কিছু নেই। তার অর্থ এ নয় যে এসবের কোনও প্রতিক্রিয়া সে সমাজে নেই। ভালমন্দ দুই-ই আছে। সে কথা পরে আলোচ্য।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে অবশ্য বর্ণিত ধারার সবকিছু নেই। একদিকে এর আলোচ্য বিষয় সীমিত—কিন্তু অন্যদিকে বিশেষ তথ্যসমৃদ্ধ। তা ছাড়া আছে ব্যাখ্যাসহ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, বিদ্বৎসমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের স্ট্যাটাস

হিসেবে আলোচনা। "বর্তমান সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিষয়বস্তু হলো বাংলা দেশের আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের (প্রধানতঃ হিন্দু) উদ্ভব ও বিকাশের ঐতিহাসিক, সমাজবৈজ্ঞানিক পটভূমি বিচার করা, সেই সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর একটি সামাজিক বর্গ (ওঁদের শ্রেণী বলা নিষ্প্রয়োজন) হিসেবে বিশেষ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পশ্চাৎভূমি বিশ্লেষণ করা।" (আলোচ্য পুস্তক পৃঃ ১৭৮)। এখানে 'নিষ্প্রয়োজন' শব্দটি অনুপযোগী (ইন-অ্যাপ্রোপ্রিয়েট)। খাপসই নয় বললে ভাল হতো। "ভূসম্পত্তির স্থায়ু বিন্যাস যেমন ভেঙে পড়লো, তেমনি মধ্যযুগীয় বুদ্ধিজীবীদের বংশ পারম্পরিক স্থায়ু বিন্যাসও ভাঙতে থাকল।" (ঐ) উপরের 'নিষ্প্রয়োজন'টার বদলে এখানে নেতিবাচক হলেও শ্রেণীর কথা এসে গেল। বলা হলো বুদ্ধিজীবী হয়েছেন বা হচ্ছেন ভূমিহীন, অন্ততঃ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কোনও অংশ বা কোনও অংশের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকার ভিত্তি নেই বা ভেঙ্গে যাচ্ছে। 'সামাজিক পরিবর্তনের ঐতিহাসিক ক্রমের কাঠামোর মধ্যে' (বিনয়বাবুর ভাষা) উক্ত কথা কি সঠিক? এমন কি ১৯১৪ সালের যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্ব পর্যন্ত? ১৯১৭ সালে স্যাডলার (শিক্ষা) কমিশন দেখিয়েছিলেন, ১৮৮০ সাল থেকে পাটের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাইস্কুল ও উচ্চশিক্ষা বেড়েছিল। তাঁরা যা আঁচ করেছেন তাও সত্য। দাম বাড়ার ফলে চাষীর ছেলের শিক্ষা বাড়েনি। জমির উপস্বত্বভোগী বা কুসীদজীবীকার উপর নির্ভরশীল শ্রেণীরাই উপকৃত হয়েছে। (আজ যেমন ফসলের দাম বাড়ার সুযোগে জোতদার ও ধনী কৃষকের অনেকে শিক্ষায় অগ্রসর হয়েছে। এমন কি পুরোনোকালে যেমন জমিদারের ছেলেরা বিলেত ঘুরে আসতেন, এঁদের অনেকের সন্তান বিলেত আমেরিকা ঘুরে আসছেন)। শতাব্দীর গোড়াতে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখের বা যাঁরা স্কুলে ভর্তি হবার জন্য হেয়ার সাহেবের গাড়ির পিছনে ছুটতেন তাঁদের দৃষ্টান্ত উনবিংশ শতাব্দীর সাধারণ দৃষ্টান্ত নয়। বরং কিছুটা উল্টো। তাই তদন্ত করলে দেখা যাবে শহরে অর্থোপার্জন করে গ্রামে বিনিয়োগ করেছেন এবং অল্পবিস্তর ভূসম্পত্তির সম্পর্ক আরও বাড়িয়ে তুলেছেন, এই দৃষ্টান্তও যথেষ্ট। বুদ্ধিজীবীর শ্রেণী অবস্থিতির এই দিকটা পরে আবার তুলছি। সম্পত্তিহীনরাও আছেন। এখানে বক্তব্য বুদ্ধিজীবী নানান শ্রেণীতে বা শ্রেণী-মিশ্রণে বিভক্ত। এটা এড়িয়ে কোনও বোধ্য ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়। আলোচ্য পুস্তকের বিষয়বস্তুর কথা বলতে গিয়ে একথাটা এসে পড়লো।

পুস্তকটি সংক্ষেপে আলোচনা করার অসুবিধা আছে। পুস্তকে অনেক

বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ভাবে এলেও উল্লিখিত বা আলোচিত বিষয়সমূহ বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে পৃথক মনোযোগ দাবী করে। স্থানাভাবে সব আলোচিত হওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য গোড়াতেই বলে রাখা ভাল, কয়েকটি বিষয় তুলে নিয়ে (নির্বাচন করে নয়) আলোচনা করছি।

পুস্তকটি কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত যথা: বাংলার বিদ্বৎসমাজ, বাংলার বিদ্বৎসমাজের সমস্যা, বাংলার বিদ্বৎসভা ও বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী, যন্ত্র, গণতন্ত্র, জনসমাজ ও বুদ্ধিজীবী, বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীর ক্রমবিকাশ, বিদ্যা বিদ্বান ও বিদ্যার্থী বিদ্রোহ। এ ছাড়া আছে দুইটি পরিশিষ্ট যথা (১) বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা (২) বাংলার বিদ্বৎসভা (অতিরিক্ত তথ্য)। আসলে পুস্তকটি বিভিন্ন সময়ে রচিত পৃথক পৃথক প্রবন্ধের সমাবেশ।

সব আলোচনা করার অসুবিধা বললাম। আলোচনায় ছুঁলেই বেড়ে যায় এমন দু' একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া ভাল। একস্থানে বিনয় ঘোষ বলছেন: "আমাদের দেশে তাই সেকালে ব্রাহ্মণ সমাজে ও পণ্ডিত সমাজে কোন পার্থক্য ছিল না। ব্রাহ্মণ বলতে পণ্ডিত এবং পণ্ডিত বলতে ব্রাহ্মণ বোঝাত।" (পৃঃ ৯০) কিংবা "ব্রাহ্মণের কুলগত বৃত্তি ছিল শাস্ত্রব্যবসা ও অধ্যাপনা।" এটাই কি সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজ সম্বন্ধে সঠিক ? আমি বিশেষজ্ঞ নই, গবেষকও নই। অল্পস্বল্প পড়াশুনা যা আছে, মাত্র তাই সম্বল। যাই হোক কবি কঙ্কণ সেকালের (ষোড়শ শতাব্দীর) ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যা লিখেছেন তাই বলছি। পণ্ডিত ঘরের বর্ণনা অবশ্যই আছে। কিন্তু তাই কি সব ? যারা 'শাস্ত্র বিবেচনা করে' বা 'পড়ে ভারত পুরাণ' তাদের বর্ণনা শেষ করে কবি বলছেন "মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে / নগরে যাজন করে / শিখরে পূজার অধিষ্ঠান, চন্দন তিলক পরে দেব পূজে ঘরে ঘরে / চাউলের বোঁচকা বাঁন্ধে টান॥" দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের লেখায় পাই তার দুইশ' বৎসর পরের কথা। "পূর্বকালীন লোক কৌলিন্য মর্য্যাদাকে সাংসারিক সম্মানের প্রধান বলিয়া জ্ঞান করিতেন। শ্রোত্রিয় শ্রীমান বিদ্বান সচ্চরিত্র রাজপুত্রকেও কন্যাদান না করিয়া কদাকার মূর্খ অসচ্চরিত্র দরিদ্র কুলীন পুত্রকেও কন্যা দান করিতে ব্যস্ত হইতেন।" এতেও বোঝা গেল ব্রাহ্মণ-কুল-মর্যাদার সঙ্গে পাণ্ডিত্য অবিচ্ছেদ্য ছিল না। কৌলিন্য মর্যাদাটা কিসে নির্ভর-শীল কবিকঙ্কণে তারও পরিচয় পাওয়া যায়। "ধন লয় নৃপবর, প্রাণ লয় দণ্ডধর, জাতি লয় জ্ঞাতি বন্ধুগণ।" ব্রাহ্মণেরও জাতমান নির্ভর করছে স্বসমাজের উপর। আর সব স্বসমাজই গ্রাম্য স্বৈরাচারে শৃঙ্খলিত। এ বিষয়ে রাজার সঙ্গে প্রজার কোনও তফাৎ নেই। তাই সহজেই সীতার উপমা খুল্লনার ক্ষেত্রেও খাটে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীতেও এই "জ্ঞাতি বন্ধুজনের" জাত নেওয়ার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় দেবী চৌধুরাণীর শুরুতেই "প্রফুল্ল পোড়ারমুখী"র পরিত্যক্ত হওয়ার কারণের বর্ণনায়। এখন আমার মনে প্রশ্ন জাগে লেখক কি পাশ্চাত্য অর্থাৎ ইউরোপের খৃশ্চান প্রীস্টহুড দিয়ে এর ব্যাখ্যার সঙ্গে এটা মিলিয়ে ফেলেছেন? তারাই বা সকলে কি পণ্ডিত ছিল? সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতিগুলির কারণে এটা আরও মনে জাগে। বুর্জোয়া ধনতন্ত্রে সিদ্ধি বা কৃতিত্বের সঙ্গে কৌলিন্য মর্যাদা ও ধন-সম্পত্তি থাকলে তা বাস্তবক্ষেত্রে শীর্ষে ওঠায় আরও সহায়ক হয় এটা সত্য। সামন্ততন্ত্রে তো কথাই নেই। কিন্তু তা বলে শোষণবিশিষ্ট সমাজে, বিশেষ করে সামন্ততন্ত্রে কৃতিত্ব ব্যতিরেকে সম্পত্তি ও কৌলিন্যের মর্যাদা নেই এমন কথা নয়। স্ট্যাটাসের মূল্যই সামন্ততন্ত্রে প্রধান। প্রসঙ্গতঃ, "ধনপতি সদাগরদের কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না" (পৃঃ ১২) এরকম ঝেড়ে বলা যায় কিনা তাই বিবেচ্য। তা হলে ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে কলহটা কিসের? এ বিষয়ে অবশ্য ইউরোপে (ইংলণ্ডেও) দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শহরে শহরে মর্যাদার প্রশ্নে ঝগড়া বিবাদের কথা বৃটিশ ঐতিহাসিক লিখেছেন ও মন্তব্য করেছেন মধ্যযুগের এইরূপ শিশুসুলভ মান-খাতিরের লড়াই টিউডার যুগেও চলছিল। অবশ্য তিনি (বিনয় ঘোষ) ঠিকই বলেছেন: "আধুনিক সমাজে ব্যক্তিগত প্রতিভা ও বুদ্ধির জোরে সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠালাভের যেটুকু সুযোগ বা স্বাধীনতা আছে, আগেকার সমাজে তা একেবারেই ছিল না।" এদেশে আবার পেশা ছিল বর্ণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং ব্রাহ্মণেরও কি সে স্বাধীনতা ছিল? তা হলে কি কুলীনের ছেলে অব-মাননা সহ্য করেও দীনবন্ধু মিত্র বর্ণিত 'জামাই বারিকে' (জামাই ব্যারাকে) ভর্তি হতো? বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন হলেও, উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত হলেও, উপর কাঠামোর জের কাটতে সময় লাগে। এখনও শহরে ব্রাহ্মণ যে কোনও কাজ করলেও গ্রামে লাঙ্গল ধরা আচার-আশ্রয়ী ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে অত সহজ হয়নি। অতীতে ব্রাহ্মণের মর্যাদায় বিত্তের লক্ষণ তো ছিলই না বরং পেশায় সীমাবদ্ধতার দরুন ও প্রত্যক্ষ উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার দরুন স্ট্যাটাসের মর্যাদা থাকলেও সাধারণ ক্ষেত্রে ছিল অর্থাভাব।

উপরে উল্লিখিত দৃষ্টান্তের মতো প্রচুর টুকরো টুকরো বিষয় আছে যা প্রশ্ন জাগায় বা আলোচনা আমন্ত্রণ করে। কিন্তু সে সবের আলোচনা এমন কি উল্লেখও কিছু স্থান দাবী করে। স্থানাভাবে তা সম্ভব হচ্ছে না। বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে রেনেসাঁ, ইত্যাদি অন্যেরা যেমন উল্লেখ করেন তিনিও তেমনই করেছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য আমি একটি উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি।

"পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের যুগে ঐতিহাসিকরা একবাক্যে বলেছেন—'classical learning was endowed with magic qualities'—কিন্তু আমাদের দেশে কি ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত বিদ্যা আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের মনে সেই রকম জাদুকরী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল ?" আমি তাঁকেই বিচার করতে বলবো, যে এই প্রশ্নটি কি ইতিহাসের দৃষ্টিতে খাপসই (এ্যাপ্রোপ্রিয়েট) ? সংস্কৃত বিদ্যা তো নতুন করে পড়ার কথা নয়। বরাবরই ছিল। পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন যুক্তিভিত্তিক দৃষ্টি দিয়ে তার বিচারের কথা যদি বলা হয়, সে আলাদা কথা। ধরুন বিদ্যাসাগর যে দৃষ্টিতে সংস্কৃত শাস্ত্র ও দর্শনকে দেখতেন তা তো তাঁর প্রসিদ্ধ পত্রে বর্ণিত। (এটা ও বিষয়ে তাঁর সম্পূর্ণ বক্তব্য তা আবশ্যিকভাবে ধরে নেওয়া যায় না এটা আমিও বুঝি, মার্কসবাদী দৃষ্টিতে বিচারের পদ্ধতি কি হবে তাও তুলছি না) যাই হোক তিনি সংস্কৃত পড়ার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। সংস্কৃত, পালি, ফারসী না জেনে শুধু অনুবাদের উপর নির্ভর করে দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের যে স্বাদ তা পাওয়া যায় না। ভাষার সম্পর্ক ও মৌল ও প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে নিবিড়-পরিচয়ের কারণে সংস্কৃত জানার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী।

প্রাচীন সাহিত্য ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় থাকা দেশের মানুষের একান্ত কর্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে এটাও সচেতন থাকা দরকার যে সেই পরিচয়টা এনলাই-টেনমেণ্ট কিংবা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দৃষ্টিতে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিভিত্তিক দৃষ্টিতে সমৃদ্ধ হওয়াও প্রয়োজন। পরিচয় এক জিনিস এবং শেষোক্ত উপায়ে তার বিশ্লেষণ ইত্যাদি আর এক জিনিস। শেষেরটা যদি না হয়, বরং বিপরীতটা হয় তা হলে লাভ কি ? তাছাড়া উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যতিরেকে প্রকৃত পরিচয়ও সম্পন্ন হয় না। সংস্কৃত ক্লাসিকস্ পড়া যদি বর্ণাশ্রমের সংস্কারকে দৃঢ় করে এমনকি বর্তমান কালেও তার পক্ষে অ্যাপলজি খাড়া করে বা বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমালোচকদের লেখার দীপ্তিকে ম্লান করার চেষ্টা করে তাতে আর লাভ কি ? গুরুর নির্দেশে আঙুল কাটার বর্ণনা, কানে শীসে ঢেলে দেওয়ার বর্ণনা এমন কি শুধু গুরুর মান্যতায় আলে জল আটকাবার জন্য শরীর পাতন এইসব ঐতিহ্যের মোহ জাগরিত করাটাও তো কাম্য নয়। বুঝি, শ্রীবিনয় ঘোষও তা চান না। যতটুকু পড়া আছে তাতেই বুঝি ঐ কথাই সব নয়। ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি শাস্ত্র সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট সৃষ্টির সঙ্গে ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলি সবে মিলে যে বিরাট মহাসমুদ্র তার পরিচয় এতো ক্ষুদ্র পরিমাপে বোঝা যায় না। আমার শুধু বক্তব্য, দৃষ্টিভঙ্গীটাই তো আসল প্রশ্ন। ক্লাসিকস্

পড়া বা না পড়া তো পৃথক প্রশ্ন। সে প্রশ্নে তো আসল প্রশ্নের মীমাংসা হয় না।

গ্রীক ক্লাসিক্স্ তো ইংরেজের ক্লাসিক্স্ নয়। ইংরেজের ক্লাসিক্স্ হওয়া উচিত ওডেন এবং থরের কাহিনী সম্বলিত কিছু। যাই হোক গ্রীক ও ল্যাটিন ক্লাসিক্স্ থেকে ইংরাজ বা এনলাইটেন্‌ড্ ইউরোপীয়ান বুদ্ধিজীবী কি নিয়েছিল ?

"When Milton was an undergraduate, familarity with the great pagan names and stories suggested to young patriots, as Royalist writers observed with regret, the civic ideals of ancient republics" (Treve yan's England under the Stuarts—P.15)

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের তরুণ বুদ্ধিজীবীর নিকট ক্লাসিক্স্ প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাধারণতন্ত্রগুলির রাজনৈতিক আদর্শ তুলে ধরতো। অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিপ্লবীদের উৎসাহের যোগান দিত। আমাদের শাস্ত্র ও দর্শন থেকে কী এইরূপ অনুপ্রেরণা পাওয়া যায় ? বৌদ্ধ আচারে কিছু পাওয়া যায় বলে, বুদ্ধের জীবনের কাহিনী আদির বুর্জোয়া গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সংস্কৃতিবানদের মধ্যে প্রভাব হয়েছে, এটা দেখা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দৃষ্টিতে এ বিষয় বোঝা সহজের জন্য আরবদের সঙ্গে তুলনা করা ভাল। ইউরোপে গ্রীক ক্লাসিক্স্ পৌছে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁদের গুরুত্ব যথেষ্ট। কিন্তু উপরিউক্ত প্রভাব তাঁদের উপর তো হয় নি পরে যেমন ইউরোপের আদর্শে হয়েছে। গ্রীক ক্লাসিক্স্ বিজ্ঞানকে এক জায়গায় আড়ষ্ট করেছিল, সেও আজকালকার বৈজ্ঞানিকরা বলছেন। তাছাড়া শ্রীবিনয় ঘোষ যাঁদের ট্রাডিশনালিষ্ট বলেছেন, তাঁরাও কী দেশের ঐতিহ্যের উপরই তাঁদের তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন ! তা হলে তাঁদেরও লেখায় কোম্‌ত্ পজিটিভজম প্রভৃতির এত উল্লেখ কেন ? উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঢলে পড়া ব্রিটিশ ও ইউরোপীয়ান বুর্জোয়ার ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের মিশ্রণের চেষ্টার প্রতিফলন আমাদের সাহিত্যে কেন ? সত্য বলতে এটাই স্বীকার করতে হয়, যাঁরা নিজেদের ট্র্যাডিশনালিষ্ট বলেন তাঁরাও কম অ্যাংলিসাইজ্‌ড নন। শশধর তর্ক চূড়ামণি বিদ্যুতের সঙ্গে টিকির মিলন করে একটা তাৎপর্য বার করেছিলেন। ঠিক যেমন মৌলানা মৌদুদীর শিষ্যরা মহাকাশ ভ্রমণ থেকে পয়গম্বরের স্বর্গ ভ্রমণের বৈজ্ঞানিক সমর্থন পেয়েছেন। ইউরোপের বৈপ্লবিক সাহিত্য যেমন অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত করেছে তেমনই প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যও প্রতিক্রিয়ার সমর্থন-সন্ধানীদের উৎসাহিত করেছে।

এই আতঙ্কেই তো বিদ্যাসাগরের সেই প্রসিদ্ধ পত্র। তিনি আইডিয়ালিজমের প্রধান প্রবক্তা বার্কলে পড়ানোর বিরুদ্ধে তো এই কারণে যে ঐ দার্শনিকের লেখা পড়লে এখানকার আইডিয়ালিস্ট দর্শনের উপর ভক্তি বাড়বে। বিদ্যাসাগর বলছেন "বিশপ বার্কলের Inquiry বই সম্বন্ধে আমার মত এই যে পাঠ্য পুস্তকরূপে এ বই পড়াতে সুফলের চেয়ে কুফলের সম্ভাবনা বেশী। কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য আমাদের পড়াতেই হয়। কি কারণে পড়াতে হয় তা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।" শেষোক্ত উক্তিতে একটা বাধ্যবাধকতার ইশারা আছে। এ চাপ যে প্রচলিত রীতি ও প্রথার চাপ সেটা সহজেই বোঝা যায়। অবশ্য সে-চাপ ছাড়াও স্বতন্ত্রভাবেও পড়ার প্রয়োজনীয়তা তিনি নিশ্চয়ই ভাবতেন। দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের জন্যও তা ভাবা স্বাভাবিক। তিনি বলছেন "কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন যে ভ্রান্ত দর্শন, সে সম্বন্ধে এখন আর বিশেষ মতভেদ নেই। তবে ভ্রান্ত হলেও এই দুই দর্শনের প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। সংস্কৃতে যখন এইগুলি পড়াতেই হবে তখন তার প্রতিষেধক হিসেবে ছাত্রদের ভাল ভাল ইংরেজী দর্শন শাস্ত্রের বই পড়ানো দরকার। বার্কলের বই পড়ালে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে বলে মনে হয় না, কারণ সাংখ্য ও বেদান্তের মতনই বার্কলে এক শ্রেণীর ভ্রান্ত দর্শন রচনা করেছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি"। এতে কি বিদ্যাসাগরকে সমন্বয়ের ঋষি বলে মনে হয়? বরং বিপরীত। বিদ্যাসাগর নিজেই সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করেছেন; "পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে সব জায়গায় মিল দেখানো সম্ভব নয়।" অবশ্য শ্রীবিনয় ঘোষ 'ভারতবিদ্যা' ও 'পাশ্চাত্য বিদ্যা' শব্দ দুইটি ব্যবহার করে তাঁর নিজস্ব মত বলেছেন: বিদ্যাসাগরের কর্মনীতির যে সুর "সেই সুরটি হলো পাশ্চাত্যবিদ্যার সঙ্গে ভারতবিদ্যার সমন্বয়।" (বিদ্যাসাগর পুস্তক দ্রষ্টব্য)। একটা দেশের বিদ্যা তো এক ধরনের নয়। বার্কলে, লক, হিউম, ভলতেয়ার, দিদেরো এক জিনিস নয়। এমন কি আইডিয়ালিজমেরও তরিতফাং থাকে। ভারতের বৌদ্ধদের আদর্শ দর্শন ও ব্রাহ্মণদের আদর্শ দর্শন এক জিনিস নয়। আবার তার মধ্যেও তরিতফাৎ আছে। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গী ও তত্ত্বের ভিত্তিতে বিদ্যার পরিচয় না দিয়ে দেশের বিদ্যা বললে অর্থ সরল না হয়ে অর্থবিভ্রাট হতে পারে। বিশেষজ্ঞের লেখায় গ্রীক প্যানথীইজম ও বেদান্তের পার্থক্য বুঝিয়ে দিতে দেখেছি। কোনও বিশেষজ্ঞ দাবী করেন সুফী-বাদে গ্রীক প্যানথীইজমের প্রভাব আবার অনেকে বলেন ভারতের বেদান্তের প্রভাব। যে যাই বলুন, প্রভাবটা বলেন দর্শনের, গ্রীকবিদ্যা বা ভারতবিদ্যার বলেন না।

প্রসঙ্গতঃ এখানে রামমোহনের—বিনয়বাবুর ভাষায় একজন 'অ্যাংলিসিস্টের' একটি উদ্ধৃতি স্মরণে এল। রামমোহন তাঁর প্রতিপক্ষ মাদ্রাজের গোঁড়া হিন্দু শাস্ত্রী-স্বাক্ষরে লেখা প্রতিবাদের জবাবে লিখছেন :

"I beg to be allowed to express the disappointments I have felt in receiving from a learned Brahmin controversial remarks on Hindu theology written in a foreign language, as it is the invariable practice of natives of all provinces of Hindustan to hold their discussions on such subjects in Sanskrit, which is the learned language common to them all and in which they may naturally be expected to convey their ideas with perfect correctness and greater facility than in any foreign tongue etc" (S. B Samaj edition Part II Page 83)

রামমোহন সন্দেহ করেছেন প্রতিবাদটি কোনও ইংরাজী জানা গোঁড়া হিন্দুর লেখা, যে-হিন্দুর মূল সংস্কৃতে শাস্ত্র পড়া নেই। অর্থাৎ পরবর্তীকালের ম্যাক্স-মূলার পড়া শাস্ত্রবিদের মতো। যাই হোক, এইসব বিচারে বোঝা যায় 'অ্যাংলি-সিস্ট' এবং 'ট্র্যাডিশনালিস্ট' বিবদমান পক্ষদ্বয়কে এরূপভাবে আখ্যায়ন উপযোগী হচ্ছে না। বরং, আমার মতে, এতে বিভ্রান্তির কারণ ঘটে। সঠিকভাবে বলতে গেলে এ ধরনের আখ্যায়ন ভুলই বলতে হয়। আলোচ্য পুস্তকে (যেমন পৃঃ ২৯, ও ৫৯ তে) 'এনলাইটেনমেণ্ট' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু রেনেসাঁর সমার্থমূলকভাবেই যেন ব্যবহৃত হয়েছে পাঠকের এ-ধারণা হওয়ার ভিত আছে। এজ অব রীজনেরও তিনি উল্লেখ করেছেন। সব একসঙ্গে মিশে গেছে। ইউরোপের রেনেসাঁ'র কাল সাধারণতঃ ধরা হয় ১৪৪০-১৫৪০ খৃষ্টাব্দ। অবশ্য উভয়দিকেই নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা টানা যায়না। অনেকে আরও কিছু আগে থেকে ধরেন। রেনেসাঁর সঙ্গে যে রিফরমেশান অর্থের দিকে তার নানান অভিব্যক্তি। লুথার সম্বন্ধে মার্কস্ বলেছেন : "Luther, we grant, overcame bondage out of devotion by replacing it by bondage out of conviction." (Marx and Engels on 'Religion' P-5I।) রিফরমেশান সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ লিখেছেন : "Justification by faith the central doctrine of the Reformation means that you are saved by your own sense of your own inferiority. No estimate of man's moral and intellectual capacity could sink lower."

(Great Tudors : Garvin, Page 544-45) এঁদের দৃষ্টিতে মানুষের যখন অবস্থাই এই অর্থাৎ সব মানুষই যখন আদম এবং ইভের মূল পাপ, বা ওরিজিনাল সিন্-এর উত্তরাধিকারী তখন রোমান ক্যাথলিক গির্জা, তার পোপ ও তার আচার পালন তার কি করবে ? ঈশ্বরের করুণাই ভরসা। আর সে ঈশ্বর সৃষ্টিকে চাবি দিয়ে চালু করে ছেড়ে দেয়নি (যেমন কিনা ডীইজমের ভক্তদের কিছুটা ধারণা): "দি গড অব দি প্রটেসটাণ্টস্ ওয়াজ কন্স্ট্যাণ্টলি লায়েবল টু ইণ্টারফিয়ার : হি হ্যাড নট উণ্ড থিংস আপ (চাবি দিয়ে ছেড়ে দেননি) অ্যাণ্ড লেফট দেম টু ওয়াক বাই দেয়ার ওন ল'জ।" (ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ৫৪৭) পার্থিব কোনও মাধ্যমের দ্বারা কিছু হবে না। অবশ্য পিউরিটান, ক্যালভিনিস্ট, অ্যাংলিকান চার্চ এদের সবারই পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে। এসবের মধ্যে যাবার এখানে প্রয়োজন নাই।

রেনেসাঁ রিফরমেশানের সঙ্গে 'এনলাইটেনমেণ্টের' যুগটা গুলিয়ে ফেললে বুঝতে অসুবিধা হয়। তাই পরিচিত জিনিসও একটু আউড়ে নিলাম। 'এনলাইটেনমেণ্টের' সংজ্ঞা সংক্ষেপে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন অভিধান থেকে সংশ্লিষ্ট মতবাদ ও দার্শনিকদের নাম ইত্যাদি তুলে দিলাম :

"The whole of the Age of Reason from the English revolution of 1640's to the French Revolution of 1780's ; the England of Hobbes, Locke and Newton ; the Scotland of Hume and Adam Smith and the France of Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau and the Encyclopaedist, the Germany of Kant, Lessing and Hender···the term is now usually applied···to the untramelled rationalism and empiricism and ready questioning of authority and tradition in religious social and political matters······" (Penguin Encyclopeadia)

"Enlightenment : a philosophic movement of the 18th century marked by questioning of traditional doctrines and values, a tendency towards individualism and an emphasis on the idea of universal human progress the empirical method in science and the free use of reason." (Webster), Deism : "a movement or system of thought advocating natural reasons

based on human reason rather than revelation emphasizing morality and in the 18th century denying the interference of the creator with laws of the universe." (Webster) Diderot (1913-84) "French philosopher…quickly passed from deism and eithical idealism to…materialism" (Dictionary of Phil…) Locke (1632-1704); "English materialist philosopher…he developed the theory of knowledge of materialist empiricism." (Ibid).

ব্যাখ্যা করার স্থান ও সুযোগ এখানে নেই। যিনি উল্লিখিত দর্শনাদি, দার্শনিক এবং উল্লিখিত যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত নন তিনিও উপরে রিফরমেশান যুগের এবং তারপর এখানে এনলাইটেনমেণ্টের যুগের ধর্মীয় ও দার্শনিক ধ্যান-ধারণা তুলনা করলেই পূর্বতন যুগ থেকে পরের এই যুগে ধ্যান-ধারণার অগ্রগতি ও ফারাক বুঝতে পারবেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে উপরোক্ত বুর্জোয়া চিন্তাধারাগুলির সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়।

লক্ষ্য করা যাবে এদেশে রামমোহনের চিন্তাধারা যখন গড়ে উঠছে সে এই এনলাইটেনমেণ্টের পর্বেরও পরে। ইয়ং বেঙ্গলও এর দ্বারাই প্রভাবান্বিত হচ্ছেন। প্রথমে ইংলণ্ডে ও পরে ইউরোপের যে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হল চিন্তা জগতে তারও একটা নির্দিষ্ট দান আছে। ইউরোপ তখন রেনেসাঁ'কে অনেক পিছিয়ে ফেলে এসেছে। সুতরাং রামমোহন প্রমুখের জগতে ইউরোপ থেকে যে চিন্তাধারা এসে ঢেউ-এর মতো আছড়ে পড়ছে তার বেশীর ভাগই হল শেষের এই সময়ের. বিশেষ করে ফরাসী বিপ্লবের সময়কার বা এজ অব রীজনের চিন্তা-ধারা। পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফের লেখা থেকে লেখক নিজেই উদ্ধৃত করেছেন। টম পেনের বই কেমন করে কলকাতা বাজারে আমদানী ও বিক্রয় হচ্ছিল তার বর্ণনায় সাহেব বলেছেন: "একটা জাহাজে এক হাজার কপি এল, প্রথমে সস্তায় এক টাকা দামে বিক্রি হচ্ছিল। চাহিদা এত বাড়লো যে দাম পাঁচ গুণ বেড়ে গেল।" আমেরিকার পুস্তক প্রকাশক যে এ বই পাঠাচ্ছিল—তার উপর সাহেব রোষান্বিত। তিনি বললেন, "সে শুনেছে একদল নাস্তিক (ইনফিডেল) এদেশে গড়ে উঠেছে এবং তা শুনে গাড়ি গাড়ি খৃশ্চানিটি-বিরোধী পুস্তক পাঠাচ্ছে। তার মধ্যে টম পেনের "রাইটস অব ম্যান" সহ সব বই আছে। ফরাসী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে বার্ক তাঁর কুৎসিত লেখা প্রকাশ করলেন। তার জবাবেই অগ্নিময় ভাষায় টম পেন লিখলেন রাইট্স অব ম্যান। "দি রাইট্স

অব ম্যান অব পেন ওয়াজ মোর দ্যান অ্যান আনসার। ইট ওয়াজ এ ব্রিলিয়াণ্ট কাউণ্টার ম্যানিফেষ্টো অব দি এক্সট্রিম র‍্যাডিক্যাল রিপাবলিকান্স হুইচ সাম্‌ড্‌ আপ অ্যান এমবিটার্ড ডেমোক্র্যাটস্‌ হেটস অ্যাণ্ড হোপস্‌।" (রবার্টসান, ইংল্যাণ্ড আনডার দি হ্যানেভারিয়ান্‌স্‌) ঐ বই যখন এখানে বিক্রয় হচ্ছিল নিশ্চয়ই কিছু চেতনাকে উদ্দীপিত করছিল। আর এরূপ বইকে লুফে নেওয়ার জন্য মনও তৈরী হয়েছিল।

রীজনের পক্ষে ডিরোজিওর আবেগময় ভাষণ, ডেভিড হেয়ারের ঘোষিত নাস্তিকতা—উভয়ের খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকদের বিরোধিতা—রেনেসাঁর লক্ষণ এত দূর নয়। তাকে ছাড়িয়ে যায়। এসব এনলাইটেনমেণ্ট এমন কি তার শেষ পর্যায়ে এজ অব রীজনের লক্ষণ।

প্রসঙ্গতঃ একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়। ১৮১৭ সালের জানুয়ারীতে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই কলেজ না থাকলে রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, গৌর বসাক অনুরূপ উচ্চমানে পড়ার সুযোগ কোথায় পেতেন? ইচ্ছা থাকলেও কি তাঁরা সংস্কৃত কলেজে পড়তে পারতেন? বাধা তো দূর হয় প্রায় ৪০ বৎসর পর। সেও এনলাইটেনমেণ্টের অনুরক্তের প্রয়াসে।

পরবর্তীকালে ইংরাজী শিক্ষায় সঞ্চারিত দাস্যভাবের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। এটা ঠিকই কিন্তু এরই অনুপূরক আর একটা দিক আছে। হীনমন্যতায় সঞ্চারিত অন্ধ জাতিদম্ভ যা জন্ম দিয়েছিল পুনরুত্থানবাদের। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেই এ রোগ বেশী লক্ষিত হয়, এটা আকস্মিক নয়। প্রগতির পথ রুদ্ধ করছিল এ দুইই। উর্দু সাহিত্যে সরকারী চাকরে মুসলমান লেখকদের মধ্যেও একই রোগ দেখা যায়।

এ সম্বন্ধে সবের উপর যোগান দিচ্ছিল এবং এখনও দিচ্ছে সামন্ততন্ত্র। প্রতিক্রিয়ার ভিতের প্রসার ও ব্যপ্তিতে জমিদারী প্রথার প্রভাব তাঁর লেখায় সুস্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল। জমিদারী প্রথার বেপরোয়া শোষণ ও খাজনা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে থাকের পর থাক মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি এবং তার মধ্যে মধ্যবিত্তের এক বিরাট অংশের থাকের পর থাক স্থান সংগ্রহ, প্রতিক্রিয়ার অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। বাংলা দেশে জমিদাররা গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরে এবং পরেও প্রায় ত্রিশ বৎসর সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিরোধিতা করেন। ১৯৩০ সালে প্রাথমিক শিক্ষার আইন হয় তাঁদের বিরোধিতাকে পরাজিত করে। (আমার লেখা 'শিক্ষা ও শ্রেণী সম্পর্ক' দ্রষ্টব্য। সকলের ভূমিকাই আলোচনা করেছি।) এখানে পুরোনো কথাও স্মরণ করতে হয়। "বৌদ্ধেরা স্ত্রীলোক-

দিগকেও ধর্ম প্রচার করিতে দিত এবং উহাদিগকেও মঠে স্থান দিত। যে ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৌদ্ধদিগের বিবাদ, তাহারা বৈদিক ক্রিয়াসক্ত, স্ত্রী ও শূদ্র ধর্ম-শাস্ত্র ও বৈদিক ক্রিয়াদিতে একেবারে বঞ্চিত. বৈশ্যগণও বড় একটা যাগযজ্ঞা-দিতে থাকিতে পারিত না। সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এক প্রকার বন্ধ বলিলেই হইল।" (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী) এই প্রাচীন ঐতিহ্য ব্রাহ্মণ ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীতেও সংক্রমিত। তা জমিদারী প্রথায় বিশেষ শক্তিশালী হয়েছে তাতে সন্দেহ কী? সুতরাং "সংস্কৃতিও মধ্যযুগ আর আধুনিক যুগের এক মিশ্রণ (পৃঃ ১৯১)" দাঁড়াবে তাতে আর আশ্চর্য কী? যা অর্থনৈতিক ভিত থাকবে উপরকাঠামো তো সেরকমই হবে। দ্বিতীয়তঃ, পুনরুল্লেখে দোষ নেই, বেকন, লক, ভলতেয়ার, দিদেরো আর টম পেনের জায়গায় এখন ইউরোপ থেকে যে প্রভাব আসছিল তাতে প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় প্রভাব সমর্থন পাচ্ছিল নিজেদের প্রাচীন আইডিয়ালিস্ট দর্শন ও সংস্কারের পক্ষে ইউরোপীয়দের সার্টিফিকেটকে তুলে ধরা হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথও এর উল্লেখ করেছেন। তৃতীয়তঃ এ তো সব নয়। স্বাধীনতার আন্দোলন, গণতন্ত্রের আন্দোলন, পরে সূচনা থেকে শুরু করে গত ৫০ বৎসরের সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের আন্দোলন এসবের কী কোনও ঐতিহ্য নাই? ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে কৃষকের সংগ্রাম, শ্রমিকের সংগ্রাম এসবের অবদান কি উপর কাঠামোকে প্রভাবান্বিত করে নি? একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে দেশের মধ্যেই ইংরেজের যে বাধা এই শক্তির অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে তা হচ্ছে-তাদের সুপরিকল্পিত বিভেদের চক্রান্ত। বিভেদকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেছে পুনরুত্থানবাদ। আর সেই পুনরুত্থানবাদের অব্যাহত অগ্রগতিকে সাহায্য করেছে ইংরেজ। এদেশের শোষকশ্রেণী ইংলণ্ড ও ইউরোপের বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়া বা অবক্ষয়ের দর্শনগুলিকে তাঁদের প্রতিক্রিয়ার সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করেছেন, আজও যেমন করছেন। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যা ভয় ছিল তাই ঘটেছে।

ইংরাজি ভাষাজ্ঞানের স্কন্ধে অপরাধটা চাপিয়ে বা যুগানুযায়ী যাঁরা প্রগতিশীল ছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার প্রমুখের পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের স্কন্ধে দোষ চাপিয়ে লাভ নেই। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার চিন্তা যা জাতি বর্ণ নির্বিশেষে শ্রমিকের 'রাইট টু কমবাইনের' শিক্ষা সেও তো আমাদের ইংরিজীর মাধ্যমেই শিখতে হয়েছে। ইংলণ্ডের ইতিহাস, ফ্রান্সের ইতিহাস' জারমানির ইতিহাস না পড়লে মার্কস, এঙ্গেল্‌স্ বোঝা যাবে? মার্কস্ নিজেই তো লিখছেন, ইংলণ্ডে বুর্জোয়া বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লবের সূচনা বলে ইংলণ্ডের অর্থনীতির গবেষণা তাঁর মনোযোগ দাবী করেছে।

রামমোহন, বা বিদ্যাসাগর আদর্শ হিসেবে সে যুগে যা প্রচার করেছেন তা যদি অ্যাংলিসিস্ট আখ্যা পায় আজ শ্রমিকশ্রেণীর রাইট টু কমবাইন, রাইট টু স্ট্রাইকের (প্রথম ইংলণ্ডেই স্বীকৃত) অ্যাংলিসিষ্ট আখ্যা পাওয়া উচিত। কিন্তু তা যদি হয় টি-এস-ইলিয়ট বা এজরা পাউণ্ডের জয়গান ইয়াঙ্কিস্ট বলে পরিচিত হবে না কেন ?

পুস্তকে আলোচিত আরও অনেক কিছুর উপর লেখার ইচ্ছা ছিল। তিনি লিখেছেন : "আমরা যখন নব্য বঙ্গের বা নব যুগের বাংলার ইতিহাস আলোচনা করি তখন কতকটা সচেতনভাবেই বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের এই প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাই।" এর বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব হচ্ছে না। কথাটা সত্য, লেখক মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরোধিতার কথা লিখেছেন, এও সত্য। ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলনে মৌলানাদের একটা প্রধান অভিযোগ ছিল—ইংরাজী পড়া মুসলমানরা নাস্তিক হচ্ছেন (উর্দুতে লেখা মৌলানা হোসেন আহমদের আত্মজীবনী দ্রষ্টব্য।) কিন্তু বাস্তব ঘটনার বিচারে দেখা যায় তাঁর একটি বক্তব্য সঠিক নয়। তিনি ইংরাজ সম্বন্ধে একটি সার্টিফিকেট দিয়েছেন। মুসলমান সমাজের পশ্চাৎ পদতার উল্লেখ করে তিনি বলেছেন "এ ট্রাজেডি রচয়িতা ইংরেজ শাসকরা……নন।" [পৃঃ ২৫] লর্ড এলেনবরার মিনিট "পিট দি হিন্দুজ এগেনস্ট দি মুসলিম্‌স" কিংবা পরবর্তীকালে "পিট দি মুসলিম এগেনস্ট্ হিন্দুজ" এসব কিভাবে কাজ করেছে তার আলোচনা দরকার। রামগোপাল দেখিয়েছেন ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহের পর উত্তর প্রদেশের মুসলমানদের উপর বিশেষ আক্রোশ হলেও তারা চাকরি পেয়েছে কিন্তু বাংলা দেশে মুসলমান মাত্রই 'সাসপেক্ট' থেকেছে। বাংলা গভর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপন থেকে তিনি দেখিয়েছেন তাতে গেজেটে চাকরির বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে "Appointment would be given to none but Hindus" ১৮৫১তেও উকিলের সংখ্যা হিন্দু আর ইংরেজের মিলিত সংখ্যার সমান হচ্ছে মুসলমান উকিল। পরে ৮৫২ থেকে ১৮৬৮র মধ্যে ২৪০ জন ভারতীয় ওকালতিতে গ্রহণ করা হলো। তার মধ্যে ২৩৯ জন হিন্দু। মাত্র একজন মুসলমান। (ইণ্ডিয়ান মুসলিম্‌স্ রাম গোপাল—পৃঃ ২৭-২৮) রাম গোপালের বিবরণের বিশেষ তাৎপর্য পাওয়া যাবে মাত্র চল্লিশ বৎসর আগে রামমোহনের ইংলণ্ডে হাউস অফ কমন্সের সিলেক্ট কমিটির কাছে দেওয়া একটি প্রশ্নের উত্তরে।

Question : What is your opinion of the judicial character of the Hindu and Mahamadan lawyers attached to the Court ?

Answer : Among the Mahamadan Lawyers I have met with some honest men. The Hindu lawyers are not generally well spoken of and they do not enjoy much confidence of the public.

বাংলাদেশে মুসলমানদের উপর ইংরেজদের বিশেষ বিদ্বেষের কারণ দেখা উচিত। কিন্তু ইংরেজের অস্ত্র শুধু এটাই ছিল না। যেটুকু অসঙ্কীর্ণ কালচার দেশীয় শাসন ব্যবস্থার কাজে নিযুক্ত মুসলমান সমাজে গড়ে উঠেছিল, তার ধারক ও অবলম্বন বিশেষ শ্রেণীকে তো অবলুপ্ত করা হলই সঙ্গে সঙ্গে সরকারী সহায়তায় তীব্র ধর্মান্ধতা ও পুনরুত্থান উৎসাহিত হলো। (শ্রীবিনয় ঘোষ নিজেই দেখিয়েছেন কলকাতা মাদ্রাসায় উর্দু অবোধ্য হলেও উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ফারসীর বদলে উর্দু মাধ্যম প্রবর্তন করা হল। ফারসী ভাষা ও সাহিত্যে সঙ্কীর্ণতা-বিরোধী প্রভাব সুপরিচিত।) এতে মুসলমানের সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু হিন্দুর ক্ষেত্রেই হোক আর মুসলমানের ক্ষেত্রেই হোক, ইংরেজের বিভেদের চক্রান্ত বাঙ্গালীর জাতীয়তাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করতে পারেনি। কেন? পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যের দাম তো আছেই। তাছাড়া প্রগতিশীল সংস্কৃতিরও দাম আছে। সুতরাং এনলাইটেনমেণ্টের কোন প্রভাব বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে পড়েনি একথা সত্য নয়। পুনরুত্থানবাদী হিন্দু বা মুসলমান সাম্প্রদায়িক ও বিদ্বেষী হিন্দু সাহিত্য আর তার পাল্টা মুসলমান সংকীর্ণতাবাদীরা দেশের হিন্দু রচিত প্রগতিশীল সাহিত্যের প্রভাব কোনও কোনও সময় মন্দীভূত করলেও রুদ্ধ করতে পারে নি। সুতরাং বাংলার এনলাইটেনমেণ্ট মুসলমানের কাছেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি বাঙালী মুসলমানের অনুরাগ তা দেখিয়ে দিয়েছে।

"যন্ত্র, গণতন্ত্র ও জনসমাজ" তিনি একটি বিষয় আলোচনা করেছেন। ইউরোপের হাল আমলের এক গোষ্ঠীর মতবাদে তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছেন, এটা বোঝা যায়। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদি, কমপিউটার প্রভৃতির উদ্ভবে মানুষের মূল্য থাকছে না। যন্ত্রই সব করতে পারছে সুতরাং মানুষের কোনও মূল্য থাকছে না—বক্তব্যটা এই ধরনের। এ-তত্ত্ব ভুল, অনেকেই এটা দেখিয়েছেন। উল্লিখিত যন্ত্রগুলির পরিচালনায় মানুষের ভূমিকা কোনও ক্ষেত্রেই বর্জিত নয়। যে-কোনও কমপিউটার পরিচালক এটা বুঝিয়ে দিতে পারেন। এই সব যন্ত্রের ক্ষেত্রে সমস্ত উদ্ভাবন মানুষের শক্তিকেই বৃদ্ধি করেছে, প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্য প্রসারের প্রয়াসে শক্তি যুগিয়েছে। ইতিপূর্বের যন্ত্রাদি মানুষের

হাত, পা, চোখ কান প্রভৃতি অঙ্গের কাজ নিয়ে নিচ্ছিল। মগজও একটা অঙ্গ। এর বেশ কিছু কাজ যথা মুহূর্তের মধ্যে কোটি কোটি গাণিতিক হিসেব করা কিংবা অসংখ্য তথ্য স্মৃতিতে ধরে রাখা, ইত্যাদি এখন যন্ত্রের হাতে সমর্পণ করা সম্ভব হচ্ছে। হাত পায়ের শক্তির মতো মগজের শক্তিও এর দ্বারা প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু সব কিছুই মানুষের নির্দ্দেশের অপেক্ষা রাখে। কোটি কোটি টাকা মূল্যের উল্লিখিত যন্ত্রসমূহই আসল অর্থাৎ পুঁজি ও ক্যাপিট্যালই আসল। শ্রমশক্তির মূল্য নেই, ধনতন্ত্রের মুখপাত্রদের এই ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রচারে আলোচ্য ভুল তত্ত্বটি সাহায্য করে।

বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজে অনেক পশ্চাৎপদতা রয়ে গেছে। আত্মস্তাবকতাও অনেক বেশী। শ্রীবিনয় ঘোষ তাঁর পুস্তকে এগুলিকে প্রচণ্ড আঘাত করেছেন। তার ন্যায্য কারণও যথেষ্ট। স্বতন্ত্রভাবেই এইরূপ সমালোচনার যথেষ্ট মূল্য আছে। কিন্তু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কোন্‌টি প্রগতির দিকে ও কোন্‌টি প্রতিক্রিয়ার দিকে সাহায্য করে সে বিচারও প্রয়োজন। অ্যাংলিসিস্ট ও ট্রাডিশনালিস্ট বা অনুরূপ অনুপযোগী ও বিভ্রান্তিকর শব্দ দিয়ে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলে বাস্তবের প্রতিফলনও হয় না, বোঝারও অসুবিধা হয়। শুধু স্থানাভাবে অনেক কিছু বক্তব্যই থেকে গেল। বক্তব্য খুব সীমিত রয়ে গেল এর জন্য দুঃখিত।